ঘুমভাঙানি

ঘুমভাঙানি

শৈবাল মিত্র

বুক ট্রাস্ট
৩০/১ বি, কলেজ রো
কলকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ / মার্চ ১৯৫৯

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ / সুনীল শীল

প্রকাশক বরুণ গঙ্গোপাধ্যায় বুক ট্রাস্ট ৩০/১ বি কলেজ রো কলকাতা ৭০০০০৯ মুদ্রক যশোদা মাইতি ৫২/১ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট কলকাতা ৭০০০০৯

গঙ্গার ধারে, যার পশ্চিম পাড়ে নামী একটা কলেজ রয়েছে, এই গল্পটা এখনি সেখানে শুরু হল। গঙ্গার গা ঘেঁষে সিমেন্ট বাঁধানো লম্বা চাতাল, যার নাম স্ট্র্যান্ড, এই মুহূর্তে সেখানে ফুচকাওলাকে ঘিরে যে তিনটে মেয়ে, অবশ্যই পাশের কলেজের ছাত্রী তারা, বিকেল ফুরোনোর আগে ফুচকা খাচ্ছে, তাদের মধ্যে দু'বিনুনি বাঁধা, লম্বাটে মুখ, পোশাক, চুড়িদার কামিজ, মেয়েটাকে জয়ার চেনা মনে হল। কোথায় দেখেছে, কবে দেখেছে, সকালের আলোয়, না ধূসর অপরাহ্নে, খেয়াল করতে না পারলেও, তার মুখটা যে বহুকালের চেনা, এ নিয়ে তার সন্দেহ জাগল না। ফুচকা গ্রাসোদ্যত, তিনটে মেয়ের দিকে তাকিয়ে দু'বিনুনির সঙ্গে যোগসাজশের শেকড় সে যখন হাতড়ে বেড়াচ্ছে, সাইকেল চেপে, ঝড়ের বেগে যে ছেলেটা তখন ফুচকা খানেওয়ালিদের পাশে এসে, সজোরে ব্রেক চেপে, ক্যাঁচ করে আওয়াজ তুলে দাঁড়িয়ে গেল, তাকেও জয়ার চেনা মনে হল। বাইশ-তেইশের দাড়িওলা, গভীর চোখ, খাঁড়ার মতো নাক, সাইকেল আরোহীকে কোথায় যেন দেখেছে! মন আর মননের ছাই খুঁড়ে দাড়িওলাকে জয়া যখন স্মরণে আনতে চাইছে, শালপাতার ঠোঙা থেকে তখন চট করে জলভরা ফুচকাটা মুখে পুরে দু'বিনুনি এসে দাঁড়িয়েছে সাইকেলের পাশে। ফুচকা গিলে, পাতলা ঠোঁটে আলগোছ হাসি ফুটিয়েছে। ফুচকাওলার সামনে দাঁড়ানো তার দুই সঙ্গিনী একঝলক মুখ চাওয়াচাওয়ি করে মিটিমিটি হাসছে। হাতে ধরা শালপাতার ঠোঙাটা দাড়িওলার দিকে ঈষৎ বাড়িয়ে দু'বিনুনি বোধহয় জানতে চাইল, সে ফুচকা খাবে কিনা! মাটিতে এক পা ছুঁয়ে, সাইকেল সামান্য কাত করে, সিটে বসে থাকা ছেলেটা ইঙ্গিতে, ফুচকা খেতে তার অনিচ্ছের কথা জানাতে, হাতের ঠোঙা ফেলে দু'বিনুনি আরও একটু সাইকেল ঘেঁষে দাঁড়াল। দু'বিনুনিকে চাপা গলায় দাড়িওলা কিছু বলছে। ফুচকাওলার সামনে দাঁড়ানো মেয়ে দুটোর মুখে তখনও হাসি। ফুচকা খাওয়া থামিয়ে শালপাতার ঠোঙা হাতে ধরে দু'বিনুনির জন্যে তারা অপেক্ষা করছে।

সাইকেল আরোহীকে জয়া খুঁটিয়ে দেখছে। অবিকল মুখ, সেই চেহারা, গেরুয়া পাঞ্জাবি, আধময়লা সাদা পাজামা, ছিপছিপে, ছ'ফুট লম্বা, মুখে কচি দাড়িগোঁফ, বাইশ-তেইশের ছেলেটা, ফুচকাওলার সামনে দাঁড়ানো দুই তন্বীর দিকে মুহূর্তের জন্যে না তাকিয়ে, দু'বিনুনির সঙ্গে কথা বলে চলেছে। তার আপাতগম্ভীর মুখের কোণে ছড়িয়ে রয়েছে হালকা হাসি। গঙ্গার হাওয়ায় তার মাথার এলোমেলো চুল

উড়ে এসে কপাল, চোখ ঢেকে দিলেও সে পাত্তা দিচ্ছে না। চুলগুলো বাঁ হাতে কপালের ওপর টেনে এনে, হাতের পাতায় চেপে রেখে কথা বলে যাচ্ছে। সাইকেলের সিটে বসে, স্ট্র্যান্ডের চাতালে এক-পা ঠেকিয়ে, চার-পাঁচ মিনিট, দু'বিনুনির সঙ্গে কথা বলে, দাড়িওলা যেভাবে এসেছিল, সাইকেল খাড়া করে, সেভাবে সাঁ করে চন্দননগর বাজারের দিকে চলে গেল। সঙ্গিনীদের কাছে মেয়েটা ফিরে এলেও তিনজনের কেউ আর ফুচকা খেল না। স্ট্র্যান্ড ছেড়ে জি টি রোড টপকে কলেজ গেটের দিকে তারা এগিয়ে চলল। কলেজ নিশ্চয় সবেমাত্র ছুটি হয়েছে, গেটে বেশ ভিড়। রাস্তা পেরিয়ে, ভিড়ের বড় অংশ, গঙ্গার ধারে স্ট্র্যান্ডে চলে আসবে। স্ট্র্যান্ডে পাতা কাঠের বেঞ্চে, বুড়োবটের তলার বাঁধানো বেদিতে বসে সন্ধের আগে পর্যন্ত গল্প করবে। চপ-কাটলেট খেতে বাজারের রেস্টুরেন্টে সঙ্গিনী নিয়ে ঢুকতে পারে কেউ। রেস্টুরেন্টে, পর্দা-ফেলা কেবিনে জায়গা মিললে, চপ-কাটলেটের সঙ্গে দু-চারটে চুমুটুমুও খায়।

স্ট্র্যান্ডের চাতালে একটা কাঠের বেঞ্চে বসে গঙ্গার ছলাৎছল স্রোতের মধ্যে জয়া শুনতে পাচ্ছে, মহাপুরুষদের কলধ্বনি। মহাপুরুষরা মৃত হলেও তাঁদের উচ্চারিত ধ্বনিসমূহকে একদা অনেক বছর আগে, সেই বালিকাবেলায় পরম সত্য মনে হত। পঁয়ত্রিশ বছর পরে, আজ আস্ত একটা বেঞ্চি তাকে দখল করে বসে থাকতে দেখে কলেজের ছেলেমেয়েরা নিশ্চয় খুশি হবে না। বরং বিরক্ত হবে। ভাববে, এই বুড়িটা আবার কে? কলেজ ছুটির সময়ে এখানে এসে জুটল কোথা থেকে? কথাটা ভেবে জয়ার হাসি পেল। ছেলেমেয়েগুলো জানতে পারবে না, পঁয়ত্রিশ বছর আগে এই বুড়িটা, তখন সে দু'বেণী বাঁধা এক কিশোরী, এই কলেজে পড়ত। তখন এদের জন্ম হয়নি, এদের জ্যাঠা, কাকা আর তাদের গৃহিণীদের দু-একজন হয়তো তার সঙ্গে পড়ত। তাকে চিনত। তাদের অনেকের সঙ্গে গঙ্গার ধারে এই স্ট্র্যান্ডের বেঞ্চে বসে সে আড্ডা দিয়েছে, জটলা করেছে বুড়ো বটতলায় দাঁড়িয়ে। তাদের কে কোথায় আছে না জানলেও এই এলাকার এক নারীবাদী সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত কর্মশালায়, অতিথি ভাষ্যকার হিসেবে তাকে আনা হয়েছে। 'ফেমিনিজম', 'নারীবাদ' নিয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লিখে তার এতই যশ হয়েছে যে বাঙালি মহিলামহল একডাকে তাকে চেনে এবং খ্যাতি বজায় রাখতে মেয়েদের বিস্তর সভাসমিতিতে তাকে হাজির থাকতে হয়। সেরকম এক তৎপরতায় সাড়া দিয়ে গতকাল বিকেলে সে এখানে এসেছে। কাল সন্ধেতেও এই বেঞ্চে ঘণ্টাখানেক সে বসেছিল। একাই ছিল। এলাকাটা তার নখদর্পণে, একা চলাফেরাতে কোনও অসুবিধে নেই। পঁয়ত্রিশ বছর আগের যে পৃথিবী তার মাথার মধ্যে জীবন্ত হয়ে উঠছিল, তা আদৌ বাস্তবে ছিল কিনা, এমন এক বিভ্রমে পড়ে গিয়েছিল। ফেলে আসা নিজের জীবনকে মনে হচ্ছিল রূপকথার কাহিনী। শেষ বিকেলের আলো, বাতাস, গঙ্গার ঢেউ কানের কাছে বলে যাচ্ছিল এক ধুন্ধুমার সময়ের গল্প। কাঠের

এই বেঞ্চে অনেকটা সময় নেশাতুরের মত সে বসেছিল। শ্রোতা যেখানে গল্পের মূল চরিত্র, অদৃশ্য কথকের মুখ থেকে সেই গল্প শেষ পর্যন্ত শুনতে সেই ব্যাকুল শ্রোতা, স্থির হয়ে হিসেবহীন সময় ধরে বসে থাকতে পারে। গল্প শোনার সেই নেশাতে সকাল ন'টা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত কর্মশালা করে আজও গঙ্গার ধারে কাঠের বেঞ্চে এসে জয়া বসেছে। বিকেলের তৃতীয় অধিবেশনে হাজিরা থেকে তাকে ছাড় দিয়েছে উদ্যোক্তারা। কাল, কর্মশালার তৃতীয় দিনে দুপুরের অধিবেশনে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে মানবীবাদ সম্পর্কে তার বলার কথা। গঙ্গার ফুরফুরে বাতাসে শরীর ভাসিয়ে মাথার মধ্যে পরের দিনের সমাপ্তিভাষণের বিষয়টা সে যখন সাজাচ্ছে, তখনি বন্ধুদের সঙ্গে দু'বিনুনির ফুচকা খাওয়া আর ঝড়ের গতিতে এক সাইকেল আরোহীর আসা-যাওয়া নজর করে সময়ের অতল গল্পে সে ডুবে যেতে থাকল। ছায়া ছায়া চেতনায় অনুভব করতে থাকল, শরীরের স্পর্শহীন মায়া। তার পাশের বেঞ্চে চারজনের বদলে ঠাসাঠাসি করে যে সাতজন ছেলেমেয়ে বসেছে, তাদের কথা, হাসাহাসি কানে এলেও সবটা বুঝতে পারছে না। সবটা না হলেও খানিক আঁচ করতে পারছে। নানা বিষয়ের সঙ্গে পাশের বেঞ্চ ছেড়ে কাঁচাপাকা চুল, প্রৌঢ়াটি কখন উঠে যাবে, এ নিয়েও বাজি ধরে তারা লড়ালড়ি করেছে। পঁয়ত্রিশ বছর আগে সে-ও এভাবে দলবল নিয়ে বসত, কসে আড্ডা দিত, আর উদ্ভট যত বিষয় নিয়ে মজার খেলা খেলত।

দু'বেণী বাঁধা মেয়েটা, বন্ধুদের নিয়ে, কলেজ গেটের সামনে ভিড়ে মিশে গেছে। সাইকেল আরোহী ছেলেটা এখন কী করবে, কোথায় যাবে জয়া জানে। শহরের বাইরে, গোন্দলপাড়া ঘাটের কাছে, জরাজীর্ণ এক প্রাচীন বাড়িতে ফিরে গিয়ে ছেলেটা মাকে বলবে, খিদে পেয়েছে, খেতে দাও।

ছেলের দিকে শুকনো মুখে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে মা আধখানা পাকা বেল এনে তার হাতে দেবে। ঘরে খাবার বলতে বাগানের গাছ থেকে পেড়ে আনা এই বেল ছাড়া কিছু নেই। ষোলোটা ছেলেমেয়ের মায়ের সংসারে খাবার বাড়ন্ত হলে, জননীযন্ত্রণায় কাতর সেই মা, হাতের কাছে খেতে দেওয়ার মত যা পায়, হাঁচাপাঁচা করে তাই এনে দেয়। সুপার্থর মা তাই করবে। ছেলেটার নাম যে সুপার্থ, গোন্দলপাড়ায় থাকে, জয়া জানে। ছেলেটার বাবা আধপাগল, তান্ত্রিক, একগুঁয়ে আর জেদি। গুণ একটাই, সন্তান স্নেহে মানুষটা অন্ধ। রেলে চাকরিজীবন শুরু করলেও বেশিদিন সেখানে থাকতে পারেনি। কোনও এক কর্তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হওয়াতে রেলের চাকরি ছেড়ে বিদ্যুৎ পর্ষদে ঢুকেছিল। বছরখানেকের বেশি সেখানে চাকরি করেনি। তারপর কিছুদিন বেকার থেকে তারাতলায় একটা নামী শিল্প সংস্থায় হিসেব লেখার কাজে ঢুকেছিল। শান্তিতে সেখানে বছর চার-পাঁচ কাজ করার পরে হঠাৎ লক-আউট হয়ে গেল সেই কারখানা। কারখানা আর খোলেনি। চাকরি থেকে সুপার্থর বাবার অবসর নেওয়ার তিন বছর আগে কারখানা

তালাবন্ধ হতে, ভবঘুরে স্বভাবের মানুষটা থতোমতো খেয়েছিল। কারখানা খোলার জন্যে কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ রাখতে সহকর্মীদের সঙ্গে বন্ধ গেটের সামনে চ্যাটাই পেতে বসে মাসের পর মাস ধর্না দিয়ে, চোঙা ফুঁকে কয়েক সহস্রবার স্লোগানের ঝড় তুলে, হল্লা করে, ধীরে ধীরে তন্ত্রসাধকে রূপান্তরিত হয়েছিল। তখনই সুপার্থর জন্ম হয়। পরিবারে ষোলোটা সন্তানের এগারোটা মৃত, একজন নিরুদ্দেশ, যে চারজন বেঁচে আছে তাদের একজন পাগল, দু মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, সবচেয়ে ছোট সুপার্থ। চোখের মণির মত তাকে আগলে রাখতে চায় তার আধপাগল, তান্ত্রিক বাবা। তাকে আঁকড়ে বেঁচে থাকতে চায় তার মা, ননীবালা। শেষ সন্তান সুপার্থ। তার ওপরে ছিল চোদ্দো দিদি আর এক দাদা। সে ভূমিষ্ঠ হওয়ার তিনদিন আগে তার সেজদি, তার তৃতীয় সন্তান প্রসব করেছিল। তার মা আর সেজদি এক আঁতুড়ঘরে, জায়গা ভাগাভাগি করে এক মাস কাটিয়েছিল। বয়সে বড় এমন এক ডজন ভাগ্নে-ভাগ্নী ছিল সুপার্থর। মাথায় লম্বা চুল, কপালে তেলসিঁদুরের ত্রিশূল আঁকা, মুখভর্তি দাড়িগোঁফ, সুপার্থর বাবা, তেজেশ সরকারকে এক সকালে গোন্দলপাড়ার ঘাটে দেখেছিল দু'বেণী বাঁধা সেই মেয়েটি। স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে ঘাটের সিঁড়ি ভেঙে পাড়ে উঠে, পুরনো কালীমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে 'মা, মা' করে হুঙ্কার ছেড়ে মানুষটা বলছিল, মা, তুই উগ্রপন্থী, ওরাও উগ্রপন্থী, ওদের একটু দেখিস মা।

সুপার্থর সঙ্গে দেখা করতে এসে তার তান্ত্রিক বাবার মুখোমুখি হয়ে যাবে, দু'বিনুনি মেয়েটা যেমন ভাবেনি, তেমনি সে বুঝতে পারেনি তান্ত্রিকের কথার মাথামুন্ডু। ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে কাছাকাছি একটা আড়াল খুঁজছিল সে। আড়াল খোঁজার দরকার তার ছিল না। অদ্ভুত সেই মানুষটা তাকে ভ্রূক্ষেপ করল না, বললে কম বলা হয়, নিজেকে ছাড়া ঘাটে আর কারও অস্তিত্ব পর্যন্ত সে টের পেল না। অতি-অস্তিত্বের মগ্নতায় রাস্তা আর আকাশের মাঝখানের এক অদৃশ্য পথে, ভিজে কাপড়ের জল ঝরাতে ঝরাতে বাড়ির দিকে সে চলে যাওয়ার পরের মুহূর্তে মাটি ফুঁড়ে সাইকেল নিয়ে সেখানে এসে গেল সুপার্থ। পাতলা হাসি ছড়িয়েছিল তার মুখে। বলল, বাবাকে দেখানোর জন্যে সকাল ন'টায় এই ঘাটে তোমার সঙ্গে 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট' করেছিলাম। কেমন দেখলে?

দু'বেণী এতটা অবাক হয়েছে যে প্রথমে কথা বলতে পাবল না। কয়েক সেকেন্ড পরে জিজ্ঞেস করল, কী বলছিলেন উনি?

বুঝতে পারলে না?

না।

হা-হা করে হেসে সুপার্থ বলল, উগ্রপন্থী মায়ের কাছে আমার আর আমার বন্ধুদের জন্যে প্রার্থনা করছিলেন। আমরাও তো উগ্রপন্থী, তাই!

দু'বেণী বাঁধা তরুণী এখন বাড়ি ফিরে কী করবে, ভাবতে গিয়ে জয়ার মনে

হল, সে এখন, পাশ ফিরে বসা এই বিকেলে, বাড়িতে ঢুকে, কাল, চৈত্র- সংক্রান্তির সকালে পরিবারের পুরুষদের সঙ্গে ছাতু আর ছাই ওড়ানোর জন্যে আবদার করবে। সংক্রান্তির সকালে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে বন্ধুর জন্যে ছাতু আর শত্রুর জন্যে ছাই ওড়ানোর প্রথা, খুলনা থেকে হুগলিতে নিয়ে এসেছে তাদের পরিবার। বাড়ির ছেলেরাই শুধু এই প্রথা পালনের অধিকার পায়। স্কুলে পড়া সমবয়সী খুড়তুতো ভাইয়ের সঙ্গে এই প্রথায় মেতে উঠতে গিয়ে বিধবা পিসির ধমক খেয়েছিল এই মেয়ে। পিসি বলেছিল, মাইয়া মানুষের আবার শত্রুমিত্র আইল কোথা থিকা? মাইয়া মানুষ আবার মানুষ!

না, এটা তার কলেজে পড়ার অনেক আগের ঘটনা। তার বয়স, তখন বারো-তেরোর বেশি নয়। বাল্যবিধবা পিসির কথাটা দু'বিনুনি বাঁধা বালিকার মনে যেমন অভিমানের ঝড় তুলেছিল, তার চেয়ে বেশি তার আঁতে ঘা দিয়েছিল। পিসির মুখের ওপর কথা না বললেও তার রায় মেনে নিতে পারেনি। পিসির কথায় সায় দিয়ে যারা হাসত, সেই ভাইদের কাছে নিজেকে তার খুব ছোট লাগত। লজ্জায়, অপমানে লুকিয়ে কাঁদত। মেয়ে হওয়ার জন্যে খাওয়া, পরা, বেড়ানো, সবেতে কিছু নিষেধ ছিল, ভাইদের থেকে তফাত করা হত। দু'বিনুনি সঙ্কল্প করত, সময় এলে, নিষেধের পাঁচিল ভেঙে ফেলবে, বৈষম্য মানবে না। রাস্তা দিয়ে কোনও মিছিল গেলে, অনেক সময়ে কারণ না জেনে সেই মিছিলে মেয়েদের সারিতে ঢুকে পড়ত। স্কুলে ক্লাস সেভেন-এইটের ছাত্র তখন সে। দেশ, রাষ্ট্র, সমাজ, রাজনীতি নিয়ে ভাবার বয়স না হলেও মেয়ে হওয়ার জন্যে পরিবারে কোণঠাসা হয়ে থাকায় চাপা ক্রোধ আর প্রতিহিংসা তার মনে দানা বাঁধছিল, সজীব বাল্যচেতনার আড়ালে গড়ে উঠছিল এক অপমানিত প্রেক্ষাপট, নিহিত সেই নির্মাণ কুরে কুরে খাচ্ছিল তাকে। সব শেকল, শ্রদ্ধেয় যত পাঁচালির বন্ধন ভেঙে চুরমার করে দেওয়ার অন্ধ জেদে ফুঁসতে শুরু করেছিল সে।

দিদি বাড়ি ফিরবেন কখন?

ছোট বোন হিমানির স্বামী প্রভাতের প্রশ্নে চমকে উঠলেও মুচকি হেসে জয়া বলেছিল, অন্ধকার হওয়ার আগে ফিরব।

হ্যাঁ, তাই করবেন। সন্ধের পরে এ জায়গাটায় আজকাল মাঝে মাঝে ছিনতাই হয়।

জয়া হাসল। বলতে চাইল, আমার কাছে ছিনতাই হওয়ার মত কিছু নেই। কথাটা বলতে পারল না। সত্যি কি কিছু নেই? কানে সোনার দুল আছে, হাতে ঘড়ি, ব্যাগে কয়েকশো টাকা আছে। পঁয়ত্রিশ বছর আগে এসব তার ছিল না। মানিব্যাগে দুটো টাকা থাকলে নিজেকে বড়লোক মনে হত। ধরাকে সরা জ্ঞান করত। দুপুরের নীল আকাশে এলোমেলো কালো টিপের মত আটকে থাকা ঝাঁকবন্দী সোনালি চিলের নৈঃশব্দ্যের সঙ্গে কোথায় চলে গেছে সে সব দিন।

'মানবীবাদ' নিয়ে চন্দননগরে কর্মশালা করতে এসে এখানে উঠেছে হিমানির বাড়িতে। হিমানির স্বামী প্রভাত, কর্মশালার অন্যতম উদ্যোক্তা, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সেখানে থাকছে। তার শোনানো বিপদ সঙ্কেত এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। জয়া বলল, অন্ধকার হলে উঠব। তাছাড়া স্ট্র্যান্ডে, এই গরমে, হাওয়া খেতে আসা লোকজন কম নেই।

জয়া মুচকি হাসতে প্রভাত আর দাঁড়াল না। সুপার্থকে একটু আগে দেখার ঘোর জয়ার মাথার মধ্যে কাজ করে চলেছে। বহু যুগের আড়াল সরিয়ে সুপার্থ নামে যে ছেলেটা ফুচকাপ্রেমী দু'বেণী বাঁধা মেয়েটাকে ডেকে, নিজে সাইকেলে বসে নিচু গলায় কথা বলছিল, পঁয়ত্রিশ বছর আগেও সে একবার এসেছিল। এসেছিল জয়ার কাছে। জয়ার কাছেই আসত সে। জয়াকে যত কথা সে শোনাত, তার চেয়ে আরও, আরও অনেক কথা জয়া শুনতে চাইত। তার কথা শুনতে শুরু করলে জয়ার নেশা ধরে যেত। আকাশ, বাতাস, চারপাশের গাছ-গাছালি থেকে টুপটুপ করে মদের ফোঁটা ঝরে পড়ত। গঙ্গার জল থেকে উঠে আসত নেশা-ধরানো বাতাস। জয়া টের পেল ধীরে ধীরে সময়ের প্রগাঢ় রক্তে, বলা যায়, শরীরী স্মৃতির রক্তে সে ঢুকে যাচ্ছে। তার চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে মৃত হাতি, ঘোড়া, মশা, মাছি আর একঝাঁক মৃত সবুজ গাংফড়িং। ধূসর হেমন্তের শেষ সন্ধ্যায় গজঘণ্টা মিনারের পাশে, তার গা ঘেঁষে বসে সুপার্থ বলছে, আসলে আমি কবি, কবিতা লিখতে চাই, পরের মুহূর্তে টের পাই, বিপ্লবী না হয়ে আমার উপায় নেই। যত বাজে লোক মিলে এই দেশ, আমার মাতৃভূমিকে শেষ করে দিচ্ছে। আমি সহ্য করতে পারছি না। আমার এখন কোনটা হওয়া বেশি জরুরি, কবি, না বিপ্লবী? বিপ্লবী, না কবি? তুমি বল।

দুটো হওয়াই সমান জরুরি। একটা বাদ দিয়ে অন্যটা হওয়া যায় না।

কিন্তু দু-এর মধ্যে কোনটা প্রধান, সবার আগে?

সুপার্থর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে হেমন্তের শেষ সন্ধেতে তার পাশে বসে থাকা মেয়েটা পাল্টা প্রশ্ন করল, আমি কী হতে চাই, তোমার সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকে এ প্রশ্ন কিন্তু তুমি একবারও করনি। আমার কি কিছু হতে ইচ্ছে করে না?

এমন প্রশ্ন শুনতে সুপার্থ তৈরি ছিল না। সে চুপ হয়ে গেল।

স্ট্যান্ডের ল্যাম্পপোস্টগুলোর আলো জ্বলে উঠেছে। মফঃস্বল শহরের ছিরিছাঁদহীন ম্লানতার মত এখানকার আলোগুলো একইরকম ম্যাড়মেড়ে। লাইনবন্দি ল্যাম্পপোস্টের কিছু আলো সব সময়ে খারাপ হয়ে থাকে। আজও তাই। নিভে থাকা সেরকম এক ল্যাম্পপোস্টের কাছের বেঞ্চে বসে জয়া পেয়ে গেল, পরের দিনের মানবীবাদী অধিবেশনের সমাপ্তি ভাষণের বিষয়, যা তাকে একটু আগে সময়ের হাত ধরে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে, দু'বেণী বাঁধা এক তরুণী আর তার সাইকেল আরোহী প্রেমিক। ছেলেটা সুপার্থ নয়, মেয়েটা জয়া নয়। তবু তারা দুজনে আকাশের ওপারে যে আকাশ, সেখানে সুপার্থর কাছে তাকে পৌঁছে দিল। সুপার্থকে এনে দাঁড় করিয়ে দিল, যে মেয়েকে একদিন সে ভালবেসেছিল, তার ঠোঁটের আবছা রেখার সামনে।

মেয়ে হয়ে জন্মানোর জন্যে ছোটবেলা থেকে মনের মধ্যে অপমানের যে দগদগে ঘা নিয়ে জয়া বড় হচ্ছিল, যার যন্ত্রণা অপরিসীম, অথচ কাউকে বলা যেত না, তার উদ্গীরণ যে এভাবে হবে, জয়া নিজে কখনও ভাবতে পারেনি। মনের মধ্যে আগে থেকে কিছুটা প্রস্তুতি ছিল, তৈরি হচ্ছিল আবহ। মামাবাড়ি থেকে কেউ তাদের বাড়িতে এলে, বাড়ির পরিবেশ, আলোচনার বিষয় কয়েক মিনিটের মধ্যে বদল হয়ে দেশ-কাল ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে আলোয় উদ্ভাসিত এমন এক বন্দরে তাদের পৌঁছে দিত, যেখানে রয়েছে অন্য পৃথিবী, স্বপ্নের দেশ, নতুন সমাজ, সচ্ছল সংসার, মেয়ে-পুরুষের সমান মর্যাদা, ভেদাভেদহীন মানবিক সত্য। তার মনের ঘা-গুলোর যন্ত্রণা উবে গিয়ে সেখান থেকে গড়িয়ে পড়ত শিশিরের জল। মামাবাড়ির কারো সংসর্গে এলে এরকম এক অনুভূতি সমাচ্ছন্ন করত তাকে। মামাবাড়ি ছিল দূর বন্দরের বাতি স্তম্ভের মত। সব রকম অবমাননা থেকে তাকে মুক্তি দিল পরিশুদ্ধ, ঠান্ডা সেই জলস্রোত। সাহসী করে তুলল তাকে। হাতে-কলমে পৃথিবী বদলের কর্মসূচিতে সে যখন নেমে পড়ল, স্কুলের গণ্ডি তখনও পেরোয়নি। সুপার্থকে দোকান-বাজারে, স্কুলে যাওয়ার পথে দেখলেও মনে রাখেনি। মনে রাখার মত বয়সে পৌঁছোতে একটা মন লাগে। সেই বয়স, সেই মনস্কতা তখনও তার আসেনি। সুপার্থর সঙ্গে এখানে-সেখানে দেখা হলেও তাকে জানার, তার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সামান্য তাগিদ বোধ করেনি। সুপার্থ যে প্রকৃত রূপবান তা জানতে সময় লেগেছিল। তার আগে জানতে হয়েছিল পাঁচজনের থেকে সুপার্থ আলাদা, অন্যরকম মানুষ সে।

কীভাবে সে তার মনে উথাল-পাতাল শুরু হয়েছিল, চেতনার কোটরে অচেনা এক পাখি জেগে উঠে ডাকাডাকি শুরু করেছিল, সব ঘটনা মনে না থাকলেও ভাঙাচোরা কিছু স্মৃতি আজও চোখ বুজলে ছবির মত সে দেখতে পায়। ঘটনাটা

এরকম। মহাত্মা গান্ধীর পাশাপাশি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা বিপ্লবী লেনিনের নাম তখন সে শুনে ফেলছে। দু-একটা পুস্তিকা, কয়েকটা রাগী প্রচারপত্র পড়ে, পরিচিত মেজাজ খুঁজে পেয়েছে। প্রতিবাদী হতে চায় সে, সব রকম অনাচারের বিরুদ্ধে প্রবল, তীব্র প্রতিবাদ জানাতে চায়। মাও-ঝড়ে চারপাশ তখন তেতে উঠেছে, কে আগে প্রাণ দেবে তা নিয়ে ছেলেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগে গেছে। পাড়ার চেনাজানা ছেলেদের মুখচোখ, অভিব্যক্তি তার চোখের সামনে বদলে যাচ্ছিল। মুখবন্ধ খামে সমীরকাকুর লেখা চিঠি মাঝে মাঝে কাছাকাছি লিচুতলা, সাহেববাগান, মানকুণ্ডু স্টেশনের পুবদিকের একটা বাড়িতে সে পৌঁছে দিলেও চিঠিতে কী লেখা আছে, কখনও জানতে চায়নি। সমীরকাকু নিজেও জানায়নি চিঠির বিষয়। তবে চিঠিগুলো যে প্রেমপত্র নয়, বুঝতে পারার সঙ্গে আঁচ করেছিল, চিঠির বিষয়, তার ভেতরের তাপ আর রোমাঞ্চ। পাড়ার বিশু, মনা, জিয়াদ এসে প্রায়ই পুরনো খবরের কাগজ চেয়ে নিয়ে যেত, মাটির মালসা দিয়ে বলত, ময়দা, আটা যা পাওয়া যায়, তাই গুলে আগুনে ফুটিয়ে আঠা বানিয়ে দিতে। ক্লাস নাইন থেকে তখন সদ্য ক্লাস টেনে উঠেছে সে। বাড়িতে বোন, দু'ভাই ছিল। দিদির কাজে তারাও সঙ্গী হত। সব দেখেও মায়ের চুপ করে থাকাতে জয়া টের পেত, তার কাজে মায়ের সায় আছে। সম্ভবত মামার বাড়ির আবহে মা জেনে গিয়েছিল, জীবনটা শুধু খাওয়া, ঘুমোনো, মৈথুন নয়, জীবনের একটা বড় মাত্রা আছে। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা মা প্রায়ই আবৃত্তি করে ছেলেমেয়েদের শোনাত। 'বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মত হল শেষ' মায়ের মুখ থেকে এই লাইনটা যতবার বেরিয়ে আসত, তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত। মনে হত, সামনে সমুদ্র, অনেকটা রাস্তা যেতে হবে। সঞ্চয়িতার কত কবিতা যে মায়ের কণ্ঠস্থ ছিল হিসেব নেই। শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, কবি হিসেবে যাঁর বিশেষ খ্যাতি তখন ছিল না, মায়ের মুখ থেকে শোনা, সেই জীবনানন্দ দাশের অনেক কবিতার লাইন, তার মগজে গেঁথে গিয়েছিল। সংসারের মধ্যবিত্ত চৌখুপ্পিতে থেকেও অনুভব করত, 'আকাশ ছড়ায়ে আছে আকাশে আকাশে'। শশধর দত্তর লেখা 'দস্যু মোহন' সিরিজ পড়ার সঙ্গে জেঁকে বসছিল কবিতা পড়ার নেশা। রাস্তার দেওয়ালে সাঁটা, পুরনো খবরের কাগজে লেখা, নিত্যনতুন পোস্টারের বয়ান চমকে দিচ্ছিল তাকে। পোস্টার লেখার জন্যে পুরনো খবরের কাগজ তার-ই সরবরাহ করা। কবিতা পড়ার নেশার সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল পোস্টারে লেখা, সমাজ বদলের ডাক। দস্যু মোহনের কাহিনী, জোলো ঠেকতে শুরু করতে পাঠ্যতালিকায় এসে গিয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' উপন্যাস পড়ে এতটা শিহরিত হয়েছিল যে সারারাত ঘুমোতে পারেনি। স্কুলে, শেষ ক্লাসে পৌঁছে সমাজের একজন হিসেবে ভাবতে শুরু করেছে নিজেকে। 'মাইয়া মানুষ' যে আর পাঁচজনের মত রক্তমাংসের মানুষ,

তারও মানমর্যাদা, সমান উচ্চতা আছে, অভিশপ্ত ভাগ্যকে জিতে নেওয়ার এটাই সেরা দশক, এই বিশ্বাসে সে তখন সুদৃঢ় হচ্ছিল। প্রায় মাঝরাতে পাড়ার দুই বন্ধু, অঞ্জু আর রমাকে নিয়ে নিজের হাতে এলাকার কয়েকটা বাড়ির দেওয়ালে পোস্টার সেঁটে মনা, বিশু, জিয়াদদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। তেল দিয়ে ভুসো কালি গুলে, তার সঙ্গে গঁদের আঠা মিশিয়ে, নিমদাঁতন দিয়ে পুরনো খবরের কাগজে ডজনখানেক পোস্টার সে একাই লিখেছিল। পাশে ছিল ছোট বোন হিমানি। একটা পোস্টারের বয়ান, রবিঠাকুরের কবিতার লাইন 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার/কেন নাহি দিবে অধিকার' মা বলে দিয়েছিল। অচেনা হাতের লেখার পোস্টারগুলো রাতারাতি কারা দেওয়ালে সেঁটে দিল, ধরতে না পেরে, এসব করা যাদের কাজ, তারা ভেবেছিল, দলের মধ্যে চোরাগোপ্তা চালাতে লোক ঢুকিয়ে দিয়েছে পুলিস। তাদের দিয়ে এসব করানো হচ্ছে। পুলিসের চরদের খুঁজে বার করতে রাতে পাড়ায় টহলদারি শুরু করল তারা। তৃতীয় দফায় পোস্টার সাঁটতে গিয়ে মাঝরাতের নির্জন রাস্তায় নৈঃশব্দ্য আর কুকুরের ডাকে জয়া আর তার দুই বন্ধুর হৃদযন্ত্র যখন কোলাব্যাঙের মত লাফঝাঁপ করে কণ্ঠনালী ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে, তখনই রাতের টহলদাররা, বিশু, মনা, জিয়াদ, আরও কয়েকজন ঘিরে ফেলল তাদের। পাইপগান ছিল দুজনের হাতে। আরও কোনও অস্ত্র, পেটো কারও হাতে ছিল কিনা দেখার মত অবস্থা তাদের ছিল না। অল্পের জন্যে সেই রাতে 'সেমসাইড' হয়ে যাওয়া থেকে তিনটে মেয়ে বেঁচে গিয়েছিল। অবাক বিশু প্রশ্ন করেছিল, তোরা পোস্টার লাগাচ্ছিস, বলিসনি কেন?

দরকার মনে করিনি, তাই।

জয়ার জবাবে পাড়ার ছেলেরা থতোমত খেয়েছিল। মাঝরাতে ধরা পড়ে গিয়ে জয়া চটে উঠে বলেছিল, তোদের অনুমতি নিয়ে কাজ করতে হবে নাকি? তোরা জানাস আমাদের?

কলেজ, স্কুলে পড়া পাঁচটা ছেলে জবাব খুঁজে না পেয়ে সরে পড়তে চাইছিল। তাড়াতাড়ি একটা রফা করে ফেলতে বিশু বলেছিল, কাল কথা হবে। রাতের দিকে পাড়ায় পুলিস ঘোরাঘুরি শুরু করেছে। এখানে আর না থাকাই ভাল।

মফঃস্বল শহরের মাঝরাতের গলিপথ নিমেষে খালি হয়ে গেছিল। শুধু নিজেদের নিয়মে ঘেউঘেউ করে ডেকে যাচ্ছিল পাঁচ-সাতটা কুকুর। স্কুলে পড়া পাড়ার তিন মেয়ের অসমসাহসী কাণ্ডকারখানা গোপন দলের ভেতরে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। জয়াকে বাড়িতে এসে সমীরকাকু একদিন তারিফ করে গেল, বলল, তুই আর তোর বন্ধুরা যে এমন বীরাঙ্গনা জানতাম না। দারুণ কাজ করেছিস। তবে এখন থেকে এ ধরনের কিছু করার আগে আমাকে জানিয়ে রাখিস।

সমীরকাকুর প্রশংসায় খুশি হলেও জয়ার মনে প্রশ্ন জেগেছিল, কাকা-দাদাদের না জানিয়ে স্বাধীনভাবে মেয়েরা কি কোনও কাজ করতে পারবে না? সে অধিকার কি তাদের নেই?

প্রশ্নটা কাঁটার মত তার মনে বিঁধে থাকল? প্রশ্নের সঠিক জবাব কোথায় পাবে না জেনেই ফের আর একটা দুঃসাহসী কাজে জড়িয়ে গেল। ঘটনাটা ঘটেছিল তাদের স্কুলে, এক দুপুরে গান্ধী, লেনিন শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে। স্কুল কর্তৃপক্ষ হয়তো সদিচ্ছা নিয়েই একই মঞ্চ থেকে গান্ধী, লেনিন শতবর্ষ পালনের অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিল। জয়া আর তার বন্ধুরা বুঝেছিল উল্টোরকম। আয়োজকদের শয়তানি মতলব খুঁজে পেয়েছিল তারা। লেনিন বেঁচে থাকতে তাকে উঠতে-বসতে যারা গাল দিত, তাদের হঠাৎ লেনিনভক্তি, তার জন্মদিন পালন, তাদের কাছে ষড়যন্ত্র মনে হয়েছিল। অনুষ্ঠানের দিন মঞ্চে উঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনানোর বদলে জয়ার ছোট বোন হিমানি আবৃত্তি করল. সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা 'লেনিন' কবিতা। সে থামতে আর একজন শুরু করল, গান্ধীর সঙ্গে লেনিনকে জড়িয়ে শতবর্ষ পালনের অভিসন্ধির কারণ ব্যাখ্যা। এই অসৎ পরিকল্পনা যারা করেছে, মুড়ি-মিছরিকে এক স্তরে নামিয়ে, মহান লেনিনকে তারা অপমান করছে। মঞ্চ যে একদল ছাত্রীর দখলে চলে গেছে, বুঝেও মঞ্চে আসীন স্কুল পরিচালন কমিটির প্রেসিডেন্ট, প্রধান শিক্ষিকা, অনুষ্ঠানের সংগঠক শিক্ষিকারা কী করবে, ভেবে পাচ্ছে না। অতিথি, অভ্যাগত, অভিভাবকরা ঈষৎ ধন্দে পড়লেও ভাবছিল, মঞ্চে যা হচ্ছে, সেটাই মূল অনুষ্ঠান। মঞ্চে যখন এইসব চলছে, চার-পাঁচজন সহপাঠিনীকে নিয়ে স্কুলের দেওয়ালে, ক্লাসঘরে, এমনকী প্রধানশিক্ষিকার ঘরে, স্কুলের অফিসে, টেনসিল আর লাল কালিতে মাও জে দং-এর মুখ এঁকে বিপ্লবী বাণী লিখে যাচ্ছিল জয়া। ঝড়ের গতিতে চলছিল ছবি আঁকা, বাণী লেখার কাজ। শরীর গরম রাখতে তারা স্লোগান দিচ্ছিল মাঝে মাঝে। তাদের কীর্তিকাহিনী প্রথমে মঞ্চে, তারপর শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে যেতে সেখানেও উত্তেজনা জেগেছিল, শুরু হয়ে গিয়েছিল হইচই। অনুষ্ঠান থামেনি। পরিকল্পিত অনুষ্ঠানের অনেকটা অন্যরকম হয়ে যাওয়ার সঙ্গে মঞ্চে আর মঞ্চের নিচে শ্রোতাদের মধ্যে প্রথম সারিতে, হাসি হাসি মুখে বসে থাকা কর্তৃপক্ষের মুখ গম্ভীর হয়েছিল। এই ঘটনা স্কুলের মধ্যে ঝোড়ো হাওয়া বইয়ে দিলেও সমীরকাকু আর দলের নেতারা খুশি হল না। দলকে না জানিয়ে এরকম 'অ্যাকশন' করার জন্য জয়া আর তার সঙ্গিনীদের তারা ধমক দিলেও তাদের বীরত্বের প্রশংসা করার মত লোকের অভাব ঘটল না। স্কুলের মেয়েদের আর তাদের অভিভাবকদের মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল তার নাম। পুলিসের কাছেও পৌঁছে গেল। দুজন সঙ্গী নিয়ে থানার দারোগা, এক সকালে এসে তার মা-বাবাকে কড়কে দিয়ে বলল, স্কুলের হেডমিসট্রেস এফ আই আর করলে ফাটকে পুরে দিতাম আপনার মেয়েকে। সাবধানে রাখবেন মেয়েকে। পরেরবার সে কিন্তু রেহাই পাবে না। মেয়েমর্দানি ছুটিয়ে দেব।

বাড়িতে পুলিস আসতে সবচেয়ে বেশি ভয় পেল বাবা, দুই কাকা আর বিধবা পিসি। পাড়াতেও জানাজানি হয়ে গেল জয়াকে ধরতে এসেছিল পুলিস। তাকে

বাড়িতে না পেয়ে ফিরে গেলেও আবার যে আসবে না, এমন নয়। সবচেয়ে রেগে গেল তারা, যাদের মতবাদ প্রচারে বন্ধুদের নিয়ে স্বেচ্ছায় সে কাজে নেমে পড়েছিল। নেতাদের অনুমতি না নিয়ে, আগবাড়িয়ে জয়ার বিপ্লবীয়ানাকে তারা ঘোরতর অপছন্দ করছিল। মেয়েরা হবে গোপন চিঠির 'ক্যুরিয়র' অর্থাৎ বাহক, 'ফার্স্ট এড' ট্রেনিং নিয়ে আহত কমরেডদের সেবা করবে, খুব বেশি হলে মিছিল, সভা করবে, ছেলেদের মত নিজেরা সিদ্ধান্ত নিয়ে বিপ্লবী যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার এলেম মেয়েদের নেই। তেমন কিছু করা, তাদের উচিত নয়। জয়ার বাড়াবাড়ি থামাতে চাইল কেউ কেউ। কিছুদিনের জন্য চুপচাপ হয়ে গেল জয়া। মাধ্যমিক পরীক্ষায় সেকেন্ড ডিভিশনে পাস করে উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি হল। সাহেববাগানের বাড়ি থেকে স্ট্র্যান্ডে, কলেজ পর্যন্ত প্রায় এক মাইল পথ, পায়ে হেঁটে যাতায়াত। দু-তিনজন সহপাঠিনী পেয়ে গেলে পথের দূরত্ব অনেক কম লাগত। তাঁতের শাড়ি পরে দু'বেণী বেঁধে কলেজে আসত। কলেজে সে ভর্তি হওয়ার আগেই সহপাঠীদের অনেকে চিনে গিয়েছিল তাকে। নামে চিনেছিল। জয়া নামে সাহসী, বেপরোয়া এক ছাত্রী যে কলেজে ভর্তি হচ্ছে, রটে গিয়েছিল। সবচেয়ে বেশি ভয় পেয়েছিল তার প্রতিপক্ষ সংগঠনের ছাত্ররা। পুলিসের খাতায় তার নাম উঠে যেতে জয়া খুশি হয়েছিল। শত্রু যখন তাকে 'শত্রু' হিসেবে চিহ্নিত করেছে, তখন শুধু 'মাইয়া মানুষের' পরিচয় ভেঙে বেরিয়ে এসে, সম্পূর্ণ মানুষের স্বীকৃতি পেয়েছে সে, এটা কম কথা নয়। কলেজে ভর্তি হওয়ার পরে এটা সে নতুন করে অনুভব করল। সহপাঠীদের কেউ কেউ (ছেলে, মেয়ে উভয়েই) দিদি বলতে শুরু করল তাকে। সকলের সামনে 'জয়াদি' বলে ডাকলে, প্রথমে কিছুটা সঙ্কোচবোধ করলেও অল্পদিনে স্বাভাবিক ঠেকতে শুরু করেছিল সেই ডাক। সে টের পাচ্ছিল চেতনার দিক থেকে তাকে এগিয়ে রাখছে বন্ধুরা। তাই সে তাদের দিদি। সব সময়ে 'দিদি' ডাক যে তার পছন্দ হত, তা নয়। বয়সে বড়রা 'দিদি' বললে মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে ভাবত, এরা কি সাততাড়াতাড়ি বুড়ি বানিয়ে দিতে চায় আমাকে?

বিরক্তি বেশিক্ষণ থাকত না। দিদি হওয়ার গরিমা উপভোগ করে তা বাঁচাতে প্রলুব্ধ হত। যুগান্ত সৃষ্টির সঙ্কল্পে গোটা রাজ্য যত তেতে উঠছিল, কলেজে সহপাঠীদের মধ্যে, পাড়ায় বিশু, মনা, জিয়াদদের মধ্যে তত জমাট বাঁধছিল তার প্রভাব। সুদূর গ্রামে দু-একজন জমিদার, জোতদারের লাশ পড়তে শুরু হতে সংবাদপত্রগুলো 'গেল গেল' শোরগোল তুলেছিল। শুরু হয়ে গিয়েছিল এলোপাতাড়ি ধরপাকড়, রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা গেল গুলিতে ঝাঁঝরা-বুক মৃত তরুণদের। এক নয় একাধিক মৃতদেহ। সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকল। জয়াদের পাড়াতেও, শুধু পাড়ায় কেন, সারা জেলায়, ত্রিবেণী, বাঁশবেড়িয়া থেকে উত্তরপাড়া, বালি পর্যন্ত আছড়ে পড়েছিল হীরের স্ফুলিঙ্গ মেশা বিদ্রোহী চেতনার ঢেউ। ঝকঝকে শানানো ক্ষুরের আগা থেকেই আসলে হীরের আভা বেরোচ্ছিল। 'শ্রেণীঘৃণা'

'শ্রেণীশত্রু খতম' ইত্যাদি শব্দ 'জল পড়ে পাতা নড়ে' ছড়ার মত জনপ্রিয়তা পেয়ে মুখে মুখে ঘুরছিল বললে কম বলা হয়, 'ঘৃণা' 'খতম', বাস্তবে ঘটতে শুরু করেছিল। সাপের গলা টিপে উগরে তোলা বিষের মত ঘৃণায় নীল হয়ে গিয়েছিল সময়ের শরীর, বোধ-বিচার হারানো পাগলামিতে যত্রতত্র তা ছোবল দিচ্ছিল এবং 'খতম' শব্দটা বীজমন্ত্রের মত জপ করা শুরু হয়েছিল।

ছাতু আর ছাই ওড়ানোর সেই পরব থেকে বারো-তেরো বছর বয়সে 'মাইয়া মানুষ' হওয়ার অপরাধে বাদ পড়ে তার মনের মধ্যে প্রতিবাদের যে বীজ উসখুস করে উঠেছিল, তার অস্ফুট, সবুজাভ শরীর শুকিয়ে যাওয়ার বদলে ক্রমশ যে সতেজ, পুষ্ট হতে থাকল, তার কারণ, পৃথিবীর গভীরতর কোনও সুখ, না অসুখ বলা মুশকিল। তবে 'মাইয়া মানুষেরও শত্রু হয়', এই বোধ তাকে প্রবল আত্মবিশ্বাস দিল। অন্ধ্রপ্রদেশের যে সব মেয়ে, নির্মলা কৃষ্ণমূর্তি, সম্পূর্ণা, সরস্বতী আম্মা, সমাজ বদলের যুদ্ধে শহিদ হয়েছে, এমনকী মেদিনীপুর জেলে আটক কলকাতার মেয়ে জয়শ্রী রানা পর্যন্ত, সবাইকে অনতিবিলম্বে ছুঁয়ে ফেলতে চলেছে সে অনুভব করে। তার মনে অচেনা জেদ আর কঠিন সঙ্কল্প জেগে ওঠে। কলেজের বাইরে নিজের এলাকার সমবয়সী বন্ধুরা, এমনকী বয়স্করা, অভিভূতের মত তাকে নতুন চিন্তার বার্তাবহ হিসেবে মেনে নেয়। নানা রঙের প্রতিপক্ষ, এলাকায় কম ছিল না। তারা বুঝতে পারে দু'বেণী বাঁধা ফরসা, ছিপছিপে, কলেজে পড়া এই মেয়ে, তাদের পায়ের তলার মাটি ধীরে ধীরে দখল করে নিচ্ছে। তাদের সমর্থনের বৃত্ত যত ছোট হচ্ছে, তত ভিড় বাড়ছে খুকুমণিকে ঘিরে। 'খুকুমণি' নামেই পাড়াপড়শিরা ছেলেবেলা থেকে তাকে চিনত। 'জয়া' নামটা তারা জেনেছিল পরে। তখন সে ছোটখাট মিছিল নিয়ে বেরোতে শুরু করেছে। মিছিলের সামনে থাকছে নিজে। সমর্থকদের ঘরে প্রায়ই গ্রুপ বৈঠক করছে। কলকাতা, শ্রীরামপুর, বালি, আসানসোল থেকে নেতা গোছের কাউকে ধরে এনে হাজির করছে সেইসব বৈঠকে। তাদের পাড়ায় তখনই এক বিকেলে এমন একটা ঘটনা ঘটল, যার জন্যে সে তৈরি ছিল না। প্রতিপক্ষের এক তরুণ কর্মী, স্কুলমাস্টার, সত্য ঘোষালের ছেলে, বারিদ, শেষ বিকেলে খুন হয়ে গেল। কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে মুড়ি, চা খেয়ে জয়ার তখন হিমানির সঙ্গে পাড়ায় বড় জনসভা করার বিষয়ে কথা বলছিল। ঝড়ের মত জিয়াদ এসে খুনের খবরটা দিয়ে তাকে বলেছিল, বাড়ি থেকে তুই পালা। বারিদের 'বডি' নিয়ে ওরা মিছিল করে তোদের বাড়ির দিকে আসছে। কয়েক জনের সঙ্গে 'আর্মস' আছে। তোর খোঁজে এ বাড়িতে ওরা চড়াও হবে। আমি যাই। আমাকেও গা-ঢাকা দিয়ে কয়েকদিন থাকতে হবে।

জিয়াদের কথাগুলো জয়া পরিষ্কার বুঝতে পারল না। কিছুটা ধাঁধা খেল সে।

কয়েক মিনিট বাদে ছোট ভাই সুকুমার বাড়িতে এসে, 'সাঙ্ঘাতিক এক কাণ্ড ঘটেছে' বলে যে বিবরণ শোনাল, তা থেকে জয়ার বুঝতে বাকি থাকল না জিয়াদের

দেওয়া খবরটা মিথ্যে নয়। সুকুমার ফিরছিল ফুটবল খেলে। ক্লাস এইটে পড়ে সে। রাজনীতির কিছু না বুঝলেও বারিদের মৃতদেহ ঘিরে যে ভিড় জমছে এবং খুনিদের কালো হাত কেটে নেওয়ার জন্যে ঘন ঘন স্লোগান উঠছে, সে শুনেছে। তার দিদি জয়ার হাত কেটে নিতে মিছিল তাদের বাড়িতে আসছে, এ ধারণা তার হয়নি। আনোয়ার চলে যেতে বাড়িতে সকলে জেনে গেল জয়ার জীবন নিয়ে এখন টানাটানি শুরু হবে। প্রতিহিংসায় অন্ধ কেউ মিছিল থেকে গুলি চালিয়ে জয়ার বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। মিছিলের সঙ্গে পুলিস থাকলেও জয়াকে বাঁচানোর চেষ্টা তারা করবে না। বরং সর্বনাশী এই মেয়েটাকে নিকেশ করতে প্রতিপক্ষকে সাহায্য করবে। বাড়ির সবাই যখন ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে, জয়াকে শাপশাপান্ত করছে, ঘর থেকে দূর করে দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে, জয়ার মা, সুখলতা তখনও শান্ত, মুখে কথা নেই। জয়াকে ঘরের বাইরে নিয়ে ফিসফিস করে কিছু বলে উঠোনের দিকে পাঠিয়ে দিল। বিধবা পিসি থাকল জয়ার পাশে। মাইয়াছেলের যে এত ভয়ঙ্কর শত্রু থাকতে পারে, পিসির ধারণা ছিল না। সুখলতার পরামর্শ অনুযায়ী উঁচু খাটাপায়খানার নীচে মলমূত্রে বোঝাই মাটির গামলার পাশে তাকে পিসি বসিয়ে দিল। বারিদের মৃতদেহ নিয়ে তখনই তাদের বাড়িতে ঝাঁপিয়ে পড়ল হল্লাবাহিনী। কারও হাতে রিভলভার, কারও হাতে নেপালা, চপার। 'সেই ডাইনিটা কোথায়' চিৎকার করছে কেউ, 'তাকে কচুকাটা করব', 'আগুনে পুড়িয়ে মারব' কয়েকশো গলার হুঙ্কার, দাপাদাপিতে একতলা ছোট বাড়িটা কাঁপতে থাকল। মনে হল, ধুলোয় মিশে যাবে বাড়ি। জয়া বাড়িতে নেই, কথাটা কেউ বিশ্বাস করল না। প্রতিটা ঘর, রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর তন্নতন্ন করে খুঁজে পায়খানাতে পর্যন্ত উঁকি দিয়ে জয়ার নাগাল না পেয়ে তারা ফুঁসতে থাকল। অকথ্য খিস্তিতে কাঁপিয়ে তুলল চারপাশ। খাটিয়াতে শোয়ানো বারিদের বডি, তারা কাঁধে তুলে নেওয়ার আগে, ময়নাতদন্তের জন্য লাশের দখল নিল পুলিস। মিছিলের সঙ্গে পুলিসের যে কালো ভ্যান আসছিল, তার গহ্বরে ঢুকে গেল বারিদের 'বডি'। অশ্রাব্য গালিগালাজের সঙ্গে বারিদের দলের লোকজন বলছিল, শুধু ডাইনিটাকে নয়, তার পরিবারের প্রত্যেকের লাশ, তারা নামিয়ে দেবে।

পায়খানার গামলার পাশে, যেন এক অন্ধকার নরকে কোলকুঁজো হয়ে প্রায় কেঁচোর মত তাল পাকিয়ে, নিজের শরীরের ভেতরে শরীরকে আত্মসাৎ করে, অদৃশ্য হয়ে থাকার প্রাণান্ত চেষ্টা দাঁতে কামড়ে জয়া বসেছিল। বারিদকে কারা খুন করেছে, অনুমান করতে তার অসুবিধে হচ্ছিল না। দলের মধ্যে মহান নেতার অনুগামীরা লাশের পর লাশ নামিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করতে রাজি নয়, সে জানে। শ্রেণীঘৃণার সঙ্গে মানুষের ওপর গভীর আস্থা আর প্রগাঢ় ভালবাসা বজায় রাখতে হয়, তারা স্বীকার করে না। নিজেদের ইচ্ছেকে তারা সাধারণ মানুষের ইচ্ছে হিসেবে অনুগামীদের গিলিয়ে দিতে চাইছে। তারা প্রমাণ করতে

চাইছে, তাদের মত বিলকুল দেশবাসী রক্তপিপাসু হয়ে উঠেছে। তারা রক্ত দেখতে চায়, শ্রেণীশত্রুর রক্তস্রোতে সাঁতার কাটতে চায়। খুনোখুনি করা যাদের পেশা, এই মওকায় তারা রাজনীতির মুখোশ পরে দলে ঢুকে পাল্টে দিতে চাইছে ইতিহাস নির্মাণের চালচিত্র। মগরার বালিখাদানের লরিওলাদের কাছ থেকে হিস্যা আদায়কারী খুনে আর লুঠেরারা নিজেদের খেয়োখেয়ি আড়াল করতে সম্প্রতি 'কমরেড' সেজে নানা দলে আশ্রয় নিচ্ছে এবং চুটিয়ে পিস্তল, রিভলভারের ব্যবসা করছে. জয়াকে এ খবর সমীরকাকু আগেই দিয়েছিল। জয়ার দলের বাড়বাড়ন্ত ঠেকাতে নতুন গজানো কিছু কমরেডকে নিজের দলে জায়গা করে দিয়েছিল বারিদ । শুধু বারিদ কেন, তাদের দলেও এরকম দু-একজনের আনাগোনা শুরু হয়েছে। দল বাড়াতে তাদের বসেবশে রাখার চেষ্টা করছে মহান নেতার অনুগামীরা। সমীরকাকুকে তারা খুন করে দিলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তারাই খুন করেছে বারিদকে। সত্যমাস্টারের ছেলে বারিদ যে বাবার মত সজ্জন ছিল না, বালিখাদানের চোরাগলিতে তার যাতায়াত ছিল, অনেকে জানে। সে আচমকা খুন হয়ে যাবে, জয়া কল্পনা করেনি। বারিদ একই পাড়ার ছেলে। স্কুলে পড়ার সময় থেকে তাকে জয়া চিনত। রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাসিমুখে দুজনে কতবার যে কথা বলেছে, তার হিসেব নেই। নিজেদের দলের মধ্যে থেকেও পয়দা কামানোর লোভে পড়ে গিয়েছিল বারিদ। সে নিজেই নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছে। সে বেঁচে থাকলে তার মৃত্যুর জন্য কারা দায়ী, বলতে পারত। তার খুনের দায় থেকে জয়াকে সে অব্যাহতি দিয়ে প্রকৃত খুনেদের চিনিয়ে দিত। তা আর সম্ভব নয়। দলের সামনের সারিতে চলে আসা খুনেদের ঠেকাতে হবে। কিছুদিন আগে সুপার্থর উন্মাদ দাদাকে তারা বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক পিটিয়ে, আধমরা করে প্রথমে হাসপাতালে, পরে জেলে পাঠিয়ে দিয়েছে। খবরটা কানাঘুষোয় জয়া শুনলেও আগ্রহ দেখায়নি। প্রকৃতপক্ষে সুপার্থ সম্পর্কে তার মনে ক্রমাগত ঘৃণা বাড়ছিল। দু'বার মাধ্যমিকে ফেল করেও সে নিজেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস ঘোষণা করে বেড়ায়, মাসে মাসে প্রেমিকা বদলায়, নতুন চিন্তায় সমাজ বদলের কাজে সে নাম লেখালেও তার সঙ্গে বনিবনা সম্ভব নয়, জয়া বুঝে গিয়েছিল। রাগের গোপন কারণ, যা কাউকে বলা যায় না, তা-ও ছিল। স্কুলের সময় থেকে তার প্রাণের বন্ধু মিতুনকে ছিনিয়ে নিয়েছিল সুপার্থ। পানপাতার মত মুখ, চাপা রঙ, অসম্ভব নরম স্বভাবের মেয়ে মিতুন, ফার্স্ট হত ক্লাসে। কবিতা পড়তে যে শুধু ভালবাসত, তা নয়, নিজে কবিতা লিখত। সঞ্চয়িতার কত কবিতা তার মুখস্থ ছিল, হিসেব করে বলা মুশকিল। জয়ার মা বলত, গোটা সঞ্চয়িতা মিতুনের কণ্ঠস্থ।

মায়ের কথা শুনে মিতুন ঠোঁট টিপে হেসে চুপ করে থাকত। গভীর দীঘিতে ভেসে থাকা পদ্মপাতার মত টলটল করত সেই মুখ। পদ্মর সৌন্দর্যকে ছাড়িয়ে যেত পাতার শোভা। লিচুতলার বাড়ি থেকে হপ্তায় দু-তিনদিন তাদের বাড়িতে

আসত মিতুন। স্কুলে পড়ার সময়ে আসত বাবার সাইকেলের পেছনে, ক্যারিয়ারে বসে। তাকে পেলেই মা চাইত কবিতা শুনতে ; একটা নয়, পরের পর, ডজনখানেক কবিতা না শুনিয়ে মায়ের কাছ থেকে সে ছুটি পেত না। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকে অনেক নম্বর পেয়ে ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করে, কেমিস্ট্রি অনার্স নিয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছিল। জয়া ছিল বি এ পাস কোর্সের ছাত্রী। লেখাপড়ার চাপে মিতুন হাত-পা ছড়িয়ে কবিতা লেখার সময় না পেলেও দু-একটা অখ্যাত লিটল ম্যাগাজিনে মাঝে মাঝে ছাপা হত তার কবিতা। জয়ার পাশে বসে, তাকে সেই সব কবিতা ঝলমলে মুখ করে মিতুন পড়াত। মিতুনের কবিতায় সব কিছু থেকেও কী যেন নেই, এমন এক অনুভূতি হলেও সে কথা জয়া বলতে পারত না। কথাটা বলার মত বোদ্ধা সে ভাবত না নিজেকে। মিতুনের কবিতা, তার পুরো প্রত্যাশা না মেটালেও কবিতাগুলো পড়তে ভাল লাগত। তার লেখা পরের কবিতাটা পড়ার সময়ে আগের পড়া কবিতাটা জয়া ভুলে যেত। কেন এমন হত, তখন না জানলেও আজ বুঝতে পারে। স্মৃতি যাকে ধারণযোগ্য ভাবে না, সময়ের স্রোতে নিঃশব্দে তা ভাসিয়ে দেয়। মিতুনের কবিতাগুলো ভাল হলেও সময়ের স্রোত সামলে শক্ত পায়ে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার মত কবিতার ভেতরের কবিতাকে এখনও খুঁজে পায়নি। কোনও এক লিটল ম্যাগাজিনে মিতুনের প্রকাশিত কবিতা পড়ে এলোমেলো কয়েকটা পাতা উল্টে হঠাৎ একটা কবিতায় তার চোখ আটকে গিয়েছিল। কবিতার চেয়ে বলা ভাল, চোখ আটকে গিয়েছিল কবির নাম দেখে। মিতুনের দিকে না তাকিয়ে কবিতাটা একবার, দুবার, তিনবার পড়ে সে টের পেয়েছিল, মিতুনের কবিতায় সব থেকেও যা নেই, এ কবিতায় তা আছে। কবিতা পড়ে বিহ্বল হলেও কবির নাম, সুপার্থ সরকার, তার চোখে অসহ্য ঠেকেছিল। মিতুনকে সে জিজ্ঞেস করেছিল, কোন সুপার্থ রে?

গোন্দলপাড়ার সুপার্থদা।

মাথার ভেতরে বিদ্যুৎ চমকে উঠলেও মিতুনকে বাজিয়ে দেখার জন্যে প্রশ্ন করেছিল, কোন কলেজে যেন পড়ে?

কলেজে তো পড়ে না!

উচ্চমাধ্যমিকে শেষ?

তা-ও নয়।

তাহলে?

দু'বার মাধ্যমিক পরীক্ষাতে ফেল করে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে, মোটর ড্রাইভিং শিখেছে। গাড়ি চালানোর লাইসেন্স পেয়ে গেছে। সংসারে এত অভাব যে সারাদিন চাকরি খুঁজে বেড়ায়।

মিতুনের পদ্মপাতার মত মুখটা হঠাৎ স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠতে জয়া প্রশ্ন করেছিল, সুপার্থর প্রেমে পড়েছিস নাকি তুই?

তার প্রশ্নের জবাব দিতে মিতুনকে একাধিকবার ঢোক গিলতে দেখে সে আর খোঁচায়নি। মিতুনের হাবভাব দেখে, প্রশ্নের জবাব পেয়ে গিয়ে জয়ার মনে হয়েছিল, সুপার্থ সম্পর্কে এত খবর মিতুন পেল কোথা থেকে? কানাঘুষোয় চালু খবরগুলোর চেয়ে মিতুনের খবর একদম আলাদা! আলাদা হওয়ার কারণ, এগুলো সত্যি। মাধ্যমিক পরীক্ষায় সুপার্থর দুবার 'ফেল' করার ঘটনা এমন বিশ্বাসযোগ্য গলায় মিতুন বলল কীভাবে? সুপার্থর পরিবারে অনাহারের বিবরণ, মিতুনের কাছে জয়া প্রথম শুনল। যার পরিবারে এত অভাব, বিদ্যে যার মাধ্যমিক টপকাতে পারেনি, কবিতার এই জাদুভাষা সে পায় কোথা থেকে? প্রশ্নের জবাব পেতে জয়া তৎপর হল। তখনও পাড়ার মধ্যে বারিদ খুন হয়নি।

তিন

গঙ্গা থেকে উঠে আসা জোরালো হাওয়াতে মুখ ভাসিয়ে বসে থাকতে আরাম লাগলেও স্ট্র্যান্ডে ভিড় কমতে দেখে বেঞ্চ ছেড়ে জয়া উঠে দাঁড়াল। ছিনতাইয়ের ভয়ে নয়, ছোট বোন হিমানী আর তার স্বামীকে দুশ্চিন্তামুক্ত করতে তাদের বাড়িতে ফিরতে চাইল। স্ট্র্যান্ড থেকে একটা সাইকেল রিকশা ধরে হিমানীর বাড়িতে যখন পৌঁছোল, আটটা বাজতে দেরি নেই। প্রভাত বলল, আটটা পর্যন্ত দেখে আপনাকে ডাকতে যেতাম।

জয়া হাসল। হিমানী বলল, খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোকে। তাড়াতাড়ি খেয়ে, ঘুমিয়ে পড়।

জয়া বলল, ভাল করে আগে স্নান করি, তারপর খাব।

স্নান সেরে, পোশাক বদলে জয়ার খেতে বসতে রাত ন'টা বাজল। বসার আগে হিমানী, প্রভাতকে প্রায় জোর করে টেবিলে ডেকে নিল। খুব একটা আপত্তি করল না, দু'জনের কেউ। রাত দশটার বদলে দিদির সঙ্গে রাত ন'টায় এক টেবিলে খেতে বসার সুযোগ যখন এসেছে, তখন তা হাতছাড়া করে লাভ কি? চোখের সামনে প্রজ্বলন্ত প্রদীপের শিখার মত এই দিদি-ই তো পঁয়ত্রিশ বছর আগে আলো ছড়াত। জীবনকে দেখতে, চিনতে দিদিই শিখিয়েছিল। ভাইবোনদের বুকে সাহস আর আত্মমর্যাদা পুরে দিয়ে পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। দিদিকে সবচেয়ে বেশি কাছাকাছি পেয়েছিল হিমানী। আজও সে দিদির গুণমুগ্ধ। পেছনে ফেলে আসা সময়ের কাহিনী অনর্গল শুনিয়ে চলেছে হিমানী। পাতের ভাত ঠান্ডা

হলেও তার গ্রাহ্য নেই। হিমানীর কিছু কথা কানে গেলেও সবটা জয়া শুনছে না। সে রয়েছে নিজের স্মৃতির ঘোরে, যার অনেকটা পাঁচজনের হলেও বেশিটা তার একার। সুপার্থর কবিতাটা আরও কয়েকবার পড়ার জন্যে মিতুনের কাছ থেকে পত্রিকাটা চাইতে গিয়েও তার মুখ থেকে কথা সরেনি। অথচ সুপার্থর কবিতার শৈল্পিক বিভঙ্গে এতটা আচ্ছন্ন হয়েছিল, যে তার লেখা আরও কিছু কবিতা পড়ার জন্যে অস্থিরতা জেগেছিল তার মনে। কবিতা পড়তে শিখিয়েছিল মা। বলত, কবিতাপ্রেমী হয়েও নিজে কবি হতে চেষ্টা করিসনি। পড়ার অভ্যেসটাই তাহলে চলে যাবে। নিজেকে ছাড়া কাউকে কবি মনে হবে না।

মায়ের নির্দেশ জয়া মেনে নিয়েছিল। কবিতা পড়ার নেশা ধরে গিয়েছিল তার। সত্যিকার কবিতা, একনজরে চিনতে পারত। সুপার্থর কবিতা পড়ে তার বুকের ভেতর এক-ঝলক সোনালি হাওয়া বয়ে গিয়েছিল। মিতুনকে না জানিয়ে চন্দননগর বাসস্টপের বাঁ পিঠে, স্টলে সাজানো কয়েকটা লিটল ম্যাগাজিন হাতড়ে সুপার্থর কবিতা খুঁজেছিল। স্টল-মালিক তার মুখচেনা। তাকেও অচেনা ঠেকেনি স্টল-মালিকের। জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি কোন পত্রিকা খুঁজছেন?

সুপার্থ সরকারের কবিতা ছাপা পত্রপত্রিকা খোঁজের কথাটা বছর চল্লিশের স্বল্প চেনা মানুষটাকে সে জানাতে পারেনি। বলা যায়, জানাতে চায়নি। জিজ্ঞেস করেছিল, আপনার স্টকে পুরনো পত্রপত্রিকা কিছু আছে?

বেশি না হলেও, আছে।

কয়েকটা দেখা যায়? বিশেষ করে এই জেলা থেকে যেগুলো বেরিয়েছে, দেখাতে পারেন?

ঘরের ভেতর থেকে দড়ি বাঁধা, মলিন পত্রপত্রিকার একটু স্তূপ নিয়ে এসে তার চেয়ে বেশি মলিন একটা কাপড় দিয়ে, ধুলো আর ছিন্ন মাকড়সার জাল পরিষ্কার করে দোকানি বলল, দেখুন।

দড়ির বাঁধন নিজের হাতে খুলে, পঞ্চাশটা প্রায় অখ্যাত পত্রিকার পাতা উল্টে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সূচিপত্রে চোখ বুলোতে থাকল জয়া। 'অনুভব' নামে যে পত্রিকায় মিতুনের মুদ্রিত কবিতার পাশাপাশি সুপার্থর কবিতা ছাপা রয়েছে মলাট দেখে, জয়া সেটা চিনতে পারল। আরও একটা পত্রিকা, নাম 'অসুখ', সেখানেও কবিতার সূচিপত্রে দেখল, সুপার্থর নাম। 'হাফ' দামে পত্রিকা দুটো কিনে নিয়েছিল জয়া। সে দরাদরি করার আগেই স্বেচ্ছায় পঞ্চাশ শতাংশ ছাড় দিয়েছিল দোকানি। 'অনুভবে' ছাপা সুপার্থর কবিতা মিতুনের সূত্রে আগে একবার পড়ে যতটা অভিভূত হয়েছিল, পত্রিকা কিনে বাড়িতে এনে দ্বিতীয়, তৃতীয়বার পড়ে তা আরও গভীর হল, নিস্তব্ধ হল। মাধ্যমিক ফেল, মেয়ে-ভুলনো একটা ছেলে কীভাবে এমন কবিত্ব আয়ত্ত করল, এ মায়া, না অলৌকিকতা সে বুঝতে পারল না। 'আমার জীবন এই পথে ঘাটে মাঠের ভিতর/চিরদিন জ্বলে থাকে স্থির' লাইনটা, তার মাথার

মধ্যে কাচের ঘরে আটকে পড়া মৌমাছির মত গুনগুন করতে থাকল। 'অসুখ' পত্রিকায় ছাপা কবিতাটাও সমান মুহ্যমান করেছিল তাকে। বাড়িতে কবিতার সবচেয়ে বড় সমঝদার মা-কে কবিতা দুটো পড়িয়ে তার অভিমত জানতে চেয়েছিল জয়া। মত প্রকাশের আগে তৃতীয় দফায় 'অসুখ'-এ প্রকাশিত কবিতা, মা এত তন্ময় হয়ে পড়ছিল, যে মেয়ের প্রশ্ন তার কানে গেল না। স্পষ্ট উচ্চারণ, থেমে থেমে কবিতার যে লাইনগুলো মা পড়ছিল, জয়ার মগজে তা চিরকালের মত আটকে যায়।

"পায়ের নীচের মাটি আসন্ন আলোয় ছলকে গেল
ভারবাহী অন্ধকার মুহূর্তে উধাও
'কারা যাও? কারা যাও
চৈতন্যে গভীর রোদ ভাষা পেল"

কবিতার নাম জয়া যতদূর মনে করতে পারে, 'পায়ের নীচের মাটি'। কবিতা পড়া শেষ করে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে থেকে মা জিজ্ঞেস করেছিল, সুপার্থ নামের এই কবিকে তুই চিনিস নাকি?

গোন্দলপাড়ায় থাকে। এখানে-ওখানে দেখেছি। আলাপ নেই।

কত বয়েস?

আমাদের থেকে একটু বড়। ধর, তেইশ-চব্বিশ।

কী করে?

জানি না, শুনেছি মাধ্যমিকে ফেল। দু'বার।

কথাটা শুনে মা ঈষৎ ধাক্কা খেলেও নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, স্কুলে. রবিঠাকুরের লেখাপড়াও ক্লাস এইট পর্যন্ত!

মায়ের কথার ভেতরের মানেটা জয়া যখন বোঝার চেষ্টা করছে, মা বলল, উচ্চশিক্ষিত মানুষরা প্রতিভাবান শিল্পী হয় না।

শিক্ষার সঙ্গে প্রতিভার শত্রুতা আছে নাকি?

শিক্ষার সঙ্গে নেই, শত্রুতা আছে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে।

পত্রিকা উল্টে রেখে মা বলেছিল এ ছেলে বড় কবি হবে।

মায়ের সঙ্গে তার ধারণার এমন সপাট মিল পেয়ে জয়া অবাক হয়নি। সুপার্থর চরিত্র যে স্বচ্ছ নয়, স্বভাবে মেয়েবাজ, এ কথাগুলো জয়া বলতে পারল না মাকে। এত খবর, মাকে জানানোর কি দরকার? সবচেয়ে বড় কথা, যার সঙ্গে মিতুন জড়িয়ে পড়েছে, তার বিরুদ্ধে কিছু বলা শোভন নয়। মা ভালবাসে মিতুনকে, মেয়ের মত স্নেহ করে। লেখাপড়ায় উজ্জ্বল, মিতুন যে প্রখর বুদ্ধিমতী, এ নিয়ে মায়ের সন্দেহ নেই। মায়ের আস্থা, সে কেন টলিয়ে দেবে? সবচেয়ে বড় কথা সুপার্থ কবি। অঙ্কুরিত বীজের মতো এই কবি যে অদূর ভবিষ্যতে প্রথম পাঁচজন বাঙালি কবিকে টপকে যাবে না, কে বলতে পারে?

জয়া যখন সুপার্থর স্মৃতি রোমন্থন করছে, সাড়ে তিন দশক আগের এক ভয়ঙ্কর সন্ধের বিবরণ শোনাচ্ছিল হিমানী। তাদের বাড়ির সদর দরজার সামনে, তালপাতার চ্যাটাইয়ের ওপর বারিদের নিষ্প্রাণ শরীর রেখে পঞ্চাশ-ষাটজন মানুষ রক্তের বদলে রক্ত নেওয়ার জন্যে দাপাদাপি করছিল। শোবার ঘর, চানঘর, রান্নাঘরে ঢুকে খাটবিছানা, বালতি হাঁড়ি কড়া, উল্টেপাল্টে, লাথি মেরে সরিয়ে জয়াকে খুঁজছিল। বারিদের মৃত্যুর বদলা নিতে খুন করতে চাইছিল জয়াকে।

স্ত্রীর মুখ থেকে বহুবার শোনা এই বিবরণ আরও একবার শ্বাস বন্ধ করে প্রভাত শুনলেও জয়া অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। বিকেল থেকে স্ট্র্যান্ডের ধারে গঙ্গার বাতাস মিশে তার মাথার ভেতরে যে মাতাল হাওয়া বইছিল, সেখানে স্থির হয়ে যে দাঁড়িয়েছিল, রোগাটে, লম্বা, ফরসা গায়ের রঙ, মাথাভর্তি কোঁকড়া কালো চুল, দুটি চোখ স্তিমিত প্রদীপ, দেখলেই বোঝা যায় পুষ্টির অভাব, সে সুপার্থ। বাঘাটি কলেজের অফিস পিয়োন তার বাবা, বাড়িতে পাগল দাদা, ষোলোটা সন্তান প্রসবের ধকলে মা চিররুগ্ণ, নিত্য শয্যাশায়ী, রেস্তর অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে তার লেখাপড়া, মাধ্যমিক ফেল বেকার প্রেমিককে ছেড়ে একে একে ভেগে গেছে ডলি, ইন্দ্রাণী, সকলের শেষে মিতুন, তখনই সুপার্থর সঙ্গে জয়ার পরিচয় হল। বারিদের মৃত্যুর বদলা নিতে তাকে যারা খুঁজছিল, তাদের চোখে ধুলো দিতে আত্মগোপন করেছিল সে। পুলিসও তাকে জেলে পোরার ছক কষছিল। জয়া ভয় পায়নি। সঙ্গীদের নিয়ে গোপনে সংগঠন গড়ে তোলার কাজ করছিল। তখনই তার সঙ্গে দেখা হল, সুপার্থ যার নাম। সময়ের ঝড়ঝঞ্ঝার সঙ্গে মিশে গেল নির্মাণের সর্বস্বত্যাগী সঙ্কল্প, আমৃত্যু সংগ্রাম, প্রেম, কবিতা, রমণীয় সান্ত্বনা, পৃথিবীর সমস্ত ঘাস ছেঁটে এক সহৃদয় কবিতার প্রিয় কামনার দীপ জ্বেলে দিল।

কথা থামিয়ে দিদিকে হিমানী জিজ্ঞেস করল, কী ভাবছিস তুই?

ছোট বোনের প্রশ্নে জয়া সামান্য থতোমত খেলেও সহজ গলায় বলল, 'তোর বলা ঘটনাগুলোর সঙ্গে না-বলা কথাটা' বলে, ছোট করে জয়া হাই তুলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হিমানী বলল, তোকে আর আটকাব না, দেখতে পাচ্ছি, ঘুমে তোর দুচোখ জড়িয়ে আসছে। তুই শুতে যা। দু বোতল জল, গ্লাস, বিছানার পাশে টেবিলে রাখা আছে।

জয়ার যে ক্লান্ত লাগছিল, গভীরভাবে সে ঘুমোতে চাইছিল, এতে ভুল নেই। তবু সে টের পাচ্ছিল, বিছানায় শরীর এলিয়ে দেওয়ার পরে ঘুম ছুটে যেতে পারে। বিকেলে স্ট্র্যান্ডে ফুচকাওলাকে ঘিরে তিন তরুণীর কলকাকলি শুনে, সাইকেলে স্বপ্নিল চোখ এক পুরুষকে তাদের সামনে এসে দাঁড়াতে দেখার পর থেকে, আকাশের মহা অন্ধকার ছিঁড়ে তার মাথার ভেতরে একটার পর একটা অতি জ্বলন্ত নক্ষত্রপাত সেই যে শুরু হয়েছে, তা থামেনি। মগজের ভেতরে অবিরাম সেই

নক্ষত্রপতন আজ রাতে হয়তো তাকে ঘুমোতে দেবে না। সারারাত বিছানায় ঘুমোবার সাধ বুকে জড়িয়ে শুয়ে স্মৃতিখনন করবে, হিমানীর বলা, না-বলা, প্রকৃতপক্ষে তার অজানা ঘটনাগুলোকে মনের মধ্যে সাজিয়ে কাল দুপুরের 'মানবীবাদী' আলোচনাসভার সমাপ্তিকথন তৈরি হয়ে যেতে পারে। কোথায় গিয়ে থামবে তার কথকতা? তরুণী থেকে বুড়ি হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ায়, ক্রমাগত ভাসতে থাকা অব্যক্ত হাহাকার চেপে গিয়ে, কাল্পনিক আশাবাদী গল্প শোনাবে, না সেই উষ্ণ দিনগুলোর ভেতরের যা সত্য, (বাস্তব সত্য আর অনুভূতির সত্য, সব মিলিয়ে যে সত্য, অথচ শাশ্বত সত্য নয়) তা-ই গড়ে তুলবে, তার আগামীকালের ভাষণের অন্তঃসার? সে জানে না, এখনও ঠিক করে উঠতে পারেনি কাল কী বলবে! আজ দুপুরের অধিবেশনে বসে, মনের মধ্যে সমাপ্তিভাষণের যে উত্তর-আধুনিক কাঠামো বানাতে শুরু করেছিল, তা মাঝ-বিকেলে দেখা একটা দৃশ্যে চুরচুর করে ভেঙে পড়ে এমন এক আদল তৈরি হচ্ছে, যা নিজের ব্যক্তিজীবনের পাতাবাহারি প্রচ্ছায়ার চেয়ে বেশি, গাঢ়তর রক্তের মত।

ভদ্রেশ্বর স্টেশনের পশ্চিমে যে বাড়িতে এক গোপন সভায় সুপার্থর সঙ্গে সে প্রথম কথা বলেছিল, সমীরকাকু ছিল সেখানে। ছিল আরও চার-পাঁচজন। বারিদ খুন হওয়ার পর থেকে সাতদিন গৌরহাটিতে সীমরকাকুর ছোট বোন মালা পিসির শ্বশুর বাড়িতে, অন্ধকারে লুকিয়ে থাকার মত আত্মগোপন করে থেকে সেই সন্ধেতে, জয়া প্রথম গোপন ডেরা ছেড়ে বেরিয়েছিল, মুখোমুখি বসার সুযোগ পেয়েছিল কয়েকজন মানুষের। সুপার্থকে সেখানে দেখবে ভাবেনি। হাতে-গড়া রুটি আর তরকারি খাচ্ছিল সুপার্থ। ভোল্টেজ নেমে যাওয়া 'ডুম' থেকে ম্যাড়মেড়ে আলো এসে পড়ছিল তার মুখে। গভীর মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছিল সে। গোপন সভায় সকলে যতটা সন্তর্পণে নড়াচড়া করে, নিচু । গলায় কথা বলে, তার চেয়ে কিছুটা গলা তুলে, জয়াকে দেখে দু-একজন উল্লাস প্রকাশ করলেও সুপার্থর অভিনিবেশ সামান্য টলেনি। রুটি, তরকারি আর তার মাঝখানে যেন দ্বিতীয় মানুষ নেই, শব্দ, নৈঃশব্দ্য নেই, ভয়ভীতি, মৃত্যু, জোনাকির আলো, পায়ের আওয়াজ নেই, পরিতৃপ্তিতে খাওয়া ছাড়া কোনও কাজ নেই, এমনই তন্ময় হয়ে সে খেয়ে যাচ্ছিল। খাওয়ার ভঙ্গিতে বাতাসে সে ভাসিয়ে দিয়েছিল হাতে-মাখা একতাল আটার ঘ্রাণ, মাঠ থেকে সদ্য তুলে আনা শিশিরভেজা সবজির গন্ধ। তার খাওয়ার ধরনে উনুনে সেঁকা রুটি, তরকারি থেকে ঝরে পড়ছিল তাজা শস্যের মুগ্ধতা। জয়ার নাকে, বলা যায় বুক পর্যন্ত, মুগ্ধতার সেই গন্ধ পৌঁছে গেলেও তার দিকে চোখ তুলে সুপার্থ তাকাল না। জয়া এক ঝলক দেখে সুপার্থকে চিনেছিল। প্রথম দেখাতে নজর করেছিল সুপার্থর হাতের আঙুলগুলো। এরকম লম্বা, নিটোল, খাগের কলমের মত আঙুল সে আগে দেখেনি। মুহূর্তের মধ্যে চোখ ঘুরিয়ে

নিয়েছিল সে। সভা শুরু হয়েছিল কয়েক মিনিট পরে। হাত ধুয়ে এসে বৈঠকে বসার আগে জয়াকে সুপার্থ পরম পরিচিতের মত জিজ্ঞেস করেছিল, এলাকার খবর কি?

ভাল নয়।

কয়েক দিনের মধ্যে জুড়িয়ে যাবে।

সুপার্থর কথাতে জড়তা ছিল না। নিজে থেকে আলাপ করে, কোনও ছেলে যে এত স্বাভাবিকভাবে কথা চালাতে পারে, এই প্রথম জয়া দেখল। বসার আগে জয়াকে সুপার্থ বলেছিল, মিটিংয়ের পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব। কাজের কথা, বিস্তর কাজ জমে আছে।

জয়ার সঙ্গে সুপার্থর প্রথম আলাপের সন্ধেতে যে আশ্বাস সে শুনিয়েছিল, কিছুদিনের মধ্যে তা মিলে গেল। পরিচয়ের হপ্তাখানেক পরে, বারিদকে যে গুলি করেছিল, সেই ট্যারাচাঁদুকে (প্রকৃত নাম, তারাচাঁদ, ওরফে চাঁদবাবু) পুলিস ধরে ফেলল। যে রিভলভারের গুলিতে বারিদ খুন হয়েছিল, সেটাও পাওয়া গেল চাঁদবাবুর পকেটে। গজঘণ্টার কাছে এক ডেরা থেকে তার দুই স্যাঙাতের ধরা পড়া এবং রাতারাতি একজনের রাজসাক্ষী হওয়াতে, জয়াদের বাড়িতে যারা চড়াও হয়েছিল, তারা ঝিমিয়ে গেল। সত্যি জুড়িয়ে গেল পরিস্থিতি, 'বদলা' রাজনীতির আঁচ। জয়ার গা-ঢাকা দিয়ে থাকার দিন শেষ হল। সে বাড়ি ফিরল।

রাতের খাওয়া শেষ করে; শরীরে, সারাদিনের একরাশ ক্লান্তি নিয়ে অন্ধকার ঘরে বিছানায় শুয়ে জয়া টের পেল, এই রাতে ঘুমোনো সহজ নয়। বেশি ক্লান্ত মানুষ, শরীর আর মন, দুটোই যার ক্লান্তিতে বেঁকে গেছে, তাকে, রাতে নিদ্রাহীনতা ভর করে। সে ঘুমোতে চাইলেও তার স্নায়ুগুলো জেগে থাকতে চায়, দপদপ করে। সে ঘুমোতে পারে না। দু'চোখ বুজে থাকলেও ঘরের বাইরে যে আলো জ্বলছে, সংসারের কাজ সারছে হিমানী, প্রভাতকে মাঝে মাঝে কিছু বলছে, জয়ার বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। সেই সঙ্গে বুঝতে পারছে, গৃহস্থালির কাজ সেরে, হিমানী, প্রভাত ঘুমিয়ে পড়লেও তাকে জেগে থাকতে হবে। অনন্ত স্মৃতির ভাঁড়ার খুলে বেরিয়ে আসবে হিম সূর্য, ঘুমোতে দেবে না তাকে। তাকে জাগিয়ে রাখবে, পেছনে ফেলে আসা মাঘ নিশীথের কোকিলের ডাক। অন্ধকার বিছানায় শুয়ে সারারাত হয়তো নিজের ছায়ার সঙ্গে নিজেকে লড়াই করতে হবে।

সুপার্থর সঙ্গে পরিচয়ের সময়ে সে মিতুনের ভালবাসার মানুষ, মিতুনের কথা থেকে জয়া আভাস পেয়েছিল। মিতুনের আগেও সুপার্থর একাধিক প্রেমিকা ছিল, লোকপরম্পরায় শুনেছিল। মেয়েদের গোপন খবর সবার আগে মেয়েরা জেনে যায়। ফৌজি তৎপরতায় ফাঁস করে দেয় তাদের কানে খবর পৌঁছে দেয় বাতাস। ডলি, ইন্দ্রাণী, প্রতিমা আরও কতজনের প্রেমে তেইশ বছরের জীবনে সুপার্থ

হাবুডুবু খেয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত, ব্যর্থ প্রেমিকের মত কপাল চাপড়ে নতুন প্রেমিকা খুঁজতে শুরু করেছে, তার কিছু অংশ জয়াকে বলেছিল গোলন্দপাড়ার নমিতা। সুপার্থদের বাড়ির খুব কাছে ছিল নমিতাদের বাড়ি। এক স্কুলে পড়ত তারা। নমিতা দাবি করত, তার প্রেমেও একদা পাগল হয়েছিল সুপার্থ। মাধ্যমিক ফেল, সুপার্থকে নমিতা শুধু ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয়নি, তার নতুন প্রেমিকা ডলিকে ফেলের খবর শুনিয়ে কুপোকাত করে দিয়েছিল। সুপার্থর প্রেমে অন্ধ ডলির কল্পনার বেলুন ফুটো হয়ে যেতে কেঁদে দু'চোখ লাল করেছিল সে। লম্বা, ছিপছিপে, দেবদূতের মত স্বপ্নাতুর চোখ একজন ছেলে যে এভাবে ধাপ্পা দিতে পারে, তার ধারণা ছিল না। প্রথম পরিচয়ের দিনে ক্লাস টেনের ছাত্রী, ষোলো বছরের ডলিকে সুপার্থ জানিয়েছিল, সে ইটাচুনা কলেজে ক্লাস টুয়েলভ-এ পড়ে। তার কথা চোখ বুজে বিশ্বাস করেছিল ডলি। ইটাচুনা কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত, দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র, কবি সুপার্থ মজুমদারের কবিতা পড়ে আবেগে বিগলিত হয়েছিল। কলেজে পড়া দূরে থাকুক, সুপার্থ যে মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরোতে পারেনি এবং কলেজ পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতার রচনাকার সুপার্থ হলেও হতে পারে, মেনে নিলেও সে যে সেই কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র নয়, ডলিকে জোরের সঙ্গে এ খবর জানিয়ে তার মন ভেঙে দিয়েছিল নমিতা। হাউহাউ করে ডলি কেঁদেছিল। মাধ্যমিকের মত পরীক্ষা, যেখানে ইচ্ছে করেও কেউ ফেল করতে পারে না, পাশের সেই অনিবার্য নিয়মের মধ্যেও যে ফেল করে, সে যত বড় কবি হোক, প্রেমিক হিসেবে পাঁচজনের সামনে প্রদর্শনযোগ্য নয়, এমন এক ধারণা থেকে সুপার্থর দিক থেকে ডলি মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল।

কবি হলেও সুপার্থ জালিয়াত, মাধ্যমিক পাশ করেও ইটাচুনা কলেজ পত্রিকাতে কবিতা লিখেছে। জাল ছাত্র, জাল কবি সে। কবি যে জালিয়াত হয় না, ডলি জানবে কেমন করে? নমিতার মন্তব্য অনুযায়ী, সুপার্থকে মিথ্যেবাদী জেনে ভয় পেয়ে গিয়েছিল ডলি। নমিতার বিবরণে জয়া অবিশ্বাস করেনি। সে-ও তখন ষোলো-সতেরোর মেয়ে। নমিতা, তার আপন মাসতুতো বোনের পিসতুতো বোন হওয়াতে ষোলোআনা বিশ্বাসযোগ্য। তবু নমিতাকে জয়া জিজ্ঞেস করেছিল, কলেজের ছাত্র নয়, এমন একজনের কবিতা, কলেজ ম্যাগাজিনে ছাপা হয় কীভাবে?

এক সেকেন্ড চুপ করে থেকে নমিতা বলেছিল, কলেজ ম্যাগাজিনের সম্পাদক হয়তো সুপার্থর বন্ধু ছিল। কতরকম জোচ্চুরি যে ওরা জানে।

নমিতা যে সুপার্থকে ভালবেসে, তারপর ঘৃণা করে, ফের ভালবেসে, আবার ঘৃণা করে, যন্ত্রণাদায়ক এক অনিঃশেষ অলাতচক্রে পাক খেয়ে চলেছে, জয়ার মনে এমন সন্দেহ জাগলেও, পরে এ নিয়ে কথা বলার কৌতূহল, সে বোধ করেনি।

সুপার্থ যে মেয়েভোজী, ধীরে ধীরে এ ধারণা তার মগজে গেঁথে যাচ্ছিল। সবচেয়ে বড় কথা, তার জীবনে সুপার্থর সামান্য তাৎপর্য ছিল না। এতটাই অবজ্ঞা করত যে তাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর অবকাশ পায়নি। অবকাশ পেলেও চিন্তার অনেক বিষয় ছিল, কাজ ছিল, সুপার্থর কোনও জায়গা সেখানে ছিল না। সুপার্থর বিরুদ্ধে নমিতার গরল উদ্গিরণের কারণও জয়া তখন জেনে গিয়েছিল। নমিতার বিসর্জনের বাজনা, অর্থাৎ বিয়ের পাকা কথাবার্তা চলছিল। গ্র্যাজুয়েট. ব্যাঙ্ককর্মী সেই পাত্রের বিবরণ শুনে নমিতা এমন মজে গিয়েছিল যে, নিজের জীবন থেকে মাধ্যমিক 'ফেল' সুপার্থকে চটপট ছেঁটে ফেলতে দেরি করেনি। সরাসরি তাকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছিল, বন্ধু ছাড়া সুপার্থকে সে আর কিছু ভাবে না, সুপার্থও যেন তাই ভাবে!

সেই চিঠিতে, সুপার্থর জোগাড় করে দেওয়া দুটো বই, শ্যামাপদ চক্রবর্তীর 'অলঙ্কারচন্দ্রিকা' আর লিও সাউ চি-র 'সাচ্চা কমিউনিস্ট হওয়ার উপায়'ও তাকে নিয়ে যেতে লিখেছিল নমিতা।

সযত্নে রেখে দেওয়া নমিতার সেই চিঠি, কয়েক বছর পরে, জয়াকে সুপার্থ যখন দেখায়, তার জীবনে নতুন নক্ষত্রের মত তখন ইন্দ্রাণী এসে গেছে। কম বলা হল। ইন্দ্রাণীর সঙ্গে প্রেম পর্বের অনেকটা সময় পার হয়ে বিসর্জনের বাজনাও হয়তো বেজে উঠেছিল। সুপার্থর কথাতে তেমন আভাস ছিল। বলেছিল, ভালবাসা আমার কাছে স্বপ্ন। আমায় কেউ কোনওদিন ভালবাসে না, মেয়েদের ভালবাসা কি, তাই আমার পক্ষে গুছিয়ে বলা সম্ভব নয়। তবু ভালবাসা বুকের মধ্যে জলতরঙ্গের মত বেজে ওঠে, ইচ্ছে করে ভালবাসা পেতে। এই সংগ্রামে, এই সমাজ, নতুন জীবনের গড়ার পথে একজন নারী, যে আমাকে আমার দোষগুণ মিলিয়েই চাইবে, আমার সঙ্গে সমানভাবে তুলে নেবে কাজের ভার, তেমন কাউকে পেলাম না।

ইন্দ্রাণীর পাশাপাশি মিতুন তখন কবিতার ঝুলি নিয়ে সুপার্থের কাছে পৌঁছে গেছে। ত্রিবেণীর বিশাল আমবাগানের নির্জনতম জায়গায় সুপার্থর সঙ্গে জয়ার তখন অনিয়মিত দেখা হওয়ার পর্ব শুরু হয়েছে। সমাজ বদলের কাজে বিপ্লব আর কবিতা, অথবা কবিতা আর বিপ্লব, কার গুরুত্ব বেশি, এ চিন্তায় সে তখন পাগল হয়ে গেছে। দুটোকে সমান গুরুত্ব দিয়ে, তারা যে সহযোদ্ধা, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, হাতে হাত মিলিয়ে লড়বে, এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েও সেরা কবিতাটা লেখার অলসতা আর বিপ্লবী কাজে অবহেলার জন্যে সব সময় ছটফট করত। অসম্ভব এক ঘোরের মধ্যে সব সময়ে রয়েছে, তার কথা থেকে বোঝা যেত। ভালবাসার কাঙাল ছিল সে। কবিতাসুন্দরীর ভালবাসার মত রক্ত-মাংসের একটা মেয়ের ভালবাসা পেতে নিজের বুক চিরে সে রক্ত দিতে পারত। আমবাগানের

গভীরে, সবুজ ছায়ার তলায় বসে জয়াকে যখন এ সব কথা সে শোনাত, জয়ার মনে হত, তার দিকে তাকিয়ে নিজের সঙ্গে কথা বলছে সুপার্থ। সেখানে জয়া থেকেও নেই। সুপার্থর মুখোমুখি বসে রয়েছে কবিতা আর নতুন সমাজে রচনার স্বপ্ন। যার নাম বিপ্লব! সুপার্থকে ভালবেসেও ডলি, নমিতা, ইন্দ্রাণী, মিতুনরা যে কেন সরে গেছে, জয়ার বুঝতে অসুবিধে হয়নি। অভাবে জর্জরিত, অনুচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের এই মানুষটার জন্ম, ধুলোকাদার এই পৃথিবীতে ঘটলেও যে উচ্চতায় তার মগজের ঘোরাফেরা, সেখানে তার প্রেমিকাদের কেউ কখনও পৌঁছোতে পারেনি। পারা সম্ভব ছিল না। অতিলৌকিক সে উচ্চতা অল্প মানুষ ছুঁতে পারে। সবচেয়ে কাছের মানুষদের তা অনতিক্রমনীয় থেকে যায় চিরকাল। দুবার মাধ্যমিক ফেল, পরিচয়ের মধ্যে সুপার্থকে গণ্ডিবদ্ধ করে ফেলেছিল তারা। গ্রহান্তরের মানুষ সুপার্থকে চিনতে পারেনি। সুপার্থকে চিনতে তারও কম সময় লাগেনি। সুপার্থর সঙ্গে পরিচয়ের আগে পাঁচজনের বিবরণ থেকে যে সুপার্থকে চিনেছিল, তার সঙ্গে আসল মানুষটার এত অমিল, মুখোমুখি দেখা না হলে কখনও হয়তো জানতে পারত না।

সুপার্থ জানিয়েছিল মাধ্যমিকে ফেল করার আগে ক্লাস নাইনে একবার 'ফেল' করেছিল সে। নাইন থেকে টেনে উঠতে পারেনি। উঠবে কি করে? অর্ধেকের বেশি পাঠ্যবই ছিল না। মাস্টাররা সেটা জেনেই বোধহয় ক্লাসে তাকে বেশি করে পড়া ধরত। প্রথম 'পিরিয়ড' থেকে শেষ 'পিরিয়ড' পর্যন্ত খুঁচিয়ে জেরবার করত। পড়া বলতে অবশ্যই সে পারত না। ফল যা হওয়ার তাই হত। শাস্তি পেত। কান ধরে বেঞ্চির ওপর একটা পুরো পিরিয়ড দাঁড়িয়ে থেকে পরের ক্লাসে স্কুল থেকে হাওয়া হয়ে যেত। সংসারে তখন প্রবল আর্থিক অনিশ্চয়তা! রোজ সকালে নরহরিবাবুর কাছ থেকে তিন টাকা পেত তেজেশ। টাকাটা না পেলে ছেলে, বউ নিয়ে উপোস করতে হত। তিন টাকা দিতে বুক ফেটে যেত নরহরির। প্রায়ই আড়াই টাকা, দু'টাকা বারো আনা দিয়ে বাকি আট আনা, 'জমা রইল' বলে আটকে রাখত। অথচ নরহরির কাছে হকের টাকা আনতে যেত সুপার্থর বাবা, তেজেশ সরকার। বাস্তু সংলগ্ন তার প্রায় তেইশ শতক জমি নশো টাকায় কিনে রোজ তিন টাকা করে এক বছর অর্থাৎ তিনশো ষাট দিন ধরে দেওয়ার কড়ার করেছিল নরহরি। প্রথম দিকে কিছুদিন চুক্তি মেনে টাকা শোধ করলেও তৃতীয় মাস থেকে টাকা দিতে নানা ধানাইপানাই শুরু করেছিল। ভিখিরির হাল হয়েছিল তেজেশের। তার মধ্যে সুপার্থ কোনওদিন ভাত, কোনওদিন মাইলোর জাউ খেয়ে স্কুলে যেত, স্কুলের হয়ে ফুটবল ম্যাচ খেলতে চলে যেত কখনও চুঁচুড়া, কখনও বৈদ্যবাটি, ভদ্রেশ্বর। ক্লাস নাইনে ফেল করে বাড়ি থেকে পালিয়ে বিনা টিকিটে লক্ষ্ণৌ ঘুরে সাতদিন পরে বাড়ি ফিরে শুনেছিল, সদ্য তার বাবা ব্যান্ডেলের ললিত জ্যোতিষার্ণবের

কাছে গণনা করিয়ে জেনে এসেছে, তার ছেলে দিল্লির আশপাশে রয়েছে। তোফা আছে। মাসখানেকের আগে ফিরবে না।

বাড়ি থেকে পালানোর সেই ঘটনা, নিশ্চিত কবিতার মত ভবঘুরেপনার বীজ ছড়িয়ে দিল তার মনে। অসামান্য এক কবিতা লেখার মত উদ্দেশ্যহীন পর্যটনের সাধ, ব্যতিব্যস্ত করত তাকে। দ্বিতীয়বার মাধ্যমিকে ফেল করার পরে আরও একবার বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। বাবা তখন পাঁচটা টাকা দিয়েছিল। আরও পাঁচ টাকা পেয়েছিল ব্যান্ডেলের দিদির কাছ থেকে। নিজের জীবনের এই তুচ্ছতা, অকপটে জয়াকে বলতে তার দ্বিধা ছিল না। জয়া একবার জিজ্ঞেস করেছিল, এত কষ্টের মধ্যে থেকেও কীভাবে এমন মজা করে সে কথা বলে?

জয়ার মুখের ওপর চোখ রেখে সুপার্থ বলেছিল, 'যা কিছু জীবন তাই জীবন ভেঙেই ছোটে জীবনের কাছে।'

ঠিক বুঝলাম না।

আমার কবিতার লাইন। নজর করো, 'জীবন' শব্দটা এক লাইনে তিনবার ব্যবহার করেছি, কারণ জীবনের গায়ে কোনও কষ্ট, শোক ছাপ ফেলে না।

সুপার্থর পুরো কবিতাটা পরে একদিন জয়া পড়েছিল।

জয়ার সঙ্গে একবার খোস গল্পের মধ্যে সুপার্থ বলেছিল, একজন আস্ত মানুষ ধরে নিয়ে একজন মেয়ের সঙ্গে আমি মিশতে চাইলেও মেয়েটা তা চায়না। আমার অজান্তে ধীরে ধীরে সে 'মেয়ে' হয়ে উঠে ক্রমশ 'মেয়েমানুষ' হয়ে যেতে চায়। তখন শুরু হয় আমার কষ্ট, মোহভাঙার বিপদ।

বাইরের দালানে আলো নিভিয়ে হিমানী শোয়ার ঘরে ঢুকল। সুইচ নেভানোর শব্দ শুনল জয়া। প্রভাত নিশ্চয় এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। নিস্তব্ধ রাত। কাছাকাছি কোনও ঝোপঝাড় থেকে একটানা ঝিঁঝি ডেকে চলেছে। জয়া টের পাচ্ছিল, 'মানবীবাদ' নিয়ে আলোচনার সমাপ্তি ভাষণ, মগজের মধ্যে সাজাতে শুরু করে বড় বেশি করে একজন পুরুষের কাহিনী এসে যাচ্ছে। প্রেমিক সুপার্থর বৃত্তান্ত নয়, তাকে শোনাতে হবে একটা মেয়ের স্বাধীনচেতা হয়ে ওঠার সুতীব্র বিবরণ। নিজের আত্ম-উন্মোচন শুরু করে, সে পথ হারিয়ে অন্য ঘটনায় সুপার্থর বৃত্তান্তে পৌঁছে গেছে। কেন এমন হয়? অতিমানব আর কাব্যিক হয়ে উঠছে সুপার্থ চরিত্র। তার আড়ালে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে সে। বাস্তবে সেরকম ঘটেনি। সুপার্থর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লেও নিজের অবস্থানে সে স্থির ছিল, হাতের মুঠো কোনওভাবে আলগা করেনি। জীবনের প্রত্যন্তে পৌঁছে, পেছন ফিরে তাকালে তবু সেই নিবিড় আবহ বারবার ফিরে আসে। সামনে এসে দাঁড়ায় সুপার্থ। অনুপস্থিত থেকেও জয়ার জীবনের পরের পঁয়ত্রিশ বছর, স্বামী, ছেলে চেনাজানা কত মানুষ, এমনকী তার আপ্ত জীবনটা পর্যন্ত আড়াল করে দেয়। হিমানীর বাড়ির

অন্ধকার বিছানায় শুয়ে মাঝ-নিশীথের কাছাকাছি পৌঁছে সুপার্থর আড়াল থেকে জয়া বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করছিল।

চার

শত্রুর চোখে 'শত্রু' চিহ্নিত হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টায় সফল হয়ে, গৌরহাটির আশ্রয়ে দিন-দশেক গা ঢাকা দিয়ে কাটিয়ে জয়ার সাহস, আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল। বলা যায়, নবজন্ম হল তার। নিজের আত্মপরিচয় খুঁজে পেল। বৈরীভাবাপন্ন মেয়েকে ভোগের সামগ্রী ভাবলেও তাকে, অতি বড় পাষণ্ড কেন শত্রু হিসেবে পাত্তা দেয় না, তার শত্রুতাকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার মত হালকা সামগ্রী ভাবে, তার কারণ, জয়া যে জানে না, এমন নয়। জয়া জানে। বিধবা পিসির সেই অমোঘ মন্তব্য, 'মাইয়া মানুষের আবার শত্রুমিত্র আইব কোথা থিকা, মাইয়া মানুষ আবার মানুষ' বালিকা বয়সে শুনে মনে রেখেছে। চিরকালের মত প্রবচনটা তার মনে জায়গা করে নিয়েছে। কথাটা জয়া না মানলেও মন থেকে হটাতে পারেনি। পুরুষরা, তাদের দাসীবৃত্তি করে, পোঁ ধরে থাকা মেয়েরা, 'মানুষ' মনে করে না নিজেদের। মানুষই শত্রুতা করতে পারে মানুষের, মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধুত্ব হয়। মেয়েরা যেহেতু মানুষপদবাচ্য নয়, তাই শত্রু বা বন্ধু তারা হতে পারে না, সে যোগ্যতা তাদের নেই। স্কুলের ছাতে লাল পতাকা তোলার সময় থেকে, বারিদ খুন হওয়ার ঘটনাতে কাকতালীয়ভাবে জড়িয়ে পড়ে, সে-ও যে কম বিপজ্জনক 'শত্রু' নয়, শত্রুপক্ষকে তা জানিয়ে দিয়েছে। জানাতে পেরে খুশি হয়েছে। যৌথ পরিবারে তার মা, দু-একজন জেঠিমা, কাকিমা, তার থেকে কমবয়সীরা বাদে, বাকি গুরুজনদের সকলে তার আত্মপরিচয় খোঁজার এই ছটফটানিকে 'ধিঙ্গিপনা' ধরে নিয়ে খুশি হয়নি। দু-একজন খোলাখুলি বলল, আমের টুকরির একটা পচা আম যেমন টুকরির সব আম পচিয়ে দেয়, তেমনি এই 'ধিঙ্গি' মেয়েটার পাল্লায় পড়ে পরিবারের সব ছেলেমেয়ে বিগড়ে যাবে।

জয়াকে 'ধিঙ্গি' অভিহিত করে, তোলা হাঁড়ির মত মুখ করে পরিবার ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার ছক কষতে থাকত তারা। বাড়ির পরিবেশ বদলে গেছে টের পেয়েও জয়া গ্রাহ্য করেনি। মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজের ধারা বদলে ফেলল। বাড়ি, কলেজ আর কলেজ, বাড়ি করার ফাঁকে, তার ছোট পৃথিবী ক্রমশ রণক্ষেত্র হতে চলেছে, টের পেয়ে এলাকার সরকারি হাসপাতালে, নিয়মমাফিক নার্সিংয়ের

ছাত্রী না হয়ে, 'নার্সিং'-এ ট্রেনিং নিতে শুরু করল। বুদ্ধিটা তাকে দিয়েছিল সমীরকাকু। হাসপাতালে চেনা এক ডাক্তারের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছিল। সমীরকাকুর কথাতে নার্সিং-এ শিক্ষানবিশি শুরু করলেও কাজটা যে তার খুব পছন্দের ছিল, এমন নয়। যে মনস্তত্ত্ব থেকে তাকে নার্সিং শিখতে সমীরকাকু পাঠাল, সেটাও পুরনো, রক্ষণশীল, জয়া বুঝে গিয়েছিল। মেয়েদের যোগ্যতাকে খাটো করে দেখা শুরু সংসারে নয়, বিপ্লবী শিবিরেও আছে। বিপ্লবীদের নিরাপদে রাখতে গেরস্ত বউ, মেয়েরা তাদের আশ্রয় দেবে, বিপ্লবীদের গোপন বৈঠকে বারবার জলখাবার, চা, পান জোগাবে, ব্লাউজের নীচে জরুরি চিঠি রেখে পৌঁছে দেবে এক ঠিকানা থেকে অন্য ঠিকানাতে, কেউ অসুস্থ, আহত হলে, তার সেবাশুশ্রূষা করবে, এই তো মেয়েদের কাজ! মেয়েরা এর বেশি কী করতে পারে? কোনও পুরুষকর্মীকে নার্সিং শিখতে দল থেকে পাঠানো হয় না। তারা বীর হনুমানের দল, তাদের জন্যে নির্দিষ্ট করা থাকে লঙ্কাকাণ্ড ঘটানোর মত বীরত্বপূর্ণ কাজ। অত বীরত্ব মেয়েদের আছে নাকি? মেয়েদের জন্যে আলাদা কাজের ফর্দ তৈরি করার প্রধান কারণ, তাদের শত্রু নেই, মেয়েদের পেছনে পুলিসের ফেউ লাগে না, তারা সব সন্দেহের ঊর্ধ্বে। মেয়েদের মূল্যায়ন, পাতি-সংসারী মানুষ আর অগ্নিভুক বিপ্লবীতে বিশেষ তফাত নেই, অল্প সময়ে জয়া জেনে গিয়েছিল। সে ধরে নিয়েছিল, পুরুষ বিপ্লবী মাত্রই এরকম। মেয়েরা যে বিপ্লবী হতে পারে না, এই মাতব্বরি পিতৃতান্ত্রিক ধারণা সব পুরুষের মত তাদের রক্তেও মিশে আছে। তার ভাবনার জগৎকে পাল্টে দিয়েছিল সুপার্থ। সেটা আরও পরের ঘটনা। সব ভালবাসা শেষ হয়ে গেছে ভেবে সুপার্থ যখন বুকভর্তি হাহাকার নিয়ে ঘুরছে, অসাধারণ একটা কবিতা লেখা শেষ করে নিজেকে নিলামে বেচে দেওয়ার কথা ভাবছে, এমনকী আত্মহত্যা করতে পিছপা নয়, তখনই এক ঘুঘুডাকা দুপুরে ত্রিবেণীর এক দুর্ভেদ্য আমবাগানের নির্জনতম প্রান্তে, দলের গোপন ডেরার কাছাকাছি একচিলতে সবুজ ভূমিতে বসে নিজের জীবনের অনেক কথা সে শুনিয়েছিল জয়াকে। জয়া সেখানে পৌঁছোনোর আগে, সেই সকালে, মগরা স্টেশন উড়িয়ে দেওয়ার জন্যে বোমা বেঁধেছিল সাতটা। মগরা স্টেশন 'অ্যাটাক' করার কথা ছিল রাত দশটায়। দলের ওপরতলা থেকে সেরকম নির্দেশ এসেছিল তার কাছে। বোমা বাঁধার মাঝখানে এক সময়ে বুকের মধ্যে শুনেছিল কবিতার ডাক। শব্দহীন, বিমূর্ত সেই ডাকের মধ্যে বহুদূর থেকে ভেসে আসা নতুন পৃথিবীর পদধ্বনি শুনতে পেয়ে যে কবিতাটা লিখেছিল, তা পড়ে শুনিয়েছিল জয়াকে।

অন্ধকার বিছানায় শুয়ে বহু বছর বাদে কবিতার প্রতিটা শব্দ জয়া মনে করতে পারল। এ কবিতা ভোলার নয়। সত্যি কথা বলতে কি আজও রোজ আপনমনে, ভারি নিঃশব্দে, গোপন কথার মত লাইনগুলো সে আওড়ায়।

'সারাক্ষণ যে গ্রাম আর শহর

বুকের ভিতর
ক্রমশ উদ্দাম হয়ে ওঠে
তাকে তুমি কোন জাদু ঠোঁটে
গড়ে তোলো মৃত্যুহীন আলোর সুমুখে?
আমাদের বুকে
সেই ইচ্ছা বারবার, বারবার সুখে
দৃপ্ত দিনে সমুদ্র বিলীন।
তবু এই প্রাণ মৃত্যুহীন
তবু এই জন্ম মৃত্যুহীন।'

কবিতা পড়া শেষ করে জয়ার মুখের দিকে দুটো জীবন্ত চোখের দৃষ্টি রেখে কয়েক সেকেন্ড বসে থেকে সুপার্থ বলেছিল, 'জাদু ঠোঁট' শব্দ দুটো লেখার সময়ে তোমাকে মনে পড়েছিল, কেন পড়ল?

উনিশ বছরের তরুণী জয়া লজ্জা পেলেও মুখের লালচে আভা, তখনই মুছে ফেলতে বলেছিল, বানানো কথা বোলো না।

সবটাই তো বানানো। এই কবিতা, জীবন আর নতুন পৃথিবী গড়ার সঙ্কল্প, সবই আমাদের বানানো, নিখুঁতভাবে বানিয়ে তুলতে হবে।

সে বানানোর কথা বলছি না। আমি বলছি, কবিতা লেখার সময়ে আমাকে তোমার মনে পড়ার কথাটা মিথ্যে।

একদম নয়।

হ্যাঁ মিথ্যে, মিথ্যে বোলো না?

আগে বলতাম। ডাইনে-বাঁয়ে মিথ্যে বলতাম। এখনও বলি, তবে একটু অন্যভাবে। সত্যের সঙ্গে যেটুকু মিথ্যে না মেশালে সত্য দাঁড়ায় না, এখন সেটুকু বলি। সেটা সত্যের অংশ, মিথ্যে নয়।

যেমন?

জয়া প্রশ্ন করতে সুপার্থ বলেছিল, রোজ সকালে চাকরির খোঁজ করতে যাওয়ার নাম করে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে, তারপর কোথায় কোথায় যাই, যেতে হয়, তুমি নিশ্চয় আন্দাজ করতে পার।

আজও কি একই কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছ?

হ্যাঁ। ব্যান্ডেলে ড্রাইভারি খুঁজতে যাব শুনে ফতুয়ার পকেট ঝেড়েটেড়ে বাবা চার আনা পয়সা দিল আমাকে। প্রায় রোজই, মানে সকালে নরহরির কাছে পাওনা তিন টাকা আদায় হলে, দেয়। কুড়ি পয়সা থেকে এক টাকা, যখন যেমন সম্ভব!

সাতসকালে বাড়ি ছেড়ে বেরনোর পর থেকে সুপার্থ যে দাঁতে কুটোটা কাটেনি, টের পেয়েও তা নিয়ে জয়া প্রশ্ন করতে সাহস পেল না। সত্যকে খাড়া করতে তার সঙ্গে কতটা মিথ্যে সুপার্থ মেশাবে, আঁচ করতে না পেরে, একটুক্ষণ চুপ

করে থেকে জয়া জিজ্ঞেস করল, মেয়েদের জন্যে তোমার ঝুলিতে কি আলাদা সত্য আছে? সেটা বানাতে কি আলাদারকম মিথ্যে লাগে?

প্রশ্নটা নিয়ে আগে কখনও ভাবিনি। মাথায় আসেনি। ভাবার মত প্রশ্ন, ভাবা দরকার। আমি ভাবব।

সামান্য একটু বিরতির পরে জয়া জিজ্ঞেস করল, তোমার ছেলে বন্ধুদের, ব্যক্তিগত যত কথা তুমি বলতে পার, সেগুলো হুবহু কি আমাকে বলতে পার?

তুমি শুনতে চাইলে, পারি।

মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাসের খবরটা কি তুমিই রটিয়েছিলে?

হ্যাঁ।

কেন রটালে?

শুধু ডলির জন্য। আমার যত মিথ্যে, সত্যি, বিষ, ভালবাসা, ডলির মুখে হাসি ফোটাতে সব উগরে দিতাম। সত্যের সঙ্গে মিথ্যে মেশানোর বদলে মিথ্যের সঙ্গে সত্য মিলিয়ে টের পেতাম সবটা মিথ্যে হয়ে গেছে। সেই সর্বনাশী মিথ্যুক, প্রবঞ্চক বানিয়েছে আমাকে। আমাকে ভিখিরি করে দিয়ে চলে গেছে।

আমবাগানের আবছা আলোছায়ায় সমে পৌছোনো সেতারের সুরের মতো সুতীক্ষ্ম খাদে রিনরিন করে বেজে উঠেছিল সুপার্থর গলার আওয়াজ, তার কথাগুলো। তাকে জয়া আর ঘাঁটাতে না চাইলেও সে বলতে থাকল, কোনও মেয়েকে একজন পুরুষ সচরাচর নিজের ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী শোনায় না। পরীক্ষায় গাড্ডু মারার মত চেপে যেতে চায় ল্যাং-খাওয়া প্রেমের ঘটনা। আমিও তাই করতাম, একাধিকবার করেছি। অনেক ঘা খেয়ে জেনেছি, সামনে বসে থাকা যে মেয়েকে ভজাতে এত গুলতাপ্পি ঝাড়ছি, সে মেয়েটা প্রথমে মানুষ, তারপর মেয়ে, কখনই মেয়েমানুষ নয়। তুমিও তাই, আগে একজন মানুষ, তারপর জয়া নামে একটা মেয়ে। তুমি কী শুনতে চাও, বল। রাখঢাক না করে সব বলব। কবিতা আর বিপ্লবকে আঁকড়ে ধরে সত্যের কাছাকাছি আমি পৌছে গেছি। মৃত্যুকে মুঠোয় পুরে ফেলার জন্যে সত্যে, তা যত নিষ্ঠুর, বুকভাঙা হোক, আমার ভয় নেই। যে কোনও সত্যের এখন মুখোমুখি হতে পারি।

জয়া টের পাচ্ছিল, সে চুপ করে থাকলেও মুখের আগল খুলে, আত্মকথনে সুপার্থ ডুবে যাবে। মাধ্যমিকে দু-বার ফেল করা ছেলেটা নানা মিথ্যের বেড়া টপকে সময়ের বহ্নিতে অন্য মানুষ হয়ে গেছে, মৃত্যুকে তালুবন্দি করে, নিজের জীবন আহুতি দিতে পা বাড়িয়ে রয়েছে। সুপার্থর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে, তাকে না ছুঁয়ে, তার গা ঘেঁষে জয়া বসে থাকল। সুপার্থর ছায়ায় থাকতে, তার গা ঘেঁষে নবীনা প্রেমিকার মত সে বসে থাকল, ভাবলে ভুল হবে। পল্লবিনী লতার মত প্রেমিককে জড়িয়ে বেড়ে ওঠার ঘোর বিরোধী সে। মেয়েদের পরগাছাবৃত্তিকে সে ঘৃণা করে। পায়ে পড়া মেয়ে নয় সে। ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে যে কোনও বন্ধুর

গা ঘেঁষে, সে অনায়াসে বসতে পারে। গঙ্গার ধারে স্ট্র্যান্ডের বেঞ্চে, চেনাজানা কারও চোখে পড়ে যাওয়ার তোয়াক্কা না করে এখনও কলেজ ছুটির পরে মাঝে মাঝে বসে। দুপাশে দুজন ছেলে বন্ধু থাকলেও অপ্রতিভ হয় না। সুপার্থর কথাতে, তার কবিতা শুনে বুকের রক্ত হরবকত ছলাৎ করে উঠলেও তার বিপ্লবীয়ানা সে ভাল করে যাচাই করে নিতে চায়। পিসির প্রবাদপ্রবচন থেকে আরম্ভ করে সমাজ রূপান্তরের তত্ত্ব, পক্ষ, প্রতিপক্ষ সব কিছু যাচাই করে নিতে হয়, জয়া জেনে গিয়েছিল। সুপার্থকে বলেছিল, আজ রাতে মগরা স্টেশন উড়িয়ে দেওয়ার 'অ্যাকশনে' আমি থাকতে চাই।

কথাটা শুনে কয়েক সেকেন্ড গুম হয়ে থেকে সুপার্থ বলেছিল, থাকতে পার। তবে পার্টির অনুমতি নিতে হবে।

কেন?

'অ্যাকশন স্কোয়াড' আগেই তৈরি হয়ে গেছে। নতুন কাউকে 'স্কোয়াডে' নিতে হলে দলের বৈঠক করে তা করতে হবে।

তুমি তো দলের নেতাদের একজন, তুমিই ডেকে নিতে পার আমাকে।

পারি না, তেমন দরের নেতা আমি নই। একটা চাকরি জুটে গেলে রাজনীতি ছেড়ে দিতে পারি।

সেকি?

হ্যাঁ। আজ রাতে বিপ্লবের জন্যে জীবন দিতে পারি, কাল সকালে পেটের দায়ে চাকরি নিয়ে দেশের যে কোনও জায়গায় চলে যেতে পারি। হয়, আমার দারিদ্র্য থেকে বিপ্লব জন্ম নেবে, না হয়, বিপ্লব এসে আমাকে দারিদ্র্যমুক্ত করবে। আমি চাই দ্বিতীয়টা ঘটুক। রাইফেল আর কলম, দুটো নিয়েই আমি তৈরি।

সুপার্থর কথায় অবাক হলেও জয়া কিছু বলেনি। সুপার্থ বলল, যাই করি, কবিতা লেখা আমার ভবিতব্য। এত ঝামেলার মধ্যেও গেল-মাসের শুরুতে শুধু কবিতা লেখার জন্যে কলকাতায় গিয়েছিলাম।

কলকাতায় কেন?

কলকাতাতেই তো কবিতা পয়দা হয়। কবি আর কবিতা দুটোই কলকাতার বাপের সম্পত্তি। কলকাতায় কল্কে না পেলে সবচেয়ে প্রতিভাবান কবিকেও শূকরশাবক সেজে থাকতে হয়। কবি হতে যা যা করতে হয়, কলকাতায় গিয়ে করেছিলাম।

জয়া লক্ষ্য করছিল, সুপার্থর মেজাজ, সেই সঙ্গে তার মুখের ভাষা বদলে যাচ্ছে। তাকে মেয়ে ভেবে জিভ সংযত করার কোনও চেষ্টা সুপার্থর নেই। তাকে আরও একটু ঘাঁটিয়ে দিতে জয়া বলল, কবি হওয়ার কল্কে মিলল কলকাতাতে?

জয়ার ইয়ার্কি গায়ে না মেখে স্বগতোক্তির মত সুপার্থ বলতে থাকল, শুধু কি কবিতা, মাথা খারাপ করে দেওয়ার মতো কত যে মাজা দোলানো, হাসিখুশি,

চাঁচাছোলা আর বর্তুলাকার সুন্দরী কলকাতায় ছড়িয়ে রয়েছে, হিসেব নেই। কবিতা আর কবিতা লেখার প্রেরণা, দুটোই কলকাতার রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। প্রথমে গেলাম বিবেকানন্দ রোডে প্রবীরদের বাড়ি। কলকাতার উঠতি কবিদের একজন সে। তার বাড়িতে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল একটাই, তার বোন পাপিয়াকে দেখব। ভেবেছিলাম, অনেক চেষ্টাতে বোধহয় ওকে ভুলতে পেরেছি, কিন্তু দোতলার বারান্দার রেলিংয়ে বুক চেপে ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে টের পেলাম, না, ভুলিনি। সেরে আসা ঘা খুঁচিয়ে রক্ত বার করার মত ওকে দেখামাত্র বুকের মধ্যে যন্ত্রণা অনুভব করলাম। হায়, আমি যদি বারান্দার রেলিং হতাম। পাপিয়ার বুকের চাপে পেশাই হওয়ার সৌভাগ্য ঘটত! বুঝতে পারলাম, চেষ্টা করে সবকিছু ভুলতে পারা যায় না। 'ভুলে গেছি' ভেবে মনকে চোখ ঠারলে, মন তা মেনে নেয় না।

পাপিয়া নামটা সুপার্থর মুখে প্রথমবার শুনে জয়ার মনে প্রশ্ন জাগল, আরও কত মেয়ের নাম আর দংশন সুপার্থর ভাঁড়ারে রয়েছে? প্রশ্নটা সে করল না। তাকে আলাদা করে স্ত্রী পুরুষ না ভেবে আস্ত মানুষ ধরে নিয়ে সুপার্থ বলে চলেছে, তার কলকাতায় যাওয়ার বিবরণ। সুপার্থ বলল, পাপিয়াতে আমার নজর লটকেছে, অনুমান করে, প্রবীর আগে থেকেই এড়িয়ে চলছিল আমাকে। শুক্রবার দুপুরে আমাকে দেখে, শুকনো, নিস্পৃহ গলাতে প্রবীর দু-একটা কথা বলতেই টের পেলাম, আমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিদায় করতে চাইছে সে। প্রবীরের সঙ্গে বাড়ির সামনে ফুটপাথে দাঁড়িয়েছিলাম। উল্টো ফুটপাথে ঠা-ঠা রোদ, এই ফুটপাথে ছায়া। ছায়ার মধ্যে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম। দোতলার বারান্দায় দাঁড়ানো পাপিয়াকে দেখতে ইচ্ছে করলেও চোখ তুলে তাকানোর সুযোগ ছিল না। ভাবছিলাম, পাপিয়া কি দেখছে আমাকে?

আমার মনে হচ্ছিল, সরাসরি না হলেও, পাপিয়া থেকে থেকে, আড়চোখে তাকাচ্ছে আমার দিকে। কী দেখছে, আমার ভেতর পর্যন্ত কি দেখতে পাচ্ছে? আমার কবিতা, আমার বিপ্লব, আমার বুকের ভেতরে তার দংশনের দাগ সে কি দেখতে পাচ্ছে? মনের মধ্যে হরেক প্রশ্ন নিয়ে আমি যখন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, সিমলা স্ট্রিট থেকে জগন্নাথ এসে হাজির হল। তার সঙ্গে চাপা গলায় প্রবীরের কথা শুনে, আগে থেকে তাদের যে মাল টানার 'প্ল্যান' করা রয়েছে, বুঝতে অসুবিধে হল না। খবর না দিয়ে আমি এসে পড়ায় তারা বিরক্ত হলেও, আমাকে মুখের ওপর চলে যেতে বলতে পারছে না। আমার সম্পর্কে দুজনেই কমবেশি সমান নির্লিপ্ত! অপমানিত বোধ করলেও তাদের সঙ্গ আমি ছাড়লাম না। তাদের লেখা নতুন কবিতা শুনতে যেমন সতৃষ্ণ ছিলাম, তেমনি তাদের শোনাতে চাইছিলাম আমার সদ্য লেখা কয়েকটা কবিতা। কবিতার নাম মুখে না এনে, আমাকে নিয়ে ওরা গেল রামকৃষ্ণ দাশ লেনে দেবপ্রিয়র বাড়ি। বাড়ি ছিল না দেবপ্রিয়। তার ভাই বলল, দেবপ্রিয় গেছে কলেজ স্ট্রিট কফিহাউসে। প্রবীর,

জগন্নাথ মুখ চাওয়াচাওয়ি করে ইশারায় কিছু বার্তা পাঠিয়ে কফিহাউসের দিকে চলল। ছিনে জোঁকের মত তাদের পেছনে আমি লেগে থাকলাম। আমার পকেটে রাখা কবিতার গোছা, নিঃশব্দে শ্রোতা খোঁজার প্ররোচনা দিচ্ছিল আমাকে। বলছিল, তোমার একটা 'চেয়ার' দরকার, শুধু তোমার 'চেয়ার', সেখানে বসে তুমি কবিতা লিখবে। তুমি ছাড়া সেই চেয়ারে আর কারও বসার অধিকার নেই, সে 'চেয়ার' শুধু তোমার। থলিতে রাখা পেটো যেমন ফেটে পড়ার জন্যে উসখুস করে, পকেটে রাখা কবিতার গোছা সেভাবে উন্মুখ হয়েছিল শ্রোতা পেতে, যে কোনও মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারত আমাকে। তার মধ্যেই উত্তর কলকাতার অলিগলি দিয়ে দুই বন্ধুর সঙ্গে (বন্ধু হয়তো নয়, শুধু চেনাশোনা) কলেজ স্ট্রিট কফিহাউসের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলাম, পাপিয়ার কথা, সর্বনাশী ডলির মুখ, চুল এলিয়ে গোধূলির আলোতে বসে আছে নমিতা, আমার দেওয়া বই পড়ে, সেই বইয়ের ভেতরে ভালবাসার চিঠি খামে ভরে, যে ইন্দ্রাণী আজও ফেরত পাঠায় তার দু'চোখের নরম চাউনি, আর দুপুরের নির্জন গলিতে তিনজোড়া পায়ের শব্দে শুনতে পাচ্ছিলাম, মহান ভারতীয় বিপ্লবের আগমনবার্তা। প্রবীর আর জগন্নাথ নিজেদের মধ্যে এমনভাবে কথা বলে যাচ্ছিল, যেন তাদের সঙ্গে আমি নেই। আমি হাঁটছিলাম একপাশে বিপ্লব, একপাশে কবিতা নিয়ে, মাথার ওপর চাঁদোয়ার মত ঝুলছিল এক সহস্র একটা মেয়ের মুখ আঁকা নীল আকাশ। বুকের মধ্যে এত সব পুরে নিয়ে দুই বন্ধুর উদাসীন ছায়া মাড়িয়ে আমি হেঁটে যাচ্ছিলাম। কফি-হাউসের দোতলায় উঠে দেখলাম, দেবপ্রিয়, অশোক বসে রয়েছে। আমাদের দেখে আনন্দে তারা হইহই করে ডেকে নিল। আমার মত তারাও লিটল ম্যাগাজিনে কবিতা লেখে। কফিহাউসে কয়েক মিনিট বসে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে খালাসিটোলায় দিশি মদের ঠেকের দিকে রওনা হওয়ার সময়ে টের পেলাম, প্রবীর জগন্নাথকে দেখে দেবপ্রিয় আর অশোক আনন্দে হইহই করে উঠেছিল। আমার উপস্থিতিতে আনন্দিত না হলেও আমাকে অবশ্য তারা দূরে সরিয়ে দিতে চাইছিল না। অশোকের আচরণে কিছুটা উপেক্ষা মিশে থাকলেও দেবপ্রিয়কে কাছের মানুষ মনে হচ্ছিল। মিনিট পনেরো হেঁটে বউবাজার পেরিয়ে খালাসিটোলায় দিশি মদের আড্ডায়, শেষ দুপুরে ঢুকে পড়লাম।

প্রথমে এল দু'বোতল, তারপর চার বোতল, তারপর আরও, আরও বোতল। যাদের সঙ্গে বসে মদ খাচ্ছিলাম, দেবপ্রিয় বাদে বাকিরা আমাকে এত অবজ্ঞা করছিল, যা ঘৃণার চেয়ে কম নয়। আমার খুব খারাপ লাগছিল, নিজের কাছে নিজে ছোট হয়ে যাচ্ছিলাম। আমাকে তাদের অবহেলা করার এক নম্বর কারণ, যে আমার দারিদ্র্য, বুঝতে পারতাম। দ্বিতীয় কারণ, আমাকে তারা কবি মনে করত না। তাদের ধারণা, আমার লেখা, একটা লাইনও কবিতা হয় না। রাজনীতি নিয়ে তারা মাথা ঘামাত না। রাজনীতি প্রসঙ্গে আমিও কোনওদিন তাদের কাছে মুখ

খুলিনি। ঠিক ক'বোতল খাওয়ার পরে, নেশার ঝোঁকে আমার দিকে আঙুল তুলে প্রবীর আমাকে 'নিচু মনের জীব' বলল, খেয়াল নেই। খেয়াল করার মতো অবস্থা আমার ছিল না। নিজেকে 'নিচু মনের জীব' হিসেবে মেনে নিতে আমি আপত্তি করলাম না। সত্যিই আমি নিচু মনের জীব। মালের আসরে বসে আকণ্ঠ পান করে দু-চার টাকার বেশি কখনও ঠেকাইনি। বলা যায়. বন্ধুদের পয়সায় নেশা করেছি। তাদের কখনও খাওয়াইনি। সামর্থ্য ছিল না। আজও নেই। নেশায় চুর হয়ে বিনা টিকিটে ট্রেনে চেপে বাড়ি পৌঁছেছি। পকেটে পয়সা না থাকলে ট্রেনের টিকিট কিনব কোথা থেকে? বাস ভাড়ার অভাবে খালাসিটোলা থেকে হেঁটে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত কতবার যেতে হয়েছে, এ কথাই বা বলব কাকে? ন'বোতল মাল, সবাই মিলে ফুঁকে দেওয়ার পরে সেই সন্ধেতে বাহাদুরি দেখাতে দশ নম্বর বোতলটা কাউন্টার থেকে জগন্নাথ নিয়ে এল। হাঁটতে পারছিল না সে। টলমল করছিল শরীর। মুখ থুবড়ে যে কোনও মুহূর্তে পড়ে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। কিন্তু পড়ল না। বোতল হাতে টেবিলে ফিরে এল। সবচেয়ে বেশি খেয়েছিল জগন্নাথ, তারপর আমি। শেষ বোতলটা অর্ধেকের বেশি খেল জগন্নাথ, বাকিটা আমি। জগন্নাথের খাওয়া দেখে তার দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রবীর আর অশোক কেটে পড়লেও, তাকে একা ফেলে আমি পালাতে পারলাম না। তখনও আমার নেশা হয়নি। মাতাল বলতে যা বোঝায়, টলটলায়মান শরীর, হাত-পায়ের গ্রন্থি আলগা হয়ে যাওয়া, চোখের সামনে কুয়াশার আস্তর, সে সব কিছুই আমার ঘটেনি। মাথার ভেতরটাও পরিষ্কার। ন'টা পঁচিশের ট্রেন ধরে বাড়ি ফিরতে হবে, সে চিন্তাও মাথায় ছিল। দুশ্চিন্তাও ছিল, চেনাজানা কারও সঙ্গে চলন্ত ট্রেনের কামরায় দেখা হয়ে গেলে বাংলা মদের গন্ধ লুকোব কীভাবে? তখনই শুরু হল জগন্নাথের বমি। হড়হড় করে খুব খানিকটা বমি করে নির্জীবের মত সে পড়ে রইল টেবিলে মাথা রেখে। পাশের যে টেবিল গিয়ে, আমি আর দেবপ্রিয় বসলাম, সেখানে দুজন বুড়ো, একজন ত্রিশ-বত্রিশের লোক, যথেষ্ট মালটানার পরেও টেনে যাচ্ছিল। আমাদের দুজনকে তারা, নিজেদ্রের টেবিলে লাগানো দুটো বেঞ্চের দু'ধারে বসতে জায়গা করে দিল। জগন্নাথকে বমি করতে দেখেছিল তারা। আমাদের পেয়ে তারা খুবই আহ্লাদ করে শোনাতে শুরু করল তাদের মদ্যপ হওয়ার বৃত্তান্ত। মাল টেনে গভীর রাতে ঘরে ফেরার পথে ঢাকাখোলা ম্যানহোলে পড়ে গিয়ে হাড্ডিসার বুড়ো সারারাত কীভাবে আটকে ছিল, কীভাবে ম্যানহোল থেকে মুক্তি পেল, সেই কাহিনী, সে শেষ করার আগে, ময়লা লুঙি পরা, অন্য বুড়ো শুরু করল তার বিবরণ। তাকে প্রায় ধমক দিয়ে থামিয়ে বছর ত্রিশের লোকটা যখন তার মাতাল হওয়ার ঘটনা বলতে শুরু করেছে, প্রথম বুড়োটা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, তুই ঘরে যা। ভাত নিয়ে কুসুম বসে আছে।

বুড়োকে একটা কাঁচা খিস্তি দিয়ে জোয়ান লোকটা বলল, মেয়ের জন্যে বুড়োর দরদ উথলে উঠছে। তাদের কথা থেকে জানলাম তারা শ্বশুর-জামাই, তালতলাতে লেদ মেশিনের কারখানায় দুজনেই চাকরি করে। হপ্তায় একদিন, মজুরি পেয়ে শ্বশুর-জামাই একসঙ্গে খালাসিটোলাতে আসে, নেশা করতে। হরদম খায়। কোনওদিন জামাইকে শ্বশুর, কোনওদিনও শ্বশুরকে জামাই, বেতাল পায়ে ঘরে পৌঁছে দেয়। তাদের মুখ থেকে ক্রমাগত নেশার ঘোরে নানা কেলেঙ্কারির ঘটনা শুনে আমার গা গুলোতে শুরু করল। তলপেটে প্রবল চাপ অনুভব করে ল্যাট্রিনে গিয়ে ঢুকে মনে হল, চারপাশ বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে, নাগরদোলায় যেন পাক খাচ্ছি, পা দুটো কাদায় তৈরি, এখনই লুটিয়ে পড়ব। মুখে-চোখে জল দিয়ে পায়খানা করলাম এবং ফিরে এসে আবার বসলাম জগন্নাথের পাশে। দেবপ্রিয় নিজের জায়গায় বসেছিল। ঘুমিয়ে পড়েছিল জগন্নাথ। আধঘণ্টা পরে, সন্ধে তখন সাতটা, জগন্নাথ একটু সুস্থ বোধ করতে তাকে নিয়ে দেবপ্রিয়, আমি এসে বসলাম ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। প্রায় ঘণ্টাখানেক সেখানে কাটিয়ে কালীপ্রতিমা দর্শনের নাম করে হাড়কাটা লেনের মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। কালীপ্রতিমা দেখে পাশেই নিষিদ্ধপাড়াতে ঢুকে, সেখানে খদ্দের ধরতে রঙচঙ মেখে দাঁড়ানো মেয়েদের সর্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলোতে বুলোতে আমহার্স্ট স্ট্রিটে পৌঁছে গেলাম। হ্যারিসন রোড থেকে জগন্নাথ, দেবপ্রিয় যে যার বাড়ির দিকে চলে যেতে আমি পায়ে হেঁটে হাওড়া স্টেশনে এসে ট্রেন ধরলাম। আমার মাথাতে তখন অনেকগুলো কবিতার সঙ্গে এসে গিয়েছিল শরীরের খিদে। স্টেশনে পৌঁছে, বাড়ির রাস্তায়, পদ্মপুকুরেব জনমানুষহীন, অন্ধকার উত্তর-পশ্চিম কোণে দাঁড়িয়ে, ইন্দ্রাণীর উলঙ্গ শরীরের কথা ভেবে হস্তমৈথুন করে শরীরের তাপ জুড়িয়েছিলাম। পকেট থেকে কবিতার গোছা বার করে, কুটি কুটি করে ছিঁড়ে, অন্ধকার ঝোপের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলাম। তাছাড়া আর কিই-বা করার সুযোগ ছিল আমার?

যে সুপার্থ এখনও ইন্দ্রাণীর প্রেমিক, তার জবানবন্দি শুনতে জয়ার গা ঘিনঘিন করলেও তাকে ঘৃণা করতে পারছিল না সে। আর যাই হোক, সুপার্থ কপট নয়। জীবনের কোনও কিছু সে লুকোয়নি। নিজেকে ধোয়া তুলসীপাতা প্রমাণের সামান্য চেষ্টা করেনি। কবিতা, যৌনতা, বিপ্লব আর বন্ধুদের সঙ্গে বসে নেশা করা, সব মিলে রক্তমাংসের সম্পূর্ণ মানুষের মত দেখাচ্ছে তাকে। তার সঙ্গে প্রেম করা না গেলেও তাকে অপছন্দ করে দূরে ঠেলে দেওয়া সম্ভব নয়। মুচকি হেসে সুপার্থ বলল, আমাকে যতই লুচ্চা ভাব, মেয়েদের জন্যে আলাদারকম সত্য যে বলি না, এটা নিশ্চয়ই বোঝাতে পেরেছি? সুপার্থর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জয়া জিজ্ঞেস করল, এত সব কথা মিতুনকে বলেছ?

সবটা তাকে বলতে পারিনি। কঠিন সত্যকে সহ্য করার শক্তি তার নেই। তার পছন্দের সত্য, সে শুনতে চায়।

কঠিন সত্য শোনার মত সাহস, আমার যে আছে, কী করে জানলে?

আমরা যে একই পথের পথিক, দুজনেই পৃথিবীটা বদলাতে চাই। মিতুন কবিতায় আছে, বিপ্লবে নেই।

মদ ছাড়া আর কি নেশা আছে তোমার?

সব একদিনে শুনে নেবে?

ইচ্ছে না থাকলে বোলো না।

বলব, সবটাই বলব। এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় নেশা বিপ্লব, তারপর কবিতা। বিপ্লব আমাকে ছেড়ে গেলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব। কবিতা ছেড়ে গেলে আত্মহত্যা করব।

সুপার্থর কথা শেষ হওয়ার আগে আমবাগানের দক্ষিণ দিক থেকে কয়েক জোড়া পায়ের আওয়াজ ভেসে এল। ভারি বুটের হুড়ুমদুড়ুম কুচকাওয়াজ নয়, হালকা জুতোর সন্তর্পণ হেঁটে আসার শব্দ, কয়েক সেকেন্ড কান পেতে শুনে সুপার্থ বলল, বোধহয় সমীরদা, সঙ্গে আরও দুজন কমরেড আসছে। বাগানের আরও ভেতরে তুমি চলে যাও। নজর রাখো আমার ওপর। আমি এখানে থাকছি।

দু-তিন জোড়া পায়ের আওয়াজ যত স্পষ্ট হচ্ছিল, প্রাগৈতিহাসিক থামের মত আমগাছের গুঁড়ির আড়ালে নিজেকে রেখে, বাগানের গভীর অভ্যন্তরে জয়া সরে যাচ্ছিল। এমনভাবে সে এগোচ্ছিল, যাতে সুপার্থ নজরের বাইরে না যায়! তখনই সে দেখল অচেনা একজন মানুষকে নিয়ে সমীরকাকু এসে দাঁড়াল সুপার্থর সামনে। সুপার্থ আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। এগিয়ে গিয়েছিল কয়েক পা। অচেনা মানুষটার সঙ্গে সুপার্থকে হাত মেলাতে দেখে সে-ও একজন 'কমরেড' জয়ার বুঝতে অসুবিধে হল না। আমগাছের আড়াল ধরে এখন সে সামনে এগোতে থাকল। মিনিটখানেক দুজনের সঙ্গে কথা বলে সুপার্থ পেছনে তাকাতে গুঁড়ির আড়াল থেকে জয়া বাইরে এসে দাঁড়াল। হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকল সুপার্থ। জয়াকে দেখে সমীর অবাক হলেও, মুখে কিছু বলল না। পাশে দাঁড়ানো সঙ্গীকে দেখিয়ে জয়াকে বলল, এ হল, গণেশ বাউড়ি, গাংনেগড় এলাকার কৃষক কমরেড, লড়াকু সংগঠক।

গণেশ বাউড়ির নাম আগে শুনলেও সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজপুত্রের মত চেহারা, এমন একজন মানুষ থাকতে পারে, জয়ার ধারণা ছিল না। ব্রাহ্মণ্যবাদী জাতপাতের বিচারে, গ্রামের সবচেয়ে নিচু বর্ণের মধ্যে যাদের ধরা হয়, ডোম, বাগদি, বাউড়ি সম্প্রদায় তাদের মধ্যে পড়ে। নৃতত্ত্ববিদদের মতে, 'নেগ্রিটো' আর 'অস্ট্রিক' নরগোষ্ঠীর মিলনে তৈরি হয়েছে এই সব জনজাতি, উপজাতি সম্প্রদায়। গণেশ বাউড়ির শরীরে কোথাও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের ছাপ নেই। বরং উল্টোটা রয়েছে। তার নাক-মুখ, চোখের আদল, টকটকে ফরসা গায়ের রঙ দেখে মনে হতে পারে, সে উঁচু গোত্রের ব্রাহ্মণ, তার শরীরে বইছে বিশুদ্ধ আর্য রক্তস্রোত।

গণেশও সম্ভবত তা জানে এবং প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তে কুণ্ঠিত হয়। কয়েক সেকেন্ডে সে কুণ্ঠা কেটে যায়। অচেনা এক মেয়ের সঙ্গে পরিচয়ের মুহূর্তে লড়াকু মানুষটার সেই সকুণ্ঠ ভাব এবং নিমেষে চাঙ্গা হয়ে ওঠা, জয়ার নজর এড়াল না। সমীর তখন সুপার্থকে বলছিল, সন্ধের পরে মগরা স্টেশন 'অ্যাটাক' হতে পারে, এ খবর, কীভাবে যেন পুলিসের কাছে পৌঁছে যাওয়ায় সকাল থেকে সি আর পি রেল স্টেশন ঘিরে রেখেছে। আমাদের গোপন ডেরাগুলোতে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিস। এখানেও আসতে পারে। তোমাকে সাবধান করতে তাই চলে এলাম।

সুপার্থ জিজ্ঞেস করল, পাঁচটা পেটো যে বানিয়ে রাখলাম, সেগুলোর কী হবে?

থলিতে ভরে নিয়ে পদ্মপুকুরের জলে ফেলে দাও।

সুপার্থর নির্বিকার মুখে আমডালের কম্পিত ছায়া পড়ে চুরচুর করে ভেঙে যেতে থাকল। সাতসকালে, ব্যান্ডেলে ড্রাইভারের চাকরি খুঁজতে যাওয়ার নাম করে, বাবার কাছ থেকে চার আনা পয়সা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে, প্রায় দুপুর পর্যন্ত আমবাগানের ডেরায় বসে বেঁধে ফেলা পাঁচটা বোমা, পদ্মপুকুরের জলে ফেলে দিতে কাপড়ের ঝোলায় সে ভরে নিল। নির্বিকার, শান্ত মুখ। সারা রাতের খিদে পেটে নিয়ে, গোটা সকাল বেগার খাটার জন্যে একটা আক্ষেপের কথা সে উচ্চারণ করল না। বোমা পাঁচটা ঝোলায় ভরে বলল, ঝোলাসুদ্ধু এগুলো পুকুরে ফেলার আগে, রাস্তা থেকে কয়েকটা আধলা ইট তুলে ভেতরে রেখে ঝোলার মুখটা বেঁধে নিতে হবে। পুকুরে ফেললে, ঝোলাটা তাহলে টুপ করে জলে ডুবে যাবে।

তার কথাতে সায় দিল সমীর। সুপার্থকে গণেশ জিজ্ঞেস করল, গাংনেগড় যাচ্ছ কবে?

দলের হুকুম পেলেই চলে যাব।

গণেশ বলল, তোমাকে পাশে পেলে লালে লাল করে দেব গাংনেগড়, হুগলির প্রথম মুক্ত অঞ্চল হবে সেখানে।

গণেশের কথার পিঠে কথা না বলে জয়ার দিকে তাকিয়ে সুপার্থ হাসল। গাংনেগড়ের মাটি, খালবিল, ঝাঁক ঝাঁক অনশনক্লিষ্ট, অর্ধনগ্ন মানুষের নিশ্বাসের ভাপ থেকে বেরিয়ে আসা কবিতার বীজ তার মগজের মধ্যে ওড়াউড়ি করতে শুরু করে দিয়েছে জয়া তখনই টের পেয়ে গেল। জয়াকে সুপার্থ বলল, সম্ভবত গাংনেগড় হতে চলেছে, আমার জীবন আর জন্মের ঠিকানা। কথাটার ভেতরে আরও কিছু অর্থ আছে, সঙ্কেত পেয়েও জয়া প্রশ্ন করল না। চটের থলিতে পাঁচটা বোমা পুরে বাজার থেকে ফেরার মত অলস পায়ে পদ্মপুকুরের নির্জন কোণের দিকে সে এগিয়ে চলল। পুকুরে যে এত পদ্ম ফুটেছে, আগে সে খেয়াল করেনি। ভাসন্ত কয়েকশো পদ্মের মধ্যে পাঁচটা বোমার জায়গা করে দিতে কৌতুকের সঙ্গে

বিপদ জাগল তার মনে। পদ্মের নিচে জলের তলায় পাঁকের ওপরে বোমা বোঝাই থলিটা মৃতের মত আদিগন্ত সময়ের জন্যে পড়ে থাকল।

পাঁচ

ফেলে আসা জীবনকে পঁয়ত্রিশ বছর পরে যে গল্পের মত লাগে, জয়া জানে, আগেও টের পেয়েছে নানা সময়ে। না-ঘুমনো মাঝরাতে তা যে রূপকথা হয়ে ওঠে, নতুন করে অনুভব করছে। আবেগ, উত্তেজনা, ক্রোধে যে সময় একদা উন্মত্ত করে তুলেছিল, হাড়ে কাঁপন ধরানোর সঙ্গে স্বপ্ন আর সঙ্কল্পে, দু'চোখ, বুকের খাঁচা ভাসিয়ে দিয়েছিল, সেই সময়ের গা থেকে, এখন মাঝরাতে এত রঙ, এত আলো ছড়িয়ে পড়তে থাকল, যা বিমোহিত করার মত। সে বিমোহিত হল। সময়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সে খুঁজে পেতে থাকল জীবনের মধু। তার ঘুম আগেই ছুটে গিয়েছিল। ঘুমের আকাঙ্ক্ষা পর্যন্ত এখন মিটে গেল। পঁয়ত্রিশ বছর আগে এমন একটা জীবন কাটিয়ে এসেছে, সত্যি সে জীবনটা তার ছিল, না অন্য কারও, ভাবতে গিয়ে তার বিভ্রম জাগল, প্রায়ই জাগে। সুপার্থর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা যত বাড়ছিল, তত বেশি করে তার কানে আসছিল সুপার্থর জীবনের নানা ঘটনা, তার পারিবারিক জীবনের খবর, বেশিরভাগ ব্যক্তিগত জীবনের কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির বৃত্তান্ত হলেও তাদের সংসারের চরম দারিদ্র্য, অভাব-অনটনের কাহিনীও কম ছিল না। সুপার্থ সম্পর্কে মনের মধ্যে ক্ষোভ, ঘৃণা, প্রতিশোধস্পৃহা জেগে ওঠার সঙ্গে মনের আরও গভীরে, কোথাও একটু ব্যথিত ভালবাসা তৈরি হচ্ছিল। পরিবারের সঙ্গে তার দূরত্ব বাড়ছিল। যৌথ সংসারে মা আর কয়েকজন ছোট ভাইবোন ছাড়া তার পাশে দাঁড়ানোর কেউ থাকল না। মেয়ে হওয়ার জন্যে ঘরে-বাইরে যে তাকে বেশি করে কোণঠাসা হতে হচ্ছে, প্রতি পদক্ষেপে সে টের পাচ্ছিল। বয়সে ছোট ভাইরা যখন বুক ফুলিয়ে রাত দশটায় বাড়ি ফিরত, তখন রাত ন'টায় বাড়িতে ঢুকে হাজার কৈফিয়ত দিতে হত তাকে। মা না চাইলেও কৈফিয়ত চাওয়ার লোক কম ছিল না। কেউ সরাসরি, কেউ ঘুরিয়ে জানতে চাইত দেরির কারণ। শুধু ঘরে কেন, মহল্লার বাইরে কোথাও, বিকেলে জরুরি বৈঠক বসলে, রাত ন'টার মধ্যে তাকে বাড়ি পাঠানোর কথা ভেবে বৈঠকে অংশগ্রহণকারী প্রায় সকলে, উশখুশ করত। বৈঠকে আলোচ্য কর্মসূচির অর্ধেক আলোচনা বাকি থাকতেই পুরুষ সহকর্মীরা সত্বর সভা শেষ করার তাগাদা দিত। তাদের তাড়া লাগানোর কারণ

যে, জয়া নামে একটা মেয়েকে যথাসময়ে বাড়ি পাঠানো, তা টের পেয়ে, মেয়ে হওয়ার জন্যে সে গ্লানি অনুভব করত। চোয়াল শক্ত হত তার। স্বাভাবিক নিয়মে মিটিং চালাতে সে চাপ দিত। কদাচিৎ কার্যকর হত তার চাপ। অধিকাংশ সময়ে তা খারিজ হত। সুপার্থ বৈঠকে থাকলে তা ঘটত না, দরকারে, তা গড়াত মাঝরাত পর্যন্ত। উত্তাল দশক তখন শুরু হয়ে গেছে। সুপার্থকে নিয়ে দলের মধ্যে নানা বিতর্ক থাকলেও সে যে দ্রুত জেলা কমিটির নেতৃত্বে আসছে, জয়া টের পাচ্ছিল। ভিয়েতনামে আমেরিকান দখলদারি বজায় রাখার নৃশংস যুদ্ধের সেনাপতি রবার্ট ম্যাকনামারা, তখন যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে আই এম এফ (ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড)-এর ডিরেক্টর। আমেরিকার নিয়ন্ত্রণকারী আর্থিক সংস্থা, রাজ্যের উন্নতিতে আর্থিক বিনিয়োগের যে খসড়া পরিকল্পনা করেছিল, তা নিয়ে কলকাতায় ম্যাকনামারার আসার দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গিয়েছিল। মার্কিন জহ্লাদের কলকাতা দর্শনের খবরে রাজ্যের ছাত্ররা ক্রোধে ফেটে পড়ছিল। বিমানবন্দর ঘেরাওয়ের কর্মসূচির সঙ্গে নানা বিপ্লবী গ্রুপ গোপনে তৈরি হচ্ছিল, বিভিন্ন নাশকতামূলক কর্মসূচি রূপায়ণে। বিমানবন্দর থেকে রাজভবন যাওয়ার পথে ম্যাকনামারার গাড়ি, গ্রেনেডে উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা যারা করেছিল, সুপার্থ ছিল তাদের সঙ্গে। ম্যাকনামারার গাড়ির আগে, পেছনে যে আরও অনেকগুলো পুলিস, মিলিটারির জিপ, রীতিমতো একটা নিরাপত্তাব্যূহ, যাকে বলা হয় 'কনভয়' থাকবে, অনুমান করেও তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে, যে কোনও ঝুঁকি নিতে সুপার্থ রাজি ছিল। কলকাতার বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনায় বসে তৈরি ছকের যে অংশ কার্যকর করার দায়িত্ব তার ওপর চেপেছিল, তার একার পক্ষে তা করা সম্ভব ছিল না। চার-পাঁচজন বিশ্বস্ত সহযোগী, তাদের দু-একজন ছাত্রী হলে ভাল হয়, কলকাতার সহযোগীরা খুঁজে নিতে বলেছিল তাকে। সহযোগী বাছতে গিয়ে সুপার্থর মনে পড়েছিল জয়াকে। কলেজ থেকে এক বিকেলে জয়া ফেরার সময়ে, তাকে সাইকেলের পেছনে তুলে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে এসেছিল সুপার্থ। জয়াকে দেখে সুপার্থর মা যে কী খুশি হয়েছিল, মাটির বাড়িতে কোথায় বসাবে, কীভাবে আপ্যায়ন করবে, ভেবে পাচ্ছিল না। মাটির বাড়ি হলেও অপরিষ্কার নয়। ঝকঝকে নিকনো দাওয়ায় সুপার্থর যে দাদা দাঁড়িয়েছিল, সে উন্মাদ, সেই মুহূর্তে জয়া বুঝতে পারেনি। পরে জেনেছিল। সুপার্থ বলেছিল। সুপার্থকে তার মা বলেছিল, বাড়িতে মেয়েটাকে নিয়ে এলি, খাওয়াবি তো কিছু।

মায়ের কথার জবাব না দিয়ে, রাস্তার লাগোয়া বাগানে তাকে নিয়ে গেল সুপার্থ। আম, পেয়ারা, কাঁঠাল, লিচু, কতরকম গাছ। বিশাল একটা গাছের নিচে প্রচুর শুকনো পাতা পড়েছিল। বাতাসে চেনা গন্ধ! সুপার্থ না বললে, গাছটা যে তেজপাতা গাছ জয়া চিনতে পারত না। রান্নাঘর ছাড়া যে পাতা কখনও দেখেনি, তা অগুনতি মাটিতে ছড়িয়ে থাকতে পারে, তার ধারণা ছিল না। আড়াআড়ি দু'কাঠে

তৈরি চেয়ারের মত খয়েরি রঙের গুঁড়ি, একটা পেয়ারাগাছ দেখিয়ে সুপার্থ বলল, দুটো ডালের জোড়, এ জায়গাটা অনেকটা চেয়ারের মত, এখানে বসে পদ্য লিখি। নিজের লেখা কবিতাব দুটো লাইন শুনিয়ে, কলকাতার ভি আই পি রোডে ম্যাকনামারার গাড়ি অ্যাটাকের পরিকল্পনাতে তার সঙ্গে জয়া থাকতে পারে কিনা, জিজ্ঞেস করল। 'না' বলার মেয়ে জয়া নয়। তখনই সে রাজি হয়ে যেতে তার হাতের পাতা ধরে, যাকে বলে 'হ্যান্ডশেক' করে সুপার্থ বলল, আমি জানতাম।

কী জানতে?

কবিতা আর বিপ্লবে রেষারেষি নেই।

শেষ বিকেলের ফুরফুরে হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছিল তেজপাতার ঝাঁঝালো গন্ধ, কাছাকাছি কোথাও কুবকুব করে ডেকে সঙ্গিনী খুঁজছিল কোনও কুবোপাখি। অল্প দূরে কাঁঠাল গাছের আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে কেউ জিজ্ঞেস করল, তুই কে রে?

জয়া ঘাড় তুলে তাকিয়ে দেখতে পেল সুপার্থর দাদা কমলকে। জয়ার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ার আগে কমল লুকিয়ে পড়ল গাছের পেছনে।

মুচকি হেসে সুপার্থ বলল, দাদাটা পাগল। আসামে চাকরি করতে গিয়ে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেল। গুয়াহাটি থেকে কয়েকশো মাইল দূরে এক নির্মাণ-সংস্থার কাজ নিয়ে গিয়েছিল। সুপারভাইজারের কাজ। 'ফিল্ডে' কাজ করার সময়ে লোহার 'বিম' পড়ে গিয়েছিল মাথাতে। সোজা মাথার ওপর পড়েনি, মাথা ছুঁয়ে গিয়েছিল। বাঁচার আশা ছিল না। বেঁচে থাকল পাগল হয়ে।

কাঁঠালগাছের দিকে তাকিয়ে উঁচু গলায় সুপার্থ বলল, দাদা, দুষ্টুমি করবি না। বাড়ি যা।

কাঁঠালগাছের পেছন থেকে আর একটা গাছের আড়ালে কমলকে নিঃশব্দে সরে যেতে দেখল জয়া। সুপার্থ তখন শোনাচ্ছিল, আমেরিকার হানাদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ভিয়েতকং গেরিলাদের দুঃসাহসী আক্রমণের বিবরণ, গেরিলা যুদ্ধের অন্যতম নায়ক নগুয়েন ভ্যান ত্রয়ের ফাঁসির কাহিনী। 'মাইলাই' হত্যাকাণ্ডের জন্যে দায়ী মার্কিনি ঘাতক বাহিনীর ওপর কীভাবে বুকে গ্রেনেড বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এক ভিয়েতকং তরুণী? সুপার্থ বলেছিল, ম্যাকনামারার কনভয়ের ওপর সুযোগ পেলে আমিও সেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ব। গ্রেনেডের সঙ্গে বুকে বেঁধে নেব একটা কবিতা।

এক মুহূর্ত থেমে বলেছিল, সে কবিতাটা উৎসর্গ করে যাব তোমার নামে।

কতজন মেয়ের নামে এ পর্যন্ত কবিতা উৎসর্গ করেছ?

একজনেরও নয়। বিপ্লবের জন্যে যে মেয়ে জীবন দিতে পারে, শুধু তার জন্যে উৎসর্গিত হবে আমার কবিতা। তুমি তাদের একজন, প্রথমজন, তুমি প্রথমা। কবিতা তোমার প্রেম আর বিপ্লব তোমার ভালবাসা।

ইন্দ্রাণী?

সে শুধু কবিতা লেখে, কবি হতে চায়, আমার হাত ধরে যতদূর কবিতা আছে, যাবে। বিপ্লবের দিকে এক-পা যাবে না, সে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে না। বিপ্লবের জন্যে যে কাঙাল নয় সে কবিতার কাঙাল হতে পারে না।

ছায়ায় ঢাকা বাগানের ভেতর দিয়ে আরও ঘন ছায়ার দিকে উন্মাদ কমল যখন হেঁটে চলেছে, একমুখ দাড়ি-গোঁফ, মাথায় লম্বা চুল, কপালে সিঁদুরের টাটকা তিলক, সুপার্থর বাবা এসে দাঁড়াল ছেলের সামনে। অপাঙ্গে একবার জয়াকে দেখে নিয়ে বলল, ব্যাঙ্কে আছে সাত টাকা। অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে টাকাটা আমি তুলে নিতে চাইতে সেখানে এক কর্মী বলল, অ্যাকাউন্ট বন্ধ করতে সাতদিনের নোটিস লাগবে। অনেক বলেকয়ে দু'টাকা তুলে আনলাম। এক টাকা তুই নে, আর এক টাকা থাকুক আমাব কাছে।

হাত পেতে এক টাকা নিল সুপার্থ। জয়ার সামনে নিজের দুর্দশার কথা ছেলেকে শোনাতে মানুষটা দ্বিধা করল না। অচেনা একটা মেয়ে যে সব শুনছে, মানুষটার গ্রাহ্য নেই। সুপার্থকে জিজ্ঞেস করল, কাল যে চাকরির তদ্বির করতে কলকাতায় যাচ্ছিস, সেটা কী পাওয়ার আশা আছে?

দেখা যাক, কী হয়।

সুপার্থর গলায় তাপ-উত্তাপ নেই। চাকরির তদ্বির করতে কাল কলকাতায় সে যাচ্ছে না। যাচ্ছে ম্যাকনামারা নিধনের ছক পাকা করতে, জয়ার বুঝতে অসুবিধে হল না। উদাসীন প্রকৃতির বয়স্ক মানুষটা হঠাৎ কী ভেবে জয়াকে জিজ্ঞেস করল, মা তুমি চালকুমড়ো খাও?

প্রশ্ন শুনে ঈষৎ থতমত খেলেও জয়া বলল, হ্যাঁ।

আমার ঘরের খড়ের চালায় একটা চালকুমড়ো বেশ পুরুষ্টু হয়েছে, পেড়ে দিচ্ছি, বাড়িতে নিয়ে যাও। মাকে বলো, রেঁধে দিতে।

বাবাকে চালকুমড়ো পাড়া থেকে নিবৃত্ত করতে সুপার্থ বলল, চালকুমড়ো পাড়ার দরকার নেই। ঘরে ডাব আছে। জয়াকে একটা ডাব কেটে দিচ্ছি।

জয়ার মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে 'জয়া' নামটা দু-তিনবার বিড়বিড়ি করে উচ্চারণ করে, সন্ন্যাসী গোছের মানুষটা বলল, আমার মায়ের নাম ছিল সর্বজয়া। সুপার্থর ঠাকুরমা ছিল সে। তোমার নামটা শুনে আমার মাকে মনে পড়ে গেল। তুমিও আমার মা।

কিছুদিন আগে, গঙ্গা থেকে সদ্য স্নান সেরে আসা, ভিজে কাপড় থেকে জল ঝরে পড়ছে, কপালে তেলে-গোলা সিঁদুরের তিলক, নাগা-সন্ন্যাসীর মত চেহারা যে মানুষকে ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে উগ্রপন্থী মায়ের কাছে উগ্রপন্থী ছেলে আর তার বন্ধুদের জন্যে করজোড়ে সভক্তি প্রার্থনা করতে শুনে কাপালিক মনে হয়েছিল, কয়েক মাস বাদে শেষ বিকেলে তাকে নিরীহ স্নেহার্ত বাবা ছাড়া জয়ার

কিছু মনে হল না। সুপার্থ যে মানুষটার প্রাণ, তার দু-চার কথায় জয়া বুঝে গেছে। স্নেহ, মায়া, মমতায় ঘন রসময়ী এই পৃথিবীকে কপালে চুমু এঁকে জয়ার বলতে ইচ্ছে করল, আমি মরে গেলেও, হে মাটি, হে আকাশ, আমাকে মনে রেখ, তোমাকে আমি ভালবেসেছিলাম। চিরকালের দেওয়ালির প্রদীপ জ্বেলে দিতে চেয়েছিলাম তোমার আকাশ জুড়ে।

ফাঁকা দাওয়ায় দাঁড়িয়ে জয়া যখন এসব ভাবছে, গ্লাসভর্তি ডাবের জল তাকে সুপার্থ এনে দিয়েছিল। জয়া কয়েক ঢোক খেয়ে ছাপিয়ে উঠতে তার হাত থেকে গ্লাস নিয়ে বাকিটা এক চুমুকে শেষ করেছিল সুপার্থ। ম্যাকনামারা কলকাতা বিমানবন্দরে হাজির হওয়ার দিনে সকাল থেকে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে ঘিরে ফেলেছিল বিমানবন্দর। 'খুনি ম্যাকনামারা ফিরে যাও' 'আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ভিয়েতনাম ছাড়ো' স্লোগানে চারপাশ কেঁপে উঠলেও ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রাক্তন মার্কিনি সেনানায়ককে কলকাতার রাস্তায় পাওয়া গেল না। ভি আই পি রোড বাতিল করে বিমানবন্দর থেকে হেলিকপ্টারে কলকাতার 'রেসকোর্সে' তৈরি 'হেলিপ্যাডে' নামিয়ে, সেখান থেকে রাজভবনে রাষ্ট্রীয় অতিথিনিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। গভীর রাতে কলকাতা যখন ঘুমন্ত, ফাঁকা রাস্তা, তখন বুলেটপ্রুফ লিমুজিনে তুলে কলকাতার, বিশেষ করে ওয়াটগঞ্জ, গার্ডেনরিচ, খিদিরপুর, কলুটোলা, রাজাবাজারের বস্তি এলাকা, সেখানকার নর্দমা, পয়ঃপ্রণালী, ম্যাকনামারাকে ঘুরিয়ে দেখানো হয়। আই এম এফের তরফে পাঁচ বছরের মধ্যে কলকাতার বস্তি আর নিষ্কাশন ব্যবস্থার খোলনলচে বদলে শহরটাকে আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক মহানগর বানানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে, পরের রাতে, নিঃশব্দে কলকাতা ছেড়ে ম্যাকনামারা সিঙ্গাপুর উড়ে যায়। তারপর পাঁচ, দশ, পনেরো অনেকগুলো পাঁচ বছর কেটে গেলেও কলকাতার বস্তি এলাকা, নিকাশি ব্যবস্থা আগের মত থেকে গেছে। সামান্য পরিবর্তন কোথাও ঘটেনি। বুকে গ্রেনেড এবং কবিতা বেঁধে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্কল্প যারা নিয়েছিল, সেই স্মৃতি তাদের কাছে ধূসর হয়ে গেলেও কখনও-সখনও মনে পড়ে বইকি! জয়ার পড়ে। তার শাড়ির কোমরের নিচে গেঁজেতে জড়ানো, কম করে দশটা, গ্রেনেডের মত বিস্ফোরণ ক্ষমতাসম্পন্ন বোমা ছিল। শাড়ির আঁচলে এমনভাবে কোমর ঢাকা ছিল, বাইরে থেকে দেখে জীবন্ত এক মানবীবোমাতে চেনার উপায় ছিল না। মগরা স্টেশন থেকে দমদম বিমান বন্দর পর্যন্ত আহ্লাদী বেড়ালের মত সন্তর্পণে হাঁটাচলা করতে হয়েছিল তাকে। তার কাছাকাছি, সব সময়ে ছিল সুপার্থ। চালচলনে সামান্য একটু বেহিসেবি হলে, কোমরে লুকনো একডজন বোমার, যে কোনও একটার বিস্ফোরণে লঙ্কাকাণ্ড ঘটে যেত। ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত সে। শুধু সে কেন, তার আশপাশে যারা ছিল, তাদের দু-একজন মারা পড়ত। জঙ্গি আত্মঘাতী বাহিনীর অনাম্নী বীরাঙ্গনা হিসেবে তাকে নিয়ে তুমুল হইচই হত। তেমন কিছু ঘটল না। ব্যাজার মুখে তাদের চারজনের

স্কোয়াড, কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরল। চটের রেশনব্যাগ ভর্তি, সুপার্থর তৈরি বোমাগুলো দলের অস্ত্রভাণ্ডারে জমা পড়েছিল। ম্যাকনামারার কনভয়ের ওপর আঘাত হানার সুযোগ, সেদিন না ঘটলেও আত্মাহুতি দেওয়ার যে শপথ নিয়ে তারা বিমানবন্দর ঘেরাও-এ সামিল হয়েছিল, তা দুজনকে অকুতোভয় করেছিল, আরও বেশি কাছাকাছি আসার সুযোগ করে দিয়েছিল তাদের। দু'জোড়া চোখ দিয়ে জীবন আর মৃত্যুকে একসঙ্গে তিলতর্পণের ধৈর্য নিয়ে তারা দেখতে শুরু করেছিল। বন্দুকের নলের ডগা দিয়ে সুপার্থকে তখনও পুলিস চিহ্নিত করেনি। রাতে বাড়িতেই থাকত। সাইকেল নিয়ে সারাদিন চষে বেড়াত নিজের পাড়া, চন্দননগর থেকে মগরা পর্যন্ত। তার সামনের সারির নেতাদের ওপর পুলিসের নজর পড়লেও মাঝরাতে বাড়ি থেকে কাউকে তুলে নিয়ে যাওয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ ভাবেনি। ঢেউয়ের আওয়াজ শোনা গেলেও প্লাবন এসে পৌঁছোয়নি। তার মধ্যে বাড়ি থেকে আরও একবার উধাও হয়ে গেল সুপার্থ। ট্রেন ধরার ঘণ্টাখানেক আগে লিখে রেখে গিয়েছিল একটা চিঠি। অবশ্য আগের দিন বিকেলে সেই কথাটা আভাসে জয়াকে জানাতে এসেছিল তাদের বাড়িতে। তার নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার সঙ্কল্প শুনে জয়া হকচকিয়ে গেলেও জিজ্ঞেস করেছিল, তাহলে এখানেই কি বিপ্লব শেষ, কবিতার সমাপ্তি?

হয়তো তাই। বিপ্লব এক কদম এগোচ্ছে না, শুধুই বাতেল্লা। আমাদের দু-তিনজন নেতা চাকরি পেয়ে দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জনে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়ে আছে। কাদের নিয়ে আমি কাজ করব? বাড়িতে, যাদের সংসারের চাপ তেমন প্রবল নয়, থাকা-খাওয়ার সংস্থান আছে, তারা চাকরি নিয়ে চলে গেল, আমি থাকব কেন? আমার বাড়িতে হপ্তায় চারদিন উনুনে আগুন পড়ে না, মুড়ি, চিঁড়ে পর্যন্ত জোটে না, আজ সকালে, তোমার দেখে আসা সেই চালকুমড়োর ঘ্যাঁট রেঁধে খাওয়া হয়েছে। 'ভাত ভাত' করে আমার পাগল দাদার সে কী দাপাদাপি আর শিশুর মত কান্না! চোখে দেখা যায় না। বিপ্লব হাত গুটিয়ে নিচ্ছে, কবিতা ত্যাগ করেছে আমাকে। কবিতাকে ছেড়ে কীভাবে বেঁচে থাকব, জানি না। অথচ মরে গেলেও লেখা ছাড়তে পারব না। লিখতে আমাকে হবেই। রক্তের ভেতর থেকে প্রতিটা শব্দ টেনে বার করতে চাই। পারছি কোথায়?

সুপার্থর কথা জয়া শুনে যাচ্ছিল। সুপার্থর আবেগ যে সুরে বাঁধা, সেখানে যত তাড়াতাড়ি আশাবাদের সুতীব্র শিস বেজে ওঠে, তার চেয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে হতাশার কালো মেঘ। এলাকার তিন নেতৃস্থানীয় কর্মী বেণু দত্ত, স্মরজিৎ কুণ্ডু, অমর বকসি যারা সমীরকাকুর ডান হাত, এলাকার মানুষের চোখে নেতা, সুপার্থর গুরু, তারা চাকরি নিয়ে নতুন ঠিকানায় চলে গেলে, সুপার্থর ভেঙে পড়া স্বাভাবিক। সত্যি কথা বলতে কি, তাদের ছায়াতে সুপার্থ বড় হয়েছে, রাজনীতি শিখেছে, তারা সুপার্থর প্রকৃত পথপ্রদর্শক। তাকে উদ্দীপ্ত করে এলাকায় আটকে রাখতে

জয়া একটা কথা বলল না। সামান্য হতাশায় বিপ্লবের এলাকা ছেড়ে যে দেশান্তর হওয়ার পরিকল্পনা করে, তার বিপ্লবের প্রতি আনুগত্য, কবিতার জন্যে ভালবাসা যে কোনও কারণে, অনায়াসে হাওয়ায় মিশে যেতে পারে। সুপার্থকে নিয়ে অযথা মগজ ভারি না করে নিজের দায়, তাকে মন দিয়ে করে যেতে হবে। সকলের আগে শেষ করতে হবে নার্সিং ট্রেনিং, কাছাকাছি কিছু পাড়ার মেয়েদের এমন গ্রুপ গড়ে তুলবে, যারা হবে স্বনির্ভর, আত্মবিশ্বাসী, নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরা নেবে এবং শেষ পর্যন্ত লড়াই-এ থাকবে। সুপার্থ যখন হতাশায় অবসন্ন হয়ে ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে, জয়া বলেছিল, আমার কোনও হতাশা নেই, বিপ্লবী রাস্তা ছেড়ে আমি নড়ছি না।

এক মুহূর্তে থেমে জয়া বলেছিল, আমি কবিতা লিখি না বটে, তবে কবিতার শিশুকে, পথের শেষে, দিগন্তরেখায়, বিপ্লব পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারি।

জয়ার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে কিছু না বলে সুপার্থ চলে গিয়েছিল। ব্যান্ডেল স্টেশনে বসে সুপার্থর লেখা যে চিঠি জয়ার হাতে এসেছিল, তার ওজন থেকে জয়া বুঝতে পেরেছিল, চিঠিটা পাঠাতে বাড়তি ডাক খরচ দিতে হয়েছে সুপার্থকে। ডাইরির ঢঙে লেখা বেশ বড় চিঠি। সুপার্থ লিখেছিল, তুমি ভেবে থাকতে পার ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছি। ভয় যে পেয়েছি তা মিথ্যে নয়। বিপ্লবী যুদ্ধে মরে গেলে ভয়ের কিছু ছিল না। বরং বুক ফুলিয়ে মরতে পারতাম। পারতাম কি? আমি মরলে আমার নাম কি ছবিসমেত সংবাদপত্রে ছাপা হবে? হবে না। আমার তো কোনও ছবি নেই। না, ভুল বললাম। ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার একটা পাসপোর্ট সাইজ ছবি আছে। দু'বছর আগে এক কপি সেই ছবি দিয়েছিলাম ইন্দ্রাণীকে। সেটাই ছিল শেষ কপি। পরে, প্রতিমা চাইতে তাকে ছবি দিতে পারিনি। ইন্দ্রাণীকে দেওয়া ছবি, সে হয়তো ফেলে দিয়েছে। টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। ইন্দ্রাণী এখন কোনও পত্রিকায় আমার কবিতা দেখলে নিশ্চয় পাতা উল্টে চোখ সরিয়ে নেয়। আমার কবিতা পড়ে না। আমার ছবিটা রেখে দিলে সেই ছবির মুখে হয়তো রোজ থুতু ছিটোয়। যত থুতুই সে ছিটোক, সংবাদপত্রে ছাপার জন্যে আরও কিছু ছবি তুলিয়ে রাখতে হবে আমাকে। কে জানে পুলিসের গুলিতে কবে মারা যাব? আমার এ জীবনের আহুতি না পেলে এ দেশে বিপ্লব জয়যুক্ত হবে না। বিপ্লবের সেই মহিমাময় জয়গাথায় নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে স্টুডিও থেকে কয়েকটা ছবি তুলিয়ে রাখতে চাই। আমার বিপ্লবী বন্ধুদের অনেকে সে কাজ করছে। ছবি তোলানোর ধুম পড়ে গেছে তাদের মধ্যে। তারা ধরে নিয়েছে, শহিদ হতে চলেছে। স্টুডিওতে তোলা ছবি না রেখে তারা মরতে চায় না। আমিও চাই না। এই আপৎকাল পেরিয়ে যদি বেঁচে থাকি, তখন এই ছবিগুলো নিয়ে কী করব? পুড়িয়ে ফেলব। জ্যান্ত মানুষটার বদলে তার ছবি! শহিদ হবে। হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি! তোমার খিদে পায় না, খাওয়ার ধান্দায় ভিখিরির মত কাজের খোঁজে ঘুরতে হয় না তোমাকে।

আমাকে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে দারিদ্র্য, অনটন, এত অভাব, এত উপোস, মনে হচ্ছে বিপ্লবী যুদ্ধ শুরু করার আগে না-খেয়ে শুকিয়ে মরে যেতে হবে। তা ছাড়া আমি বুঝেছি, আমি যা ধরব, তাই-ই হারাবে, গৈরিক তপস্যার শেষে শান্তি, অতি ভয়ঙ্কর অতি রমণীয় সেই মৃত্যু, যাকে মার্কসবাদ, অস্তিবাদ, কেউ অস্বীকার করতে পারেনি। এ পৃথিবীর কেউ কোনওদিন পারে না। মাঝে মাঝে তাই অনুশোচনা জাগে কেন আমি জন্মেছিলাম, আর জন্মালামই যদি, আমার অনুভূতিগুলো কেন এমন তীক্ষ্ণ হল! অথচ মৃত্যুতেই শেষ আমার, স্পষ্ট জেনে গেছি।

আসল ঘটনাটা বলি। কাল বিকেলে তোমার কাছ থেকে নাটকীয়ভাবে বিদায় নিতে যাওয়া ভুল হয়েছিল! ছেলেমানুষী করেছিলাম। ছেলেমানুষ হয়ে গিয়েছিলাম কিছুক্ষণের জন্যে। কাল আমায় সারাদিন দুটো ব্যাপার ব্যতিব্যস্ত করে মেরেছে, নেশা আর যৌনতা। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে দুটো তাড়নাই একে অপরের সঙ্গী, অভিন্ন তবু উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে আমার মত কড়াপাক এক বিপ্লবীকে তারা আক্রমণ করেছিল। নেশা বলতে গুরুভার কিছু নয়, সিগারেট, তবুও নেশা, নেশাই। এক বিশেষ প্রণালীতে সিগারেট খেতে খেতে শরীরটা এমন এক পর্যায়ে উঠে গিয়েছিল, যখন আর সুস্থভাবে হাঁটা যায় না, সুস্থ মস্তিষ্কে কথা বলা যায় না। শরীরে উত্তাপ ও স্বেদ জমে, কানের মধ্যে রিমঝিম বাজনা শুরু হয়।

কলকাতায় গিয়েছিলাম ড্রাইভিং লাইসেন্স রিনিউ করার কাজে। ড্রাইভারের চাকরি পাওয়া দূরে থাকুক, বিধি মেনে, নতুন লাইসেন্সের বছর পূর্তিতে রিনিউ করার মত পয়সা ছিল না। রিনিউ খরচ পাঁচ টাকা, বাবাকে গুলতাপ্পি ঝেড়ে দশ টাকা আদায় করলাম। বাড়তি পাঁচ টাকা কেন নিলাম পরে জানাচ্ছি।

কলকাতার বেলতলায় মোটর ভেহিকল্স অফিসে লাইসেন্স রিনিউ করে, বেলা দেড়টা নাগাদ হাওড়া পৌঁছে গঙ্গার ঘাটে বসে শুরু করেছিলাম সিগারেটের অর্ধেক তামাকের সঙ্গে অর্ধেক গাঁজা পুরে, নতুন প্রণালীতে বানানো সিগারেট খাওয়া। নতুন ধরনের সিগারেট বেশ কয়েকটা টানার পরে, ওখানেই গঙ্গার ঘাটে বসে তুমুল নেশাগ্রস্ত হওয়ার সঙ্গে যৌনতায় আক্রান্ত হলাম। গঙ্গার ঘাটে সেই সময়ে মেয়েদের স্নান, বিশেষ করে যারা তরুণী, যুবতী, তাদের স্বল্পবাস, ভিজে কাপড়ে ঢাকা তাদের ঊরু, স্তন, উত্তেজক দেহভঙ্গি দেখে তীব্র হয়েছিল যৌনবোধ। মনের মধ্যে বোধটা এমন পাক খাচ্ছিল, যে ইচ্ছে করছিল, তখনই কাউকে জড়িয়ে ধরি, সঙ্গম করি। তখনও কাণ্ডজ্ঞান হারাইনি, বিকৃত ক্ষুধায় শরীর বিকল হয়নি, সামাজিক জ্ঞান টনটনে ছিল। সুতরাং কোনও বিচ্যুতি ঘটেনি। (বিচ্যুতি কাকে বলে?) আমার চেতনার সবুজ জুড়ে ছড়ানো সেই সব মেয়েরা, নমিতা, ডলি, ইন্দ্রাণী, পাপিয়া, মিতুন কি জানে, কাকে বলে বিচ্যুতি? নিশ্চয়ই জানে। মনের গভীরে, আলো অথবা অন্ধকারের অবরোধে নিরুদ্ধ কামনা, বিশারদ নয়। কামনাকে প্রকাশ করা প্রাথমিক স্তরের বিকার, আর তা কার্যকর করা, জান্তব বিকৃতি। আমরা সকলে

অল্পবিস্তর জান্তব বিকৃতির শিকার। আইনি ছাপ মেরে বিকারের গা থেকে জান্তবতা মুছে ফেলে তাকে মানবিক বলে চালাই।

লোকাল একটা ট্রেন ধরে হাওড়া থেকে মানকুণ্ডু এলাম। বাড়ি পৌঁছোতে পাঁচটা। খেয়েদেয়ে বিকেল পেরিয়ে পদ্মপুকুরের পাড়ে বসে আবার সেই বিশেষ পদ্ধতিতে সিগারেট পাকিয়ে খাওয়া, আবার রিমঝিম স্তব্ধতায় চেতনাতে বিলুপ্ত হওয়ার রঙ, আবার মানসিক যৌনকণ্ডূয়ন। প্রায় শেষ বিকেলে ওখান থেকে উঠে নদীর ধারে, সেখানেও সেই একই ব্যাপার এবং ক্রমশ অন্ধকারে অবাধ নির্জনতায় শরীর মন্থন, যেহেতু আমি নারীহীন, যেহেতু আমার সমাজ অন্য কিছু বরদাস্ত করবে না। তারপর টলোমলো পায়ে উঠে কী এক ঝোঁকের মাথায় তোমাদের বাড়ি পৌঁছে গেলাম, শূন্য আমি, মস্তিষ্কহীন কবন্ধ, তোমাকে শোনালাম, আমার নিরুদ্দেশে যাওয়ার কর্মসূচি। গেরস্তর তাড়া-খাওয়া কুকুরের মত আমি তখনও হাঁফাচ্ছিলাম। তুমি কিছুই টের পাওনি, এ আমার সৌভাগ্য। নিরুদ্দেশে যাওয়ার রসদ জোগাড় করতে সকালে বাবাকে ধাপ্পা দিয়ে বাড়তি পাঁচ টাকা আদায় করেছিলাম। সারাদিনের ধকলে বাড়ি ফিরে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাতে মা আর খেতে ডাকেনি। হেঁশেলে খেতে দেওয়ার মত কিছু সম্ভবত ছিল না। সকালে ঘুম ভাঙতে শুনলাম, সংসার কীভাবে চলবে, দুবেলা দুমুঠো ভাত কেমন করে জুটবে, তা নিয়ে মা-বাবার আলোচনা, তাদের গলার আতঙ্ক মেশানো বিশ্রম্ভালাপ।

গন্তব্যহীন এক ভ্রমণে বেরিয়ে ব্যান্ডেল স্টেশনে, দূরপাল্লার একটা ট্রেনের অপেক্ষায় বসে তোমাকে এই চিঠি লিখছি। কবে ফিরব, আদৌ কোনওদিন ফেরা সম্ভব হবে কিনা, জানি না। নিয়ত দুর্ভিক্ষের পায়ের শব্দ শুনে আমি যেভাবে বেঁচে আছি, সেই জীবনযাত্রা আর ভাল লাগছে না। তাই ঘর ছেড়ে পালানো, এই হঠকারী ভ্রমণ। ঘরের বাইরে কোনওরকমে একবার বেরোতে পারলে, পরে কী ঘটবে তার কথা, তাহাদের কথা, ভাবি না। 'তাহাদের' কথা, তাহাদের মধ্যে তুমিও আছো, ভীষণরকম মনে পড়ছে, 'তাহাদের', সবাই ঘিরে দাঁড়িয়েছে আমাকে। বোধহয় বলতে চায়, 'যেতে নাহি দিব'। দায় পড়েছে তাদের এ কথা বলতে! তারা কখনও এমনভাবে বলবে না। সবটাই আমার স্বকপোলকল্পিত, আমার ভ্রম! ভ্রম, তা তুমি ভালই জানো, কেননা, জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা আমার স্বভাব। তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি। প্রবীরের কাছ থেকে তার বোন পাপিয়ার একটা ছবি চাইতে সে বলেছিল, তোর কপালে দুঃখ আছে।

প্রবীরকে বলতে পারিনি, অনন্ত দুঃখের সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে আমি বেঁচে রয়েছি। মৃত্যু ছাড়া, কোনও বিপদ, আমার কাছে বিপদ নয়। মৃত্যুও কি বড় বিপদ? সবচেয়ে বড় বিপদ, আমি কেন বিপন্ন অনুভব করি না? তবে এই মুহূর্তে বড় বিপদ হল টাকার টানাটানি। পকেটে রেস্ত বড় কম। কুল্লে বারো টাকা

জোগাড় হয়েছে। পঁচিশ টাকা ধার দিতে রাজি হয়ে জয়ন্ত, শেষ পর্যন্ত হাত গুটিয়ে নিল। জয়ন্তর টাকার অভাব নেই। সুন্দরবনের কোনও এক খালে সত্যিকার এক টাকার কুমির বন্দুক দিয়ে শিকার করেছিল জয়ন্তর বাবা। নামী শিকারি ছিল। কুমিরের পেট থেকে পেয়েছিল সাত রাজার ধনসম্পদ। এত বড়লোক হয়েও পুরনো বন্ধু জয়ন্ত পঁচিশ টাকা ধার দিল না। শুধু জয়ন্ত কেন, 'জিগরি দোস্ত' বলে যাদের ভাবতাম, তাদের কারও কাছ থেকে ভাল একটা কিট-ব্যাগ পর্যন্ত পেলাম না। আমার ছেঁড়া কিট-ব্যাগটা কাজ চালানোর মতো করে মেরামত করিয়ে নিলাম। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা পোশাকের। পাঞ্জাবি, পাজামা, কোনওটা অক্ষত নেই। পৌষ মাসের শীত ঠেকাতে ভাল গরম-জামার প্রয়োজন। তোমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গঞ্জঘণ্টায়, ছোড়দির কাছ থেকে পাঁচটা টাকা চাইলাম। ছোড়দি দিল। না চাইতে দিল জামাইবাবুর পুরনো একটা কোট। পুরনো হলেও রেলের কোট বেশ গরম। ফুটোফাটা নেই। পাড়ায় একজনের বাড়িতে দিতে হবে বলে, ছোড়দির কাছ থেকে একটা মুরগির ডিম নিয়ে, পাঁচ পয়সা দাম দিলাম। অনিচ্ছে সত্ত্বেও পাঁচটা পয়সা ছোড়দি নিল। সে কি বুঝতে পেরেছিল আমার হঠাৎ ডিম খেতে সাধ জেগেছে? ছোড়দি যাই ভাবুক, রাতে বেশ জুত্ করে ডিমভাজা খেয়েছিলাম। আহা, কী স্বাদ! অনেকদিন পরে খাওয়ার জন্যেই হয়তো এত সুস্বাদু লেগেছিল। পড়শির নাম করে কেন নিজের জন্যে ডিম কিনলাম? যে ছোড়দি অনায়াসে পাঁচ টাকা ছোট ভাইকে দিল, তাকে পাঁচ পয়সা ফেরৎ দেওয়ার ইচ্ছে জাগল কেন? চিঠিটা ব্যান্ডেলে লিখে শেষ করতে পারলাম না। প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ানো লোকাল ট্রেনটার জানালা থেকে কেউ নাম ধরে ডাকতে, চোখ তুলে দেখলাম, গলাসুদ্ধু মুন্ডু, অর্ধেকের বেশি জানালার বাইরে বার করে, আমার নজরে পড়ার চেষ্টা করছে কিশোরীদা। আমাকে ডাকছে। চোখাচোখি হতে হাতছানি দিয়ে বলল, আয়, জায়গা রাখছি এখানে।

কিশোরীদের সঙ্গে গল্প করে বৈঁচি অবধি যাওয়া যায়, হিসেব করে ট্রেনে চেপে বসলাম। দূরপাল্লার গাড়ি ধরতে বর্ধমানে অপেক্ষা করা ভাল। দেড়-দু ঘণ্টা পরে আসবে দিল্লি-কালকা মেল। বিনিপয়সার যাত্রীদের জন্যে এমন নির্ঝঞ্ঝাট স্বর্গীয় ট্রেন, আর নেই। টিকিট-চেকারদের জ্বালাতন কম, খাঁই কম। ব্যান্ডেলে ট্রেনটাতে ওঠানামার সুযোগ থাকায়, কলকাতা যাতায়াতে আগেও দিল্লি-কালকা মেলে চেপেছি। বলা বাহুল্য, বিনিপয়সায়। ট্রেনটার ধাত আমার জানা আছে।

ট্রেনে ওঠার আগে তাড়াতাড়ি যে কথাটা তোমাকে জানানো দরকার, তা হল, গ্রেনেডের সঙ্গে যে কবিতা বুকে বেঁধে ম্যাকনামারার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা ছিল, অথচ সুযোগ ঘটল না, সেই কবিতা কিন্তু তোমাকেই উৎসর্গীকৃত। ভাল থেকো।

সুপার্থর চিঠি পড়ে ভেঙে পড়ার মত কিছু ঘটেনি ভেবেও জয়া অস্থির বোধ করছিল। সুপার্থর মত দায়বদ্ধ একজন মানুষ যে উদাসীনের মতো সংসার, মা, বাবা

সব 'কমিটমেন্ট' ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারে, জয়া ভাবেনি। ভবঘুরেপনা তার আছে। বিপ্লব আর কবিতার মত ভবঘুরেপনা তাকে উদ্দীপ্ত করে, জীবনের কাছে ফিরিয়ে আনে। গাঁজাপাকানো সিগারেট থেকে সবকিছুই তার জীবনের উপকরণ। দুম করে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়াও তাই। সবটাই তার জীবন, তাই জীবনের কাছ থেকে তার পালানোর উপায় নেই। জয়ার ধারণা, সুপার্থকে সে অনেকটা চিনে ফেলেছে। তাকে পুরোপুরি সুপার্থ চেনেনি, সে এখনও ধাঁধায় আছে। এই একটা ঘটনা হয়তো জীবন থেকে আমৃত্যু তাকে উদাসীন করে রাখল, ঘরে ফিরতে দিল না। জয়া অস্থির হচ্ছিল শুধু এই ভেবে। পরের মুহূর্তে ভাবছিল, এ তার কষ্টকল্পনা। অনেকটা পথ দুজনকে যে পাশাপাশি যেতে হবে, দুজনে জেনে গেছে।

ছয়

সুপার্থ নিরুদ্দেশ হওয়ার দিন-সাত বাদে জয়া টের পেল, তাকে বিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে পরিবারের গুরুজনেরা কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে। গুরুজনদের মধ্যে মা নেই, বাবা রয়েছে। মা না থেকেও মেয়ের বিয়ের উদ্যোগে তাল দিতে যেমন বাধ্য হচ্ছে, তেমনি উদ্যোগে জড়িত থেকেও বড় মেয়ের ওপর নিগূঢ় স্নেহে বাবা দূরত্ব বজায় রাখার অভিনয় করছে। তার জন্যে যোগ্য বর খুঁজতে জ্যাঠা, জেঠি, কাকা, কাকি (একজন বাদে), তিন পিসি, আত্মীয়, আপনজনরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাদের ঘটকালীতে জয়ার সায় ছিল না বললে, কম বলা হয়, গোটা উদ্যোগটাকে সে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাইছিল। তার সামনে বিয়ের প্রসঙ্গে মুখ খুলতে কেউ সাহস পাচ্ছিল না। মুখ ফসকে কেউ বলে ফেললে, তাকে বচনের তোড়ে তুলোধোনা করছিল। সমবয়সী ভাইবোনদের মুচকি হেসে বলছিল, বিয়ে-পাগলা বুড়োদের জ্বালায় বাড়ি ছেড়ে পালাতে না হয়!

তার মন্তব্যটা বাড়িতে যতগুলো কানে পৌঁছোনো দরকার, পৌঁছে যাচ্ছিল। অভিভাবকরা ঈষৎ থমকে গেলেও তাদের উদ্যোগ থামছিল না। হিরের টুকরো কত ছেলে, জয়ার একগুঁয়েমিতে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, গোপনে তা হিসেব করতে বসে, হতাশায় ভেঙে যাচ্ছিল তাদের বুক। তবু কেউ খোলাখুলি জয়াকে বিয়ের কথাটা বলতে পারছিল না। উল্টে, বড় জ্যাঠাইমাকে জয়া যখন জিজ্ঞেস করত, 'তুমি নাকি আমাকে সাততাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বিদেয় করতে চাও', চটজলদি সে জবাব দিত, 'কী সব আজেবাজে বকছিস? আমি ওসবে নেই।'

সত্যি?

সত্যির চেয়ে বেশি, তিন সত্যি, সত্যি, সত্যি, সত্যি!

জয়া কথা বাড়াত না। সদরদরজার সামনে বারিদের মৃতদেহ রেখে, তার মুন্ডু যারা চেয়েছিল, বাড়ি তছনছ করতে চেয়েছিল, এলাকায় তখনকার মত তারা কোণঠাসা হয়ে গেলেও, আবার ফিরে এসে গোলমাল পাকাতে পারে, পরিবারের বড়দের এ ভয় যে অকারণ ছিল না, জয়া জানত। তাকে বাঁচানো তখন মুশকিল হতে পারে, অভিভাবকরা এ আশঙ্কাও করছিল। সচ্ছল সংসারে বধূ করে তাকে পাঠিয়ে দিতে পারলে সে ঝুঁকি আর থাকে না। পরিবারের অনূঢ়া মেয়ে হিসেবে তার পরিচয়, বিপজ্জনক হয়ে উঠলে, তার বধূ-পরিচয় তাকে বাঁচিয়ে দেবে। জয়া জানত, তাকে যারা শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে চায়, সকলে তার শুভাকাঙ্ক্ষী, কেউ শত্রু নয়, বিপদ থেকে দূরে রাখতে চায় তাকে। তাকে যারা 'ধিঙ্গি' বলে, তারাও ভালবাসে তাকে। সব জেনেও এক ইঞ্চি জায়গা ছাড়তে সে রাজি ছিল না। তার কাজের বহর ক্রমশ বাড়ছিল। কতরকমের কাজের সঙ্গে, মেয়েদের 'অআকখ', নামসই করা শেখানো থেকে, নবজাত সন্তান কোলে তরুণী মাকে, শিশু স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বসন্ত, টাইফয়েড, কলেরার টিকে দেওয়ার লাইনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া, খোলা নর্দমায় ডিডিটি ছড়ানোর অভিযান, জড়িয়ে পড়ছিল, এবং অক্লেশে করে যাচ্ছিল, হিসেব নেই। পাড়ার কিছু ছেলেমেয়েকে জুটিয়ে নিয়েছিল এসব কর্মকান্ডে। বলা ভাল, তারাই জুটে গিয়েছিল, স্বেচ্ছায় অনুগামী হয়েছিল তার। সংখ্যায় তারা বাড়তে থাকায় কাজের শুরু আর শেষে, আনন্দের ঢেউ জেগেছিল। বয়স্কাদের নামসই করতে শেখানোর আসর থেকে পাড়ার নর্দমায় মশা মারার ওষুধ দেওয়া পর্যন্ত সব কর্মসূচিতে কখনও অবলীলায়, কখনও ছক অনুযায়ী এসে যেত গান, কবিতা পাঠ, ছোটদের ছবি আঁকা প্রতিযোগিতা, আরও নানা মজাদার অনুষ্ঠান। সবটা যে তার ভাবনা অনুযায়ী হত, এমন নয়। কিছুটা সে ভেবে রাখত, বাকিটা, কীভাবে যেন হয়ে যেত। সেখানে সে আছে এবং সে নেই, সকলে আছে, অথচ কেউ নেই, তার আত্মবিশ্বাস বাড়ছিল, সাহস বাড়ছিল, নতুন করে পৃথিবী গড়া যে অসম্ভব নয়, স্পষ্ট অনুভব করছিল সে। পরিবার থেকে তাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসানোর উদ্যোগে সে যে জল ঢেলে দেবে, এটাই স্বাভাবিক, সে তাই করেছিল। তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছিল প্রজাপতির নির্বন্ধের সম্ভাবনা।

দু'চোখের পাতা ঘুমে ভারি হয়ে থাকলেও জয়া ঘুমোতে পারছে না। ঘুমোবার সাধ নিয়ে জেগে আছে। ঘুমোতে না পেরে জেগে থাকতে বাধ্য হয়েছে। রাত কত হল, জানার ইচ্ছে তার নেই। রাতে না ঘুমোলে কাল সকাল দশটায় অধিবেশনের শেষ দিনে, সমাপ্তিভাষণ দিতে চোখদুটো ঘুমে জড়িয়ে আসবে, এমন নয়। না ঘুমিয়ে অনেক রাত সে কাটিয়েছে। তারপর দিনের কাজে কোনও ত্রুটি হয়নি। আজ রাতে না ঘুমিয়ে ফেলে আসা পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনপঞ্জির কিয়দংশ

থেকে একটা 'ক্যাপসুল' বানিয়ে নিতে পারলে, কাল সকালে সেটাই সমাপ্তিভাষণ হিসেবে হাজির করা যায়। গল্পের মত মনে হবে সে ভাষণ। তা হোক। গল্প আর ভাষণে মিল তো কম নেই, দুটোই আখ্যান। গল্পের মধ্যে ভাষণ, আর ভাষণের ভেতরে গল্প, অনায়াসে এঁটে যেতে পারে।

আন্দাজে অন্ধকার হাতড়ে বিছানার পাশে তেপায়া থেকে জলের বোতল নিয়ে, ছিপি খুলে কয়েক ঢোক জল খেল সে। গলা শুকিয়ে গেছে। ধূসর সময় নিয়ে কিছু ভাবতে গেলে এখন এরকম হয়। মানবীবাদের উদ্দীপক মামলা নিয়ে ঘুরে বেড়ালেও টের পায়, পঁয়ত্রিশ বছর আগের জয়ার মৃতদেহ সে। জীবিতের ছদ্মবেশে বেঁচে আছে এক মৃত মানুষ। ঠান্ডা জলে গলা ভিজিয়ে বিছানায় সে বসে থাকল। নিস্তব্ধ পৃথিবী। জানলার বাইরে ঘাসের ওপর টুপটুপ করে শিশির পড়ছে। রাত বাড়তে মেঠো অন্ধকারে কমে গেছে জোনাকির ভিড়।

ঠান্ডা জলে জয়া গলা ভিজিয়ে নিতে তার মগজ পর্যন্ত আরাম ছড়িয়ে পড়ছে।

কলেজে যাওয়ার পথে এক বিকেলে সুপার্থর বাবা, তেজেশ সরকারের মুখোমুখি হয়ে গিয়েছিল জয়া। মানুষটা হন্তদন্ত হয়ে কোথাও যাচ্ছিল। জয়াকে দেখে চিনতে পেরে দাঁড়িয়ে গেল। মাথায় তামাটে এলোমেলো চুল, আধ-পাগলের বেশবাস, তেজেশ, যে তাকে চিনতে পারবে, সে ভাবেনি। পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইছিল সে। মানুষটার কথা শুনে দাঁড়াল, জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছেন?

চুঁচড়ো কোর্টে।

কথাটা বলে সন্ন্যাসীর মত চেহারা সুপার্থর বাবা, হাউহাউ করে প্রকাশ্য রাস্তায় কেঁদে উঠে বলল, আমার পাগল ছেলেটা, কমলকে, পরশুদিন সন্ধেতে সিনেমা হলের সামনে বেধড়ক মারধর করে, কিছু ছেলে, পুলিসের হাতে তুলে দিয়েছে। তার জামিন করাতে নাকানিচুবোনি খাচ্ছি। ছেলেদের অনেকে আমার চেনা, সুপার্থকেও কেউ কেউ চেনে। তাকেও একবার অকারণে ওরা পিটিয়েছিল, তখন তার বয়স দশ-এগারো, স্কুলে পড়ে। কমল যে উন্মাদ, তাদের অজানা নয়। নিরীহ সে। কারও গায়ে কখনও হাত তোলেনি। নিজের মনে মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে কথা বলে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সিনেমা হল থেকে বেরোনো একটা মেয়েকে সে অপমানজনক কথা বলেছে। মান-অপমানবোধ চিরকালের মত যার মাথা থেকে উবে গেছে, ভাষাজ্ঞান লোপ পেয়েছে, সেই পাগলকে এই চোরের ঠ্যাঙানি!

তেজেশ আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। রাস্তায় ধুলো ছিটিয়ে, হর্নের প্যাঁকপ্যাঁক আওয়াজ তুলে ছুটে চলেছে, সাইকেল রিকশা। ময়রার দোকানের সামনে মিষ্টির গন্ধ জড়ানো ধুলোমাটির গন্ধ শুঁকছে দু-তিনটে কুকুর। পাড়ার মানুষের বেশিরভাগ তেজেশকে না চিনলেও জয়া তাদের অচেনা নয়। দু-একজন এগিয়ে এসে জয়ার পাশে দাঁড়ালেও, ঘটনা জেনে সরে যাচ্ছে। 'মেয়েঘটিত' ব্যাপারে কেউ 'অ্যারেস্ট' হলে সে পাগল হোক, ছাগল হোক, তারা নাক গলাতে চায় না। ঘটনাটা যে

শোনাচ্ছে, তাকেও বিশেষ প্রকৃতিস্থ মনে না হওয়াতে জয়াকে তার শুভার্থীরা পাশ কাটাতে ইঙ্গিত করছিল। মানুষটা মিথ্যে কথা বলছে না জেনেও জয়া কী করবে, ভেবে পাচ্ছিল না। অথচ তীব্রভাবে অনুভব করছিল, অসহায় মানুষটার পাশে থাকা দরকার, আর কিছু না হোক, সান্ত্বনা দিতে পারে সে, সাহস জোগাতে পারে। সে কিছু বলার আগেই তেজেশ বলল, মা, তোমার কলেজের বোধহয় দেরি হয়ে যাচ্ছে, তুমি যাও।

বিপন্ন মানুষটা যাওয়ার আগে জয়াকে বলল, তোমাকে একদম আমার মায়ের মত দেখতে, তুমি আমার আর এক মা, তাই এত কথা বলে ফেললাম। সবই মায়ের ইচ্ছে, দেখা যাক, কোথায় তিনি নিয়ে যান আমাকে!

তেজেশ যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতে জয়া জিজ্ঞেস করেছিল, সুপার্থর খবর কি?

বন্ধুদের সঙ্গে, গত হপ্তায় সে বেড়াতে গেছে দিল্লিতে। আমি এমন হতভাগ্য বাবা, ছেলের বেড়ানোর শখ মেটাতে বিশ-পঁচিশটা টাকা পর্যন্ত দিতে পারলাম না। এ যে কতবড় মর্মবেদনা, তা ঈশ্বরের উপলব্ধি! তার কিনে রেখে যাওয়া পাঁচ কেজি মুগের ডাল দিয়ে কাল পর্যন্ত সংসার চলেছে। আজ চুলো জ্বালার সঙ্গতি নেই। তবু দ্যাখো, শাঁকআলু, নারকেল নাড়ু, রুটি, তরকারি, কমলকে দেওয়ার জন্যে নিয়ে যাচ্ছি। বাস্তুর শেষ পনেরো কাঠা জমি, নরহরিকে বেনামে লিখে চারশো টাকা পেলাম, বাকি টাকা রোজ চার টাকা করে এক বছর ধরে দেবে। তিনশো দিনে এবার বছর সাব্যস্ত করেছে নরহরি। আগেরবার ছিল তিনশো ষাট দিন। আমার দুর্দশার সুযোগ নিয়ে বেমক্কা ষাট দিন বাদ দিয়ে দিল।

আমি যাই, আলুর তরকারি ঠান্ডা হয়ে যাবে, কথাটা বলে খ্যাপার মত সুপার্থর বাবা চলে গেলেও জয়ার মাথায় দুশ্চিন্তা পুরে দিয়েছিল। সুপার্থর দাদা হাজতবাস করছে, তাদের সংসারে উনুন জ্বলছে না, দুটো মানুষ (বেশিও হতে পারে) উপোস করে আছে, এই মুহূর্তে নরহরির কাছ থেকে যে চারশো টাকা পেয়েছে, আইন-আদালতে, তা জলের মত খরচ হয়ে যাবে, ভেবে উদ্বিগ্ন হলেও তার কী করার আছে, জয়া ঠিক করতে পারছিল না। সুপার্থর বাবা, তাকে হঠাৎ 'মা' বললেও, পরের মুহূর্তে ধার বা অন্য সাহায্য চায়নি। মানুষটা শুধু যে ধর্মভীরু নয়, ইজ্জতবোধ বজায় রেখেছে, টের পেতে জয়ার দেরি হয়নি। তেজেশকে ভিখিরির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার কারণ নেই। খুব বেশি হলে ভবঘুরে ভাবা যেতে পারে। পাগল কমলকে যে অভিযোগে পুলিস ধরেছে, তা সাজানো, জয়ার বুঝতে অসুবিধে হল না। সুপার্থদের বাস্তুভিটের লাগোয়া বাগানো কয়েকদিন আগে, শেষ বিকেলে কাঁঠালগাছের পেছন থেকে যে মানুষটা 'তুই কে রে' বলে ডেকে উঠেছিল, মাথায় লোহার 'বিম'-এর আঘাত পেয়ে সে চিরকালের মত 'ছেলেমানুষ' হয়ে গেছে। নিরীহ মুখ, শিশুর মত চোখ সমেত, সেই মানুষটাকে পুলিস 'ক্রিমিনাল' ভাবল কীভাবে? নিরীহ

মানুষকে ক্রিমিনাল ভাবা কি পুলিসের রোগ? এই রোগের টিকে কি তাদের ট্রেনিং পর্বে দেওয়া হয়? মহামুনি ব্যাসদেব আর বাল্মীকির পাঠশালাতে ট্রেনিং দিয়েও পুলিসকে মানুষ করা যাবে না। সুপার্থর বাবাকে পুলিস যে যথেষ্ট রগড়াবে, জয়া অনুমান করতে পারল। কমল সহজে জামিন পাবে না। কমলকে যারা পুলিসের হাতে তুলে দিয়েছে, তারা মতলববাজ, তারা প্রভাবশালী, ক্ষমতাবানও। তাদের সম্পর্কে অনেক কথা বড়দের মুখ থেকে জয়া শুনেছে।

কলেজের গেটে জয়া যখন পৌঁছোল, কলেজ শুরুর ঘণ্টা বাজছে। সুপার্থর বাবার জন্যে উদ্বেগের সঙ্গে তার মাথাতে সেই মুহূর্তে এসে গেল, ছাত্রসংসদের আসন্ন নির্বাচন নিয়ে তাদের নিজেদের ভেতরের মতভেদ, কথাকাটাকাটি, ক্রমশ বাড়তে থাকা তিক্ততা, যা নিজেদের ভেতরে বিভাজন ঘটাচ্ছে, বিষিয়ে দিচ্ছে সম্পর্ক। ছাত্র-সংসদের নির্বাচন যারা বয়কট করতে চাইছিল, তাদের সংখ্যা বাড়ছিল। স্তিমিত হচ্ছিল নির্বাচনপন্থী বন্ধুদের কণ্ঠস্বর। জয়া টের পাচ্ছিল, সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত, অনেকাংশে অপছন্দ হলেও তাদের সঙ্গে না থেকে উপায় নেই। মৃত্যুর চেয়ে সুস্পষ্ট আর অমোঘ সংখ্যাগরিষ্ঠের নির্দেশ। তাছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠতার একটা নেশা আছে। ভিড়ই ডেকে আনে আরও বড় ভিড়। পাগলা হাতির মত রাস্তা থেকে গাঁয়ের রাখালকে শুঁড়ে করে তুলে সিংহাসনে বসিয়ে দেয়, সক্রেটিসকে বিষ খেতে বাধ্য করে, এই মহতী ভিড়। সদ্য কুড়িতে পা দেওয়া জয়া দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। দিশেহারা হয়েছিল সমীরকাকুও। স্পষ্ট করে সে-ও কোনও পথ বাতলাতে পারেনি। মহান নেতার সঙ্গে মতের অমিল ঘটলেও তা বাইরে বলার সাহস সমীরের ছিল না। মহান নেতা নির্ভুল, সে লৌহমানব, তার চেয়ে বেশিও হতে পারে। ঈশ্বর বলে কেউ থাকলে তার পরে মহানের স্থান। তাকে দেখা যায় না। নিজে অদৃশ্য থেকে সে শুধু ছোট ছোট চিরকুটে নির্দেশ লিখে পাঠায়। প্রাপককে সেই নির্দেশ মেনে কাজ করতে হয়। আলাদা কিছু চিন্তা করার অধিকার প্রাপকের নেই। সিদ্ধান্ত নিতে দোদুল্যমানতার জন্যে মহান নেতার কুনজরে পড়ে গিয়েছিল সমীর। কলেজের ভেতরে ঢোকার আগে জয়া ঠিক করেছিল, কিছুদিন কলেজ কামাই করে বাড়িতে বসে লেখাপড়া করবে। শিয়রে সমন, বি এ পার্ট টু পরীক্ষার বেশিদিন বাকি ছিল না। লেখাপড়ার বাইরে অনেকটা সময় দিয়ে ফেলেছে, তার ক্ষতিপূরণ হওয়া দরকার। কলেজে একবার ঢুকে পড়লে আত্মগোপন করে থাকা যায় না। ভিড়ে ভেসে যেতে হয়। জয়াও ভেসে গেল, পাগলা হাতির শুঁড়ে ধরা পড়ে মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে, বাতাসে হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে মেনে নিল ভিড়ের নির্দেশ। ছাত্র সংসদের নির্বাচন শুধু বয়কট নয়, ভণ্ডুল করে দেওয়া হবে, সিদ্ধান্ত নিল ভিড়। ভিড়ের মধ্যে বেশির ভাগ ছেলে মহান নেতার অনুগামী। সংখ্যায় মেয়েরা ছিল কম। ছেলেরা হইচই করলেও মেয়েরা মুখ খোলেনি। সর্বংসহা প্রকৃতির মত চুপ করে ছিল তারা। জয়া বলেছিল, সে বয়কটের বিপক্ষে হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠের (অর্থাৎ, ভিড়ের) নির্দেশ

মেনে নেবে। তার কথাটা সংখ্যাগরিষ্ঠের যে পছন্দ হয়নি তাদের গম্ভীর মুখ আর নিজেদের মধ্যে চাপা গলার কথা থেকে জয়া টের পেয়েছিল। সে ভাবছিল, কলেজে না এসে সুপার্থর বাবার সঙ্গে চুঁচড়ো কোর্টে সে চলে যেতে পারত। সুপার্থর বাবা একবার ডাকলেই তার সঙ্গী হত সে। অন্য কোথাও একা যাওয়াতে অসুবিধে ছিল না। গঙ্গার পাড় ধরে হেঁটে যেতে পারত, হুগলিতে জেগে ওঠা নতুন চরের কাছাকাছি। বাতাসে সেখানে এখনও স্থির হয়ে আছে চরের ভিজে মাটির হালকা মিঠে গন্ধ। চরে কিছু ঝোপঝাড় গজিয়েছে। কয়েকশো মেছো বক চরের দখল নিতে, এলাকার কিছু মানুষ বক শিকারের জন্যে মাঝে মাঝে সেখানে হানা দিচ্ছে। গুলতি দিয়ে বক মেরে বাজারে বিক্রি করছে বকের মাংস। সশস্ত্র সংগ্রামের সমর্থক হয়েও জয়া এ সব দেখতে পারে না। ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে হলেও নিজেকে সামলে নেয়।

হুগলির চরে না গিয়ে কলেজে এসে সংখ্যাগরিষ্ঠ বয়কটপন্থীদের চাপে, তাদের প্রস্তাবে সায় দিয়ে অস্বস্তি বোধ করছিল সে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যেতে চাইছিল। বিকেল শুরুর আগে কলেজ থেকে সে বেরিয়ে এল। মাথার ভেতরে উত্তেজনার ফুলকি উড়ছিল তখনও। মাথা ঝনঝন করছিল। চুঁচড়োর একটা বাস সামনে এসে দাঁড়াতে কয়েকজন নেমে গেল। চুঁচড়ো যাওয়ার চিন্তা মাথায় না থাকলেও জয়া উঠে পড়ল বাসে। কেন উঠল ভেবে পেল না। সত্যি কি পেল না? হ্যাঁ পেল। মনের মধ্যে মাথা গুঁজে একটু ভাবতেই জেনে গেল, চুঁচড়ো যাওয়ার ইচ্ছে, সুপার্থর বাবার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরেই মাথায় জেগেছিল। সে আশা করেছিল, তাকে চুঁচড়ো আদালতে সঙ্গী করে নিয়ে যেতে চাইবে তেজেশ। বিপন্ন মানুষটা একবার ডাকালে, কলেজে না গিয়ে তার সঙ্গী হত। আদালতে তার পাগল ছেলের জামিনের জন্যে যা করা দরকার, করত। গোপন ইচ্ছে আরও একটা, মনের গভীরে তখন জেগেছিল। সুপার্থর খবর, কিছু শুনতে চাইছিল। বাড়িতে জানিয়ে, গোন্দলপাড়া ছেড়েছে সুপার্থ। বন্ধুদের সঙ্গে দিল্লিতে বেড়াতে যাওয়ার নাম করে বাবার কাছ থেকে সে নিশ্চয় টাকা চেয়েছিল। টাকা পাওয়ার বদলে বাবার হাহাকার শুনে তাকে হাত গুটিয়ে নিতে হয়েছে। অন্যভাবে, 'ড্রাইভিং লাইসেন্স' 'রিনিউ' করার নাম করে পাঁচ টাকা বেশি নিয়েছে। সংসার ছেড়ে কিছুকালের মত পালাচ্ছে, মা বাবাকে জানায়নি। পাগল দাদাও তখন নিশ্চয় বাড়িতে ছিল। বাড়ি ছেড়ে সুপার্থ চলে যাওয়ার পরে কমলকে 'অ্যারেস্ট' করেছে পুলিস। পাগলকে আদালতে তোলার আগেই পুলিসের জেনে যাওয়া উচিত, আসামী শুধু পাগল নয়, বদ্ধ উন্মাদ। তার জায়গা জেলখানা নয়, মানসিক হাসপাতাল। পাগল দিয়ে হাসপাতালে জায়গা দখল করে রাখার চেয়ে পাগলকে জামিন মঞ্জুর করাতে ঝামেলা অনেক কম, পুলিসের অজানা নয়। কমল নিশ্চয় আজ জামিন পেয়ে যাবে। জামিনের আবেদন এতক্ষণে হয়তো মঞ্জুর হয়ে গেছে।

পাগল ছেলেকে নিয়ে তেজেশ বাড়ি ফিরে গেলে, আদালতে যাওয়া নিরর্থক হয়ে যাবে। তেজেশের সঙ্গে দেখা হবে না। কথাটা ভেবে জয়া মুষড়ে পড়েছিল। আদালত থেকে তেজেশ চলে গেলে সুপার্থর খবর জানার সুযোগ থাকবে না। তখনই তার মনে হল, সুপার্থর খবর জানতে তার এত ছটফটানি কেন? দায়িত্বহীন, বিপ্লবভীরু একজন মানুষকে নিয়ে কীসের গরজে তার এত ভাবনা? তাকে সমান মাপের মানুষের মর্যাদা দিয়েছে সুপার্থ। নিজের ভালমন্দ নিয়ে তার সামনে অকপটে মেলে ধরেছে নিজেকে। কিছু গোপন করেনি। এমনকী, সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে ন্যূনতম মিথ্যের মিশেল দেওয়া যে সত্যের তত্ত্ব সে আওড়ায়, তেমন কিছুও সম্ভবত বলেনি। বিপ্লব সফল হওয়ার আগে না খেয়ে শুকিয়ে মরার ভয়ে ঘর ছাড়ছে, নিজের মুখে সে কথা জানাতে পিছপা হয়নি। চুঁচড়ো আদালতের স্টপে যখন বাস এসে দাঁড়াল, জয়া টের পেল, সুপার্থর হয়ে নিজের স্বার্থে সে যুক্তি সাজাচ্ছে। তার জীবনের সঙ্গে সুপার্থ মিশে গেছে। সুপার্থ শুধু কবি নয়, সে বিপ্লবী। সে আরো কিছু, সে প্রেমিক। শুধু বিপ্লব আর কবিতাপ্রেমী নয়, জয়ার-ও প্রেমিক। কবিতার কাছে, বিপ্লবের কাছে সুপার্থ ফিরে আসবে। তখন জয়ার হাত না ধরে তার উপায় নেই।

আদালত চত্বর যে এরকম গোলকবাঁধা, ভেতরে ঢোকার আগে জয়া জানত না। প্রচুর লোক, কালো কোট পরা উকিল, ফেরিওলা, পুলিস, সবাই হনহন করে ডাইনে-বাঁয়ে, সামনে-পেছনে, পাঁচ আঙুলের মত ছড়ানো পিচের রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছে। মস্ত একটা বটগাছের তলায়, শানবাঁধানো চাতালে কিছু লোক ঘুমোচ্ছে। ঘুমন্ত মানুষগুলোকে আলগোছে বাঁচিয়ে, সেই চাতালে বসে খোশগল্প করছে কয়েকজন লোক। দু'হাতের মাঝখানে চা-এর গ্লাস নিয়ে চুমুক দিচ্ছে একজন। তিন-চারটে কালো পুলিসভ্যান ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই গণ্ডগোলের জায়গায় সুপার্থর বাবাকে কীভাবে খুঁজে বার করবে, জয়া বুঝতে পারল না। একজন উকিলকে ধরে জিজ্ঞেস করা যায়। কী বলবে উকিলকে? দাড়িওলা, কপালে লাল তিলক একজন মানুষ, পাগল এক আসামীর জামিন নিতে এসেছে, একথা কি বলা যায়? পুলিসকে খুঁচিয়ে কমল সরকার নামে এক কয়েদির হদিস জানা যেতে পারে। তাকে পাগল হিসেবে পুলিস এখনও চিনতে পারেনি। কিন্তু পুলিসের কাছে সে ঘেঁষতে চায় না। দু'বিনুনি বাঁধা এক তরুণীকে একা, আদালতে গাছতলায় দাঁড়িয়ে ইতিউতি তাকাতে দেখে বয়স্ক একজন মানুষ জিজ্ঞেস করল, কত নম্বরে যাবে?

প্রশ্নটার মানে আঁচ করতে পেরে জয়া বলল, নম্বরটা জানা নেই।

বুঝেছি। সঙ্গী আছে কেউ। তাই তো?

হ্যাঁ, আমার বন্ধুর বাবা। লম্বা দাড়ি, কপালে সিঁদুরের তিলক।

হাটুরে লোকটা একটু অবাক হয়ে বটগাছের পশ্চিমে, চাতালের গা ঘেঁষে বসে

থাকা এক জ্যোতিষীর দিকে আঙুল তুলে জিজ্ঞেস করল, ওই দুজনের কেউ নাকি?

চার-পাঁচ হাত দূরে দাড়িওলা এক জ্যোতিষীর সামনে, তার চেয়ে ঘন, লম্বা দাড়ি, কাঁধ পর্যন্ত নেমে আসা জটার মত তামাটে চুল, সুপার্থর বাবা যে ভবিষ্যৎ জানতে হাতের পাতা মেলে উবু হয়ে বসে আছে, এক নজরে জয়া দেখে ফেলল। আকাশের চাঁদ হাতে পেল সে। আদালতের অচেনা চৌখুপ্পিতে যে মানুষটাকে খুঁজে বার করতে জেরবার হয়ে যেত, তাকে হাতের কাছে পেয়ে যাবে, জয়া কল্পনা করেনি। জয়ার মুখ দেখে কিছু অনুমান করে অচেনা মানুষটা জিজ্ঞেস করল, কোন জন? গনৎকার, না খদ্দের?

ফিক করে হেসে জয়া বলল, খদ্দের।

মানুষটা আর দাঁড়াল না। জয়াকে না চেনার ভান করে হন্তদন্তভাবে চলে গেল। জ্যোতিষীর অল্প দূরে, সুপার্থর বাবার পেছনে জয়া দাঁড়াল। আতশ কাচ দিয়ে তেজেশের হাত দেখে মিহি গলায় জ্যোতিষী কী বলছে, জয়া শুনতে পেল না। জ্যোতিষীর কথা শুনতে তেজেশও ঘাড় কাত করে, কান বাড়িয়ে দিয়েছে। জ্যোতিষী এখন চুপ। তেজেশের দু'হাতের পাতায় আতশকাচ রেখে তন্ময় হয়ে জ্যোতিষী কী দেখছে, জয়া অনুমান করতে না পারলেও, জ্যোতিষে বিশ্বাসী মানুষটার কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিল। তেজেশ বলছিল, একুশ বছর হয়ে গেল এই কুগ্রহ, রাহুর দশা চলেছে আমার। কবে কাটবে, জানি না। ধন্য গ্রহরাজ, ধন্য তোমার কাণ্ডকারখানা! তুমি এবং তোমার অনুচররা মিলে আমাকে নিয়ে যা করার করে ফ্যালো। তিল তিল করে দগ্ধ করার চেয়ে একেবারে পুড়িয়ে শেষ করে দাও আমাকে।

তেজেশ যে আপন মনে কথা বলে চলেছে, এবং তার কোনও কথা, জ্যোতিষী শুনছে না, কয়েক মিনিটে জয়া জেনে গেল। তার কী করা উচিত, সে যখন ভাবছে, জ্যোতিষী বলল, পাপ!

কথাটা বলে তেজেশের চোখে হিমশীতল চোখ রেখে জ্যোতিষী কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার মধ্যে তেজেশ বলল, হ্যাঁ, পাপ! পাপ করেছিলাম, সন্দেহ নেই।

অব্যই করেছ, নিশ্চয় করেছ, ছোটখাটো পাপ নয়,—

মহাপাপ!

হয়তো তাই।

হয়তো নয়, হতেই হবে।

এই পর্যন্ত বলে গলা নামিয়ে জ্যোতিষী জিজ্ঞেস করল, সেই মহাপাপ কি?

প্রশ্নটা শুনে মুহূর্তের জন্যে কেঁপে উঠে 'ওঁ শিবমস্তু' বলে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে তেজেশ বলল, ত্রিকালেশ্বর ভগবানের কিছু গয়না ফাঁকতালে পেয়ে গিয়ে গায়েব করার চেষ্টা করেছিলাম।

সব জানি। তারপর?

বাড়িতে এনে ঘরের মেঝে খুঁড়ে লুকিয়ে রেখেছিলাম।

তারপর?

সারাক্ষণ ভয়ে থরথর করে কাঁপতাম, তেড়ে জ্বর আসত যখন-তখন। যমের দক্ষিণ দুয়ার দেখতে পেতাম।

কোথা থেকে পেয়েছিলে সেই গয়নার বাক্স?

ত্রিকালেশ্বরের জরাজীর্ণ মন্দির ভেঙে বর্ষায় নেমে আসা ঝরনার স্রোত থেকে।

ঝরনাটা কোথায়?

জলঢাকার কাছে এক পাহাড়ি জায়গায়। আমি তখন বিদ্যুৎ পর্ষদে চাকরি করতাম। 'পোস্টিং' পেয়েছিলাম জলঢাকায়। শালবল্লা পুঁতে বিদ্যুতের লাইন বানাতে গিয়েছিলাম সেখানে।

গয়নার বাক্সটা কোথায়?

নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম।

মিথ্যে কথা, আবার মহাপাপ করছ।

জ্যোতিষীর হাঁটুর ওপর প্রায় লুটিয়ে পড়ে তেজেশ বলেছিল, যা বলেছি, তার একবর্ণ মিথ্যে নয়। পড়ে-পাওয়া গয়নার বাক্স আমি বাড়িতে ঢোকানোর এক বছরের মধ্যে আমার ষোলো সন্তানের বারোজন সাপের কামড়ে, বিসূচিকা, টাইফয়েডে মারা গেছে। শুধু সাতদিনের মধ্যে বিসূচিকায় মারা গিয়েছিল চার ছেলেমেয়ে। আমি শেষ হয়ে গেছি ঠাকুরমশাই, আমার সব শেষ।

গনৎকারের হাঁটু থেকে মুখ তুলে তেজেশ যখন অঝোরে কাঁদছে, নরম গলায় জয়া ডাকল, শুনছেন?

প্রথম ডাক তেজেশের কানে না গেলেও দ্বিতীয়বার গলা একটু তুলে, জয়া 'এই যে, শুনছেন' বলতে আতুরের মত ভিজে চোখে মানুষটা পেছন ফিরে অভিভূত বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল। আতশকাচ সন্তর্পণে পকেটে ঢুকিয়ে জ্যোতিষী হঠাৎ কেজো মানুষের মত তেজেশকে বলল, বলুন, কী জানতে চান? কী আপনার প্রশ্ন?

জয়াকে দেখে তেজেশ এত বিহ্বল হয়েছিল, যে জ্যোতিষীকে করার মত প্রশ্ন খুঁজে পেল না। দু-একটা ভাঙা শব্দ, তার মধ্যে 'ওঁ মা শ্রীদুর্গা' ছিল, বিড়বিড় করল। জ্যোতিষীকে বলল, আমার কোনও প্রশ্ন নেই। জেনে গেলাম সব 'মায়ের' ইচ্ছে। তাঁর ইচ্ছেতেই বড় ছেলে পাগলাগারদ থেকে খালাস পাবে, ছোটটার চাকরি জুটবে।

জ্যোতিষীকে দক্ষিণা বাবদ পাঁচ টাকার একটা নোট দিয়ে তেজেশ উঠে দাঁড়াল। জয়াকে বলল, চলো মা।

বাস রাস্তায় পৌঁছোনোর আগে তেজেশের কাছে জয়ার যা জানার ছিল, সে জেনে গেল। চুঁচড়ো আদালত থেকে কমলকে জামিন করানোর সুযোগ ছিল না। চব্বিশ ঘণ্টা আগে তাকে দমদম জেলের পাগলাগারদে পাঠানো হয়েছে। দিল্লির

বদলে কাশী থেকে চিঠি লিখে সুপার্থ জানিয়েছে, সেখানে তার চাকরি পাওয়া প্রায় অবশ্যম্ভাবী। কয়েকদিনের মধ্যে পাকা কথা হবে। মনের সুখে সে কবিতা লিখে চলেছে। চিঠির সঙ্গে বাবাকে পাঠিয়েছে একটা কবিতা।

কবিতা পাঠানোর খবরটা দিয়ে, চোখ বুজে তেজেশ বলল, আহা! কী কবিতা লিখেছে ছোটবাবু!

স্নেহে বিগলিত গলা কেশে সাফ করে নিয়ে ফিসফিস করে তেজেশ বলল, এককালে আমারও কবিতা লেখার শখ ছিল। সময় সুযোগ মত এখনও ডাইরি লিখি। পুরনো ডাইরি জমে পাহাড় হয়ে গেছে।

রাস্তায় এসে তেজেশ বলেছিল, ছেলের নাম করে আনা খাবার পৌঁছোতে আমাকে এখন দমদম জেলে যেতে হবে।

কথাটা শুনে জয়া অবাক হলেও, মুখে কিছু বলল না। সুপার্থর লেখা কবিতা, এমনকী বাবাকে লেখা তার চিঠি পড়ার ইচ্ছের কথা তেজেশকে জানাতে সঙ্কোচ বোধ করল। চুঁচড়ো আদালতে যাওয়ার বাসে ওঠার আগে, আচম্বিতে তেজেশ বলল, সুপার্থর লেখা কবিতাটা তোমাকে পড়ে শোনাব। ভাল লাগবে। কবিতার প্রথম লাইন, 'তরুণ মদের পাত্র ভেঙে ফেলে হয়ে যাব সুদূরসন্ন্যাসী।'

প্রথম লাইন শুনিয়ে তেজেশ বলল, বাপের অনেক গুণ পেয়েছে যে আমার ছোটবাবু। ডাইরিও লেখে, আমি দেখেছি।

সুপার্থর কবিতাটা কবে হাতে পাওয়া যেতে পারে, জয়া জিজ্ঞেস করার আগে, স্টেশনে যাওয়ার বাসে তেজেশ উঠে পড়ল।

সাত

আমবাগানের নিরাপদ ছায়ায় সুপার্থর মুখোমুখি জয়া বসেছিল। সে যা ভাবছিল, তাই ঘটেছে। কাশী থেকে পনেরো দিনের মাথায় ফিরে এসেছে সুপার্থ। চাকরি সুদূরপরাহত, দারিদ্র্য তীব্রতর, দমদম জেলের পাগল ওয়ার্ডে আটক রয়েছে দাদা, সব জেনেও কাশীবাসের দিনগুলোতে যে উদ্যম পেয়েছে, ঘরে ফিরে তা এলিয়ে পড়েনি। পনেরো দিনের ভবঘুরেপনার আনন্দ, বুকের গভীর পর্যন্ত, নিশ্চিত কবিতার মত হাজার রমণের চেয়ে এক পর্যটনের অধিকতর সুখ, তাকে পুড়িয়ে মেরেছে, এই জন্ম শেষ জন্ম, অনুভব করে তার গায়ে কাঁটা দিয়েছে, জীবনের কাছে তাই ফিরে না এসে, তার গত্যন্তর ছিল না। বিনা টিকিটে ভ্রমণ যে এমন

উঁচুমানের 'আর্ট', আরও একবার ঝালাই করে নিয়েছিল সুপার্থ। দিল্লি যাওয়ার জন্যে ট্রেনে উঠলেও টিকিট চেকারের জ্বালায় মোগলসরাই স্টেশনে কালকা মেল থেকে নেমে, গাড়ি বদল না করে তার উপায় ছিল না। দিল্লি যাওয়া বাতিল করে, মোগলসরাই থেকে পরের ট্রেনে কাশী, যার পোশাকি নাম, বেনারস, চলে এসেছিল। দু'স্টেশনের মাঝখানে একটা স্টেশন, ব্যাসনগর, তারপর শুধু গঙ্গা পেরনোর ওয়াস্তা। ব্রিজের ওপর ঝমঝম আওয়াজ তুলে রেলগাড়ি চেপে গঙ্গা পেরনো, হালকা গেরুয়া রঙের জলে দূরে, সুদূরে ভেসে থাকা অসংখ্য কালো নৌকো, সব দেখে সুপার্থর দু'চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছিল। কালকা মেলে গাদাগাদি ভিড়ে, রাতে না ঘুমিয়ে, রাতের ট্রেনযাত্রার পরে, সকালে কাশী যাওয়ার লোকাল ট্রেনে আরাম করে বসার জায়গা পেয়েছিল।

আমবাগানের ছায়ায়, কাশী থেকে ফেরার তিন দিন পরে, ভ্রমণবৃত্তান্ত শোনাতে বসে খই ফুটছিল সুপার্থর মুখে। কাশীতে 'হরসুন্দরী ধর্মশালায়' অনেক অনুরোধ উপরোধ করে মাথা গোঁজার ঠাঁই পাওয়া থেকে শুরু করে, কাশীর বিখ্যাত দেবতার মত সেখানের বিখ্যাত গুন্ডাদের পাল্লায় পড়ে সব খোয়ানোর বদলে তদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফেলা, এক ছিলিমে গাঁজা টানা এবং মুঠোয় ছিলিম ধরার অনভ্যস্ততা হেতু, ছিটেফোঁটা ধোঁয়া বার করতে না পারা, এবং অবিরত কবিতার পায়ের শব্দ শোনা, তাকে আবিষ্ট করে রেখেছিল। পকেটের সম্বল তলানিতে এসে ঠেকলেও অকুতোভয়ে কবিতা লিখেছিল,

'এই জন্ম ঝরে যাবে সুগভীর পর্যটনে পর্যটনে
জানা ছিল তা-ও
এই রৌদ্রে আলোছায়া তবুও বিপুল নিরীক্ষণ'

কাশী বেড়ানোর গল্পের সঙ্গে, কবিতার সঙ্গে, মানসভ্রমণের বিবরণ শেষ করে সুপার্থ বলেছিল, পরশু চলে যাচ্ছি গাংনেগড়, সেখানে গণেশ বাউড়ির বাড়িতে অথবা পাশে, বেদেগ্রামে, হীরুর বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। ঘাঁটি এলাকা, করার উপযুক্ত জায়গা গাংনেগড়। কাল সন্ধের পরে, একটু রাত করে, মাঝরাতে আঞ্চলিক কমিটির সভায় পাকা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সকালে আমাকে নিয়ে এলাকাটা একবার সরেজমিনে দেখিয়ে দেবে সমীরদা। সঙ্গে থাকবে গণেশ আর হীরু। নকুল মুর্মুও থাকতে পারে। আদিবাসী এলাকা। হাজার হাজার একর খাস জমি পড়ে আছে। প্রথম মুক্ত এলাকা এই চত্বরে আমরাই গড়ব।

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে জয়াকে সুপার্থ জিজ্ঞেস করল, মেয়ে কর্মী চাই। তুমি যাবে?

প্রশ্নটা শুনে জয়া চমকে উঠল না। বলল, তেমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে, আমি রাজি।

যারা সিদ্ধান্ত নেবে, কাল রাত তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসে কথাটা বলব।

জয়াকে চুপ করে থাকতে দেখে সুপার্থ বলল, বাতাসে ভেসে আসা এক আলাদা 'লাল' জীবনের ধ্বনি বাজছে, অনবরতই বাজছে। কাল রাতে যে কবিতাটা লিখেছি, তার শেষ চার লাইন হল,

'আমার জীবন এই পথেঘাটে মাঠের ভিতর
চিরদিন জ্বলে থাকে স্থির
বয়সে উজ্জ্বল অভিপ্রায়
ক্রমান্বয়ে হৃদয়ের ঘর।'

জয়া জিজ্ঞেস করল, পুরোটা মনে নেই?

সব কবিতাতে মনে রাখার মত দু-চারটে লাইন থাকে, সেটুকু মনে রাখাই যথেষ্ট, বাকিটা পুনরুক্তি।

এক সেকেন্ড থেমে সুপার্থ বলল, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের একশো লাইনের কবিতাতে খুব বেশি সাত, দশ লাইন কবিতা আছে, পাঠক সেটুকুই মনে রাখে। আমার কবিতাতে মনে রাখার মত একটা লাইন, হয়তো একটা শব্দও থাকে না।

বিনয়!

জয়ার মন্তব্যে মুচকি হেসে সুপার্থ প্রশ্ন করল, মাসিমা, মানে, তোমার মা কি এখনও আমার কবিতা পড়েন?

জয়া বলল, হ্যাঁ, চোখে পড়লে, মা পড়ে।

সুপার্থ আর কথা বাড়াল না। দুপুর ফুরনোর আগে আমবাগান থেকে বেরিয়ে পদ্মপুকুরের পাড় ধরে যখন তারা হেঁটে যাচ্ছিল, কারও মুখে ছিটেফোঁটা উদ্বেগ ছিল না। দুজনের ছাড়াছাড়ি হওয়ার আগে জয়াকে সুপার্থ বলেছিল, একজন নারীর মুখেই শুনলাম পৃথিবীর সব আলো জ্বলে ওঠার শব্দ, বিপ্লব, আত্মত্যাগ, সংগ্রাম, সমস্তই এক সহজ উত্তরীয়ের মত আমার প্রেমকে ঘিরে ধরল, মনে হল, একজন নারীর কাছে, একজন পুরুষের সমস্ত ব্যাপ্তিকে ঘিরে তার অবস্থিতি।

জয়া অনুভব করছিল গাংনেগড় যাওয়ার আগে সুপার্থ একই সঙ্গে আরও দৃপ্ত, আরও নরম হয়ে গেছে। তার জীবন সত্যি মাঠে, ঘাটে, পথের ভেতরে আলোর কুঁচির মত ছড়িয়ে রয়েছে।

চরম সিদ্ধান্ত নিয়েও সংগঠন গড়তে সুপার্থর গাংনেগড়ে যাওয়া হল না। প্রায় মাঝরাতে আঞ্চলিক কমিটির সভাতে, আর সকলের সঙ্গে তাকে গ্রেফতার করল পুলিস। গোপন বৈঠকের খবর, আগে থেকে পেয়ে, আটঘাট বেঁধে মগরার বাড়িটা পুলিস এমনভাবে ঘিরে ফেলেছিল, পালানোর উপায় ছিল না। মাছি গলে যাওয়ার মত ফাঁক থাকলে সুপার্থ পালাত। সুপার্থ ছাড়াও ধরা পড়েছিল সমীর, বেণু, অমর, চারজনই আঞ্চলিক কমিটির সদস্য। পেট খারাপ হওয়াতে মিটিংয়ে অনুপস্থিত,

স্মরজিৎ কুন্ডু, সেও আঞ্চলিক কমিটির সদস্য, বেঁচে গিয়েছিল। সুস্থ হয়ে ওঠার আগেই, বাঘাটির বাড়ি ছেড়ে সে ভেগে পড়ায়, চিত্তরঞ্জনে সদ্য পাওয়া চাকরিটা, তার পক্ষে ধরে রাখা সম্ভব হয়। বেনু, অমর দু'জনে প্রায় একই সময়ে চাকরির নিয়োগপত্র পেলেও কাজে যোগ দেওয়ার তারিখ দু'জনেরই জেলে আটক থাকার জন্যে চোখের ওপর দিয়ে চলে যায়। পুলিস হাজতে ধোলাই, আর হুগলি জেলে লপসি খেতে খেতে হাতের মুঠোয় পাওয়া চাকরি ফসকে যাওয়ার শোকে বেণু দত্ত, অমর বকশি গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। রাজনীতি নিয়ে আলোচনার বদলে গোপন সভার খবর কীভাবে পুলিস জেনে গেল, এ নিয়ে চুলচেরা বিচার করে কখনো দুপুরে, কখনো গভীর রাতে তারা এত উত্তেজিত হত, যে চ্যাঁচামেচি লাগিয়ে দিত। কখনও ভাল কথায় তাদের বুঝিয়ে, কখনও ধমক দিয়ে, সমীর শান্ত করত।

সুপার্থ গ্রেফতার হয়ে যেতে জয়া যে ঘাবড়ে গেল, এমন নয়। অস্থিরও হল না। আরও বেশি করে পাড়ায় যে সব কাজ করছিল, নিখুঁতভাবে করতে থাকল। রাত জেগে পরীক্ষার পড়ায় অভিনিবেশ দিল। মগরার সভা থেকে মাঝরাতে সুপার্থর ধরা পড়ে যাওয়ার ঘটনাতে অবাক হয়েছিল। গোপন সভার খবর, বাড়ির ঠিকানা পুলিশ জানল কীভাবে? এ প্রশ্নের সদুত্তর না পেয়ে লখিন্দরের লোহার বাসরঘরের যে ফুটো দিয়ে কালনাগিনী ঢুকেছিল, সেই ফুটো বানানোর ইতিহাস জয়া জানে। সাপের দেবি মনসার ভয়ে বাসরঘর নির্মাতা ফুটো রেখে দিতে বাধ্য হয়েছিল। জয়া অনুভব করল, সময়ের অগ্নিবলয়ে কবিতা সমেত সুপার্থ ঢুকে পড়েছে। শেষ না দেখে সে ছাড়বে না। সুপার্থর সঙ্গে তাকেও অনেকদূর যেতে হবে। একা যেতেও সে পিছপা নয়।

জানলার পাশ দিয়ে দ্রুতগতিতে কিছু ছুটে গেল। রাতচরা কোনও জীব, তাড়া খাওয়া শিয়ালও হতে পারে। বিছানায় উঠে বসে, বোতল খুলে জল খেয়ে জয়ার মাথায় এসে গেল, কাল সকালে সমাপ্তিভাষণের বিষয়! সুপার্থর সঙ্গে অনেকদূর যাওয়ার মাঝখানে নিজের পরিচয় খুঁজে পাওয়ার কাহিনী শোনাবে সে। জেল থেকে সুপার্থ পালানোর পরে শুরু হয়েছিল সেই কাহিনী।

আট

গাংনেগড়ের এক চাষি ছিরু সোরেনের হাতে, দুলাইনের যে চিঠি, সুপার্থ লিখে পাঠিয়েছিল জয়াকে, তার মোদ্দা কথা হল, গাঁয়ে, চাষিদের মধ্যে কাজ করতে চাইলে এখানে চলে এসো। যে শাড়িটা পরে আছ, তার সঙ্গে আর একটা (হ্যাঁ, একটা-ই) মিলের সাদামাটা শাড়ি আনতে পারো। তার বেশি নয়। গরিব এক কৃষক পরিবারে তোমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। আধপেটা খেয়ে বেঁচে থাকা চাষি পরিবার। তোমারও হয়তো তাই জুটবে। ভেবেচিন্তে পা ফেলো।

পুঃ কাগজে মুড়ে একটু সিঁদুর এনো।

গাঁয়ে যেতে মনের দিক দিয়ে জয়া তৈরি ছিল। মা পাশে থাকলেও সংসারে যে ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছিল। বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে এক-পা তুলে সে যে শুধু তৈরি, তা নয়, গরিব চাষিদের নিয়ে সংগঠন গড়ার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিল।

মা বলেছিল, মানুষের জন্যে কাজ করতে তোকে যদি ঘর ছাড়তে হয়, আমি আটকাব না। সব সময়ে আমার আশীর্বাদ থাকবে তোর জন্যে।

ছোটো বোন হিমানী বলেছিল, দিদি, তোর সঙ্গে আমাকেও নিয়ে চল।

বাড়িতে ছোটো ভাইবোনদের মধ্যে তার সবচেয়ে বেশি ন্যাওটা ছিল হিমানী। পঁয়ত্রিশ বছর পরে, আজো 'দিদি' বলতে সে অজ্ঞান। চন্দননগরে তিন দিনের 'মানবীবাদী' কর্মশালায় জয়া যোগ দিতে আসছে শুনে, তাকে রেলস্টেশন থেকে সাহেববাগানের মোড়ে, নিজের বাড়িতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল হিমানী। সেখানেই গত দু'দিন জয়া রয়েছে। কাল কর্মশালার শেষ অধিবেশনে সমাপ্তি ভাষণ দিয়ে ফিরে যাবে কলকাতায়, নিজের বাড়িতে। অন্ধকার বিছানায় শুয়ে, মাথার মধ্যে সমাপ্তি ভাষণের রূপরেখা ছকে নিতে গিয়ে, ফেলে আসা অতিদূর, বহুদূর, পঁয়ত্রিশ বছর, জটাজুট ছড়ানো বটগাছের মত ছায়া প্রচ্ছায়া ফেলে, ঘন পাতার ফাঁকে বাতাসের বিলিকাটার মর্মর তুলে, তার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। এখন মাঝরাত। অনেক ঘটনার খাত পেরিয়ে গাংনেগড় যাওয়ার দিনটা তার মগজে জেগে উঠেছে। সুপার্থর চিঠি পেয়ে, বাড়ি ছেড়ে গাংনেগড় যাওয়ার দিনক্ষণ সে ঠিক করে ফেলেছিল। দুদিন পরে, বৃহস্পতিবার, বেনাদহের হাটে, অতি সকালে গাংনেগড়ের ছিরু সোরেনকে আসতে বলেছিল। সুপার্থর চিঠি ছিরু-ই এনেছিল। গাংনেগড়ের ভূমিহীন গরিব চাষি ছিরু ছিল সুপার্থর বিশ্বস্ত সহযোগীদের একজন। হাট পর্যন্ত জয়াকে পৌঁছে দিতে তার মা, সুখলতা সঙ্গী হতে চেয়েছিল। মেয়েকে কিছুটা পথ সুখলতা এগিয়ে দিতে চায়। মায়ের ইচ্ছেতে 'না' করেনি জয়া। চোখের আড়ালে মেয়ে চলে যাওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তার পাশে মা থাকতে চাইলে

কেন তাকে ঠেকাবে সে? বরং মহীয়সী মনে হয়েছিল মাকে। এই না হলে মা! দেশ একটা থাকলেও বেশিরভাগ দেশবাসী যেখানে ঠিকানাহীন, সেই অনিশ্চিত দেশের কাজে নিজের মেয়েকে ক'জন মা ঠেলে দিতে পারে? মায়ের কথা ভেবে জল এসে যাচ্ছিল তার চোখে, কবে পড়া কোন একটা কবিতার লাইন, 'তোমার বুকের পরে আমাদের পৃথিবীর অমোঘ সকাল' মনে পড়ছিল বারবার।

সবচেয়ে বড়ো ডাক, যা তার অন্তরাত্মা ধরে টান দিয়েছে তা ছিল সুপার্থর চিঠি। সুপার্থ ডেকে পাঠালে মহাকাশ থেকে সে নেমে আসতে পারে। দক্ষিণ মেরুর আকাশে অজানা নক্ষত্রের ছায়াপথ, কিলিমাঞ্জেরোর বরফ ঢাকা পাহাড় চূড়ো থেকে এক লাফে পৌঁছে যেতে পারে গাংনেগড়। কারণ একটা, সুপার্থ ডেকেছে, ডাক পাঠিয়েছে সুপার্থ!

পনেরো দিন আগে এক দুপুরে সুপার্থ যখন তার ঘরে ঢুকে নিচু গলায় 'জয়া' বলে ডেকেছিল, ক'দিন ধরে জয়া তখন ম্যালেরিয়ায় ভুগছে, ঝি ঝি ডাকছে কানের মধ্যে, চোখ খুললে স্পষ্ট করে কিছু দেখতে পাচ্ছে না, সুপার্থর প্রথমবারের ডাক, তাই তার কানে পৌঁছোয়নি। সুপার্থ দ্বিতীয়বার, তার নাম ধরে ডাকতে চোখ খুলে তাকে দেখে জয়া বিশ্বাস করতে পারেনি। রুগ্‌ণ মগজে বিশ্বাস করার মত শক্তি তার ছিল না। সুপার্থর মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলেছিল, তুমি?

হ্যাঁ, আমি।

কোর্ট থেকে কি জামিন পেলে?

না, হাজত থেকে পালিয়ে এসেছি।

অসুস্থ শরীর নিয়ে জয়া বিছানায় উঠে বসতে চাপা গলায় সুপার্থ বলল, তুমি অসুস্থ শুনে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছিল তোমাকে। ভীষণ, ভীষণ। সামলাতে পারলাম না নিজেকে। পুলিস পাহারায় হুগলি হাসপাতালে, চিকিৎসা করাতে গিয়ে দোতলার কলঘরে পায়খানা করতে ঢুকে সেখানের জানলা ভেঙে পালিয়ে এলাম। দোতলা থেকে পাইপ বেয়ে রাস্তায় নেমে, তারপর ধাঁ। জয়ার বুকের ধুকপুকুনি বেড়ে গেলেও প্রিয় মানুষটাকে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খুশিতে বিহ্বল হয়েছিল। বাড়ির সদর দরজা থেকে সকলের চোখ এড়িয়ে কীভাবে তার শোয়ার ঘরে চলে এল সুপার্থ? হুগলি হাসপাতাল থেকে তাদের সাহেববাগানের বাড়ি, সাত-আট মাইল, এতটা রাস্তা সুপার্থ এল কী করে? বাসে চেপে আসতে পারে। হাসপাতালের সেই কলঘরের নীচে মোটরবাইক নিয়ে, সুপার্থর জন্যে হয়তো অপেক্ষা করছিল কেউ। জেল পালানোর গোপন ছক আগে থেকে করে, সেভাবে সুপার্থকে হুগলি থেকে জয়াদের বাড়ির রাস্তায়, কেউ নামিয়ে দিয়েছে।

সুপার্থকে আরো নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিতে কাছাকাছি কোথাও অপেক্ষা করছে সেই বাইকওলা। ম্যালেরিয়ায় কাহিল শরীর নিয়ে, জয়া তাকিয়ে ছিল, লম্বা, ছিপছিপে, ফরসা, গভীর দুটো চোখ, রূপবান পুরুষটার দিকে। মাধ্যমিক ফেল যে সুপার্থকে কিছুদিন আগে পর্যন্ত সে অবজ্ঞা করত, মেয়েধরা ভেবে ঘেন্না করত, তাকিয়ে থাকার মত পুরুষ কখনো মনে হয়নি, সে কীভাবে দুরূহ পথের যাত্রাসঙ্গী হয়ে উঠল, জয়া ভেবে তল পায় না। নিজের মনের নিক্তি-নিরপেক্ষ এই ভোল বদলে সেই অবাক হয় বেশি। জয়ার খাট থেকে কিছুটা তফাতে ঘরে একপাশে মাদুর পেতে ঘুমোচ্ছিল জয়ার মা সুখলতা। গরমকালে জলে ভেজানো ন্যাতায় ঘরের শান-বাঁধানো মেঝে ভাল করে মুছে, মাদুর বিছিয়ে দুপুরে শুতে সুখলতা ভালবাসে, কিছু সময় ঘুমোয়। সেভাবে ঘুমোনোর ইচ্ছে রাতে থাকলেও পোকা-মাকড়ের জ্বালায় সাহস পায় না। মেঝেতে পাতা বিছানায় মশারি ফেলে রাতে ঘুমিয়ে একাধিকবার মাঝরাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখেছে, বালিশে কেন্নো বিচরণ করছে। যে কোনো মুহূর্তে কানের ভেতরে সেটা ঢুকে পড়তে পারে। ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসে তখনই বিছানার বাইরে কেন্নো সরানোর ব্যবস্থা করেছে।

বিছানা থেকে নেমে ঘুমন্ত সুখলতার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে জয়া বলল, মা, দ্যাখো কে এসেছে।

ঘুম ভেঙে যেতে মেয়ের দিকে এক লহমা তাকিয়ে, কী ঘটেছে, বোঝার চেষ্টা করতেই সুপার্থকে দেখতে পেল সুখলতা। জয়ার মুখে সুপার্থর জেল পালানোর বিবরণ শোনার আগে তখনই অনুমান করে নিল, কী ঘটেছে! মাদুরের ওপর উঠে বসে জয়ার মুখ থেকে দু-চার কথা শুনে শান্ত গলায় সুখলতা বলেছিল, সুপার্থর এখানে বেশিক্ষণ থাকা উচিত হবে না। নিরাপদ কোনো জায়গায়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওর পৌঁছোনো দরকার।

সুখলতার গলাতে না ছিল উদ্বেগ, না ছিল সামান্য উত্তেজনা! প্রদীপের সুস্থির শিখার প্রতীতি জড়ানো তার দৃষ্টির সামনে ধনুকের টানটান ছিলার মত সুপার্থর শরীরের অন্তঃগূঢ় অনুরণন কমে আসতে থাকল। অভয় পেল সে, আরাম পেল। সুখলতা ভাবছিল, হাসপাতালে পুলিসের হেফাজত থেকে সুপার্থর পালিয়ে আসার ঘটনা এতক্ষণে নিশ্চয় জানাজানি হয়ে গেছে। মুখে মুখে সে খবর ছড়িয়ে যাবে। সেটাই স্বাভাবিক। সুপার্থকে ধরতে পুলিস যে কোনো সময়ে এ বাড়িতে চড়াও হতে পারে। তারা বেশ ভালই জানে যে, এখানে তার যাতায়াত আছে। আগের মত শান্ত গলায় জয়াকে সুখলতা বলল, সুপার্থকে নিয়ে পদ্মপুকুরের ওপাশে আমবাগানে গিয়ে তুই বরং কথা বল। বাগানের একটু ভেতর দিকে চলে গেলে বাইরের কেউ দেখবে না। সেই ভাল।

কিছু ভেবে সুখলতা ফের বলল, ওকে নিয়ে গোপুদের বাড়িতে চলে যেতে পারিস, অথবা সলিলদের বাড়িতে।

পাড়ার যে কোনো বাড়িতে যেতে পারি। সব বাড়ির দরজা এখন আমাদের জন্যে খোলা। তুমি ভেবো না মা, যা করার আমি করছি।

দেরি না করে, যা ভাল মনে হয়, তাড়াতাড়ি কর।

আমবাগানেই যাই।

সুখলতা চুপ করে থাকল। সুপার্থ বলল, পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে একবার যখন পালিয়ে আসতে পেরেছি, আমার টিকি ওরা আর ছুঁতে পারবে না।

মা শান্ত গলায় কথা বললেও চাপা উত্তেজনায় ভুগছে, জয়া টের পেয়েছিল। সুপার্থকে বলল, চলো, আমরা বেরোই।

ম্যালেরিয়ায় কাবু যে জয়া বিছানা ছেড়ে আগের দিন পর্যন্ত উঠতে পারছিল না, সুপার্থকে দেখে খাট থেকে নেমে সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাথা ঘুরছে না, ধুতরো ফুল দেখছে না চোখে। রীতিমতো সুস্থ, চনমনে তার ভঙ্গি।

সুখলতার কপালে তিনটে সরু রেখা জেগেছে। মা কিছু ভাবছে টের পেয়েও জয়া জানতে চাইল না। সুখলতা সত্যি ভাবছিল অন্য এক বিপদের কথা। পাড়া ঘিরে পুলিসের চিরুনি তল্লাশিতে আমবাগান পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলে, সুপার্থ পালাবে কোথায়? জেল থেকে পালিয়ে আবার ধরা পড়ে গেলে, তাকে গুলি করে মারতে পুলিসের হাত কাঁপবে না। খবরের কাগজে এখন প্রায়ই 'পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে উগ্রপন্থী নিহত' 'হেডলাইন' করে যত খবর বেরোয়, তার নিরানব্বই শতাংশ ঠান্ডা মাথায় পুলিসের খুন করার ঘটনা।

খাট থেকে জয়া মেঝেতে পা রাখার আগে সুপার্থ বলল, বিশুর বাড়ি থেকে ঘুরে আমি এখনই ফিরে আসছি।

জয়া কিছু বলার আগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সুপার্থ। ফিরল প্রায় একঘন্টা পরে। উদ্বেগে জয়া তখন ছটফট করছে। ফ্যাকাশে হয়ে গেছে জয়ার মা, সুখলতার মুখ। সুপার্থকে দেখে জয়া ধমক লাগাতে গিয়েও চুপ করে থাকল। শেষ দুপুরে সুপার্থকে নিয়ে পদ্মপুকুরের ধার দিয়ে আমবাগানের দিকে জয়া হাঁটতে থাকল। সুপার্থকে দেখে বুকে খুশির যে ঝড় বইছিল, সেই আভা ছড়িয়ে পড়েছিল তার মুখে। সুপার্থর একটা কথা, 'ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছিল তোমাকে,' জাহাজের মাস্তুলের মত তার মনের দিগন্ত পর্যন্ত জাগিয়ে তুলেছিল। খুশি আর ভয়, শিহরন তুলেছিল সেখানে। তাকে একবার দেখতে জেল ভেঙে সুপার্থ যে পালিয়ে আসতে পারে, তার ধারণা ছিল না। সুপার্থর সঙ্গে গেল ছমাসে ধীরে ধীরে তার যে বন্ধুতা গড়ে উঠছিল, তা এত গভীর তীব্র ভালবাসার চেহারা নিয়েছে, জয়া কল্পনা করেনি। সত্যি কি করেনি? মগরা স্টেশনের কাছে এক বাড়িতে, মাঝরাতে গোপন বৈঠক

থেকে পুলিসের হাতে তার ধরার পড়ার খবর শুনে তার বুকের ভেতরটা যে শূন্য হয়ে গিয়েছিল, তা অকারণ নয়। বুকের মধ্যে, সময়ে অসময়ে জেগে ওঠা হাহাকারকে তর্জনী তুলে শাসন করতে নিজেকে কড়া ধমক দিয়ে বলেছিল, এসব মেয়েলি ন্যাকামি, সুপার্থর সঙ্গে পরিচয়ের আগেই মেয়ে হিসেবে তুই যে যুদ্ধ শুরু করেছিলি, তা ভুলে যাসনি। সমাজে মেয়ে-পুরুষের সমান মর্যাদার ঝান্ডা যে মেয়ে তুলে ধরেছে, তার এই নাকিকান্না সাজে না। যত সব মেয়েমানুষি!

হুগলি জেলে সুপার্থ কয়েদ হওয়ার পরের তিন মাসে জয়া অনেকটা নিজেকে সামলে নিয়ে ঘোরতরভাবে দলীয় গোপন কাজে ঢুকে পড়েছিল। নাকের ডগায় এসে গিয়েছিল কলেজের শেষ পরীক্ষা। সবরকম চাপের মধ্যে যতটা সম্ভব শান্তভাবে নিজের কাজ করে যাচ্ছিল সে। ম্যালেরিয়ায় বিছানাবন্দি হয়েও কত তাড়াতাড়ি রোগবালাই থেকে রেহাই মিলবে, তা ভেবে ছটফট করছিল। তার মধ্যে ভরদুপুরে সুপার্থ নিঃশব্দে তার বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়ে কয়েক সেকেন্ডে লণ্ডভণ্ড করে দিল তার রোগকাতরতা। ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিল ম্যালেরিয়া রুগিকে বিছানায় আটকে রাখার ডাক্তারি নিদান। কয়েক সেকেন্ডে চাঙ্গা হয়ে উঠল জয়া। সুপার্থর কাছ থেকে এতটা সে আশা করেনি। তার আগে কম করে এক ডজন প্রেমিকা চরিয়েছে সুপার্থ। সকলে যে সরাসরি প্রেমিকা ছিল, এমন নয়। চার, পাঁচজনকে প্রেম নিবেদন করার মত সুযোগ পায়নি সুপার্থ। সাহসের অভাব ছিল কিছুটা, নীরব প্রেমিক থাকাই বোধহয় বেশি পছন্দ ছিল তার। মনের মধ্যে প্রেম করার আকাঙ্ক্ষা তীব্র, তীব্রতর করে একান্ত এক কল্পজগতে বুঁদ হয়ে থাকাটাই হয়তো তার ধারণায় ছিল প্রকৃত প্রেম। ফলে, পরের পর একটা করে মেয়ের সঙ্গে সে প্রেমে পড়লেও তার কাল্পনিক প্রেমিকাদের বেশিরভাগ সে খবর পেত না? দু-একজন যারা পেত, তাদের কাছে প্রেমিক সুপার্থকে নির্ভরযোগ্য মনে হত না। যোগ্যতর ছেলে পেলে তারা তদ্দণ্ডে ভেগে যেত। সময়ের ঘূর্ণিঝড়ে প্রেমের সঙ্গে মিশে গেল সমাজ বদলানোর তাগিদ, এক দশকে বিপ্লব শেষ করার স্বপ্ন। সব কিছুর আগে তৈরি হয়েছিল কবিতা লেখার বাতিক। বলা যায়, কবিতা পাগল হয়ে উঠেছিল সে। বেঁচে থাকা আর কবিতা লেখা অভিন্ন হয়ে উঠেছিল। তীব্র, নিখাদ, জ্বলন্ত সেই অভিন্নতার আঁচ নিয়ে লেখা তার কাছে হয়ে উঠেছিল এক দুস্তর তপস্যা, রমণীয় মৃত্যু।

পদ্মপুকুরের কিনারা ঘেঁষে পায়ে-হাঁটা রাস্তা ধরে, আমবাগানে দুজন ঢুকে পড়ার আগেও জয়া খেয়াল রেখেছিল, তাদের কেউ নজর করল কিনা! হেমন্তের দুপুর ফুরিয়ে আসছে। পাড়ার রাস্তায়, পুকুরপাড়ে এ সময় মানুষজন থাকে না। কারো দৃষ্টি পড়েনি তাদের ওপর। মুখে কিছু না বললেও অচেনা ভয়ে জয়ার বুকের ভেতরটা কাঁপছিল। জেল ভেঙে সুপার্থ যে পালিয়ে আসতে পারে, এ

ধারণা তার ছিল না। সুপার্থর খোঁজে পুলিসবাহিনী এতক্ষণে নেমে পড়েছে, অনুমান করতে পারছিল সে। গোন্দলপাড়ায় যেখানে সুপার্থর বাড়ি, সেখানে হয়তো ইতিমধ্যে চিরুনি তল্লাশি শুরু হয়ে গেছে। সাহেববাগান, লিচুতলাতেও হবে। তাদের এলাকা যে দলের শক্ত ঘাঁটি পুলিসের অজানা নয়। যার জন্যে চিরুনি তল্লাশি, তাকে না পেলে, কোনো এলাকা থেকে খালি হাতে পুলিস ফেরে না। আঠারো থেকে পঁচিশ-ত্রিশ যাদের বয়স, সেরকম সাত-দশজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে কোমরে দড়ি বেঁধে তুলে আনে। বেমক্কা পেটাই করে আধমরা করে দেয়। জেরা করে কাজের কাজ কিছু না হোক, আরো জেরা করার জন্যে জামিনের অযোগ্য অভিযোগে জেলে পুরে দেয়। সাহেববাগান ঘেরাও করে পুলিস আজ তল্লাশি চালালে, জয়া জানে সে রেহাই পাবে না। বছরখানেক আগে, বারিদের খুনের ঘটনার পর থেকে তার নাম পুলিসের খাতায় উঠে গেছে। বাড়ি ছেড়ে তখন চলে যেতে হয়েছিল তাকে। সাত দিন গা-ঢাকা দিয়েছিল। তখনই এক গোপন সভায় সুপার্থর সঙ্গে পরিচয় হয়। ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। কবিতার জন্যে তার বুকের মধ্যে সেই অবিরত রক্তক্ষরণ, আর পাশাপাশি ক্রমাগত নতুন প্রেমিকার অনুসন্ধান যে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ, অল্পদিনে জয়া টের পেয়েছিল। সুপার্থর কবিতা পড়ে জেনেছিল।

'বুকের গোপনে আছে রক্ত, রক্ত নয় নির্জনতা
আরো সে গোপনে থাকে মৃত মানুষের গভীরতা।'

জয়াকে এই আমবাগানে বসে এক নিস্তব্ধ দুপুরে সুপার্থ বলেছিল, বিপ্লবের জন্যে যেমন আমার সমস্ত অস্তিত্ব, তেমনি কবিতাতেও সমর্পিত আমার অস্তিত্ব।

আমবাগানের খানিকটা ভেতরে এসে হাসপাতাল থেকে পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে পালানোর বিবরণ চাপা গলায় সুপার্থ শোনাচ্ছে। বলল, জানো নিশ্চয়, ইচ্ছে করলে শরীরে আমি জ্বর টেনে আনতে পারি। গায়ে হাত দিয়ে দেখবে, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। থার্মমিটার লাগালে দেখা যাবে, একশো দুই, তিন টেম্পারেচার। ম্যালেরিয়ায় তুমি শুয়ে আছে, জেনেছিলাম কয়েকদিন আগে। জেল পালানোর চিন্তা তখনই মাথায় আসে। ইচ্ছেটা জেলের বাইরে নেতাদের কাছে পাঠাতে তারা 'গ্রিন সিগন্যাল' দেয়, ব্যাস। কাল সকাল থেকে ধুম জ্বর এল আমার। প্রচণ্ড জ্বর। তার আগে, বলা যায় ভোর রাত থেকে, দুঘণ্টা ধরে, একটা কবিতার প্রথম লাইন নিয়ে ডুবে ছিলাম। কিছু শব্দ খুঁজছিলাম বুকের মধ্যে আগুন জ্বেলে। কবিতাটা ছিল রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে, যার প্রথম লাইন, 'অথচ তোমার সঙ্গে কোনো আত্মীয়তা খুঁজে পাই না আর', লিখে পরের লাইনের প্রথম শব্দ হাতড়ানোর মধ্যে অনুভব করলাম, যা চাইছিলাম, তা ঘটছে। জ্বর আসছে, তেতে উঠছে শরীর, দগ্ধ গন্ধর্বের মত সামনে রবীন্দ্রনাথের ছায়াশরীর ভোরের আলোয় কাঁপছিল, আমার হাতে,

বুকে চাকাচাকা লাল দাগ জেগে উঠছে, জ্বর হলেই এরকম হয়। আমি খুশি হলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে জ্বরে পুড়তে থাকবে গা, এক-দুবার বমি হবে। জ্বর-বমির প্রথম দিনে জেল হাসপাতলের ডাক্তারের লাল, সাদা পাঁচন খেতে হয়। চব্বিশ ঘণ্টায় জ্বর না ছাড়লে, পরের দিন সকালে পুলিস পাহারায় সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয় জেল কর্তৃপক্ষ। সদর হাসপাতালে পৌঁছতে চাইছিলাম আমি। জেল থেকে আমার পালানোর ছক সেভাবেই করে রেখেছিল দলের বন্ধুরা। জেল হাসপাতালের ডাক্তারের দেওয়া দু'শিশি লাল আর সবুজ মিক্সচার, পাহারাদারদের নজর এড়িয়ে নর্দমায় ঢেলে দিয়েছিলাম। মিক্সচার খেলে যে জ্বর ছেড়ে যেত এমন নয়, তবু ঝুঁকি নিইনি এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আত্মীয়তার কেন সুযোগ নেই, তা বলার জন্যে নিজের রক্ত খুঁড়ে অমোঘ শব্দগুলো জ্বরের ঘোরে খুঁজে যাচ্ছিলাম। আর খুঁজছিলাম একটা মুখ। সে মুখ কার? শুধু কবিতার নয়, ভালবাসার মুখ, তুমি তো জানো। কবিতা আর প্রেমের প্রহারে বন্দি বিপ্লবীর জ্বর চড়ছিল চড়চড় করে। সদর হাসপাতালে আমাকে না পাঠিয়ে জেলকর্তাদের যে উপায় নেই, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত হচ্ছিলাম।

যা ভেবেছিলাম, তাই ঘটল। আজ সকালে পুলিসের কালো ভ্যানে তুলে দুই সেপাই হাসপাতালে নিয়ে এল আমাকে। হাসপাতালে ঢোকার সময়ে ভ্যানের জাল লাগানো বন্ধ দরজায় চোখ রেখে দু-একটা চেনা মুখ দেখার আশায় চাতকের মত রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কাউকে না দেখলেও জানতাম, তারা আছে, আশপাশে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। হাসপাতালে আমাকে ডাক্তার দেখিয়ে, বাইরে এনে, জেলে ফেরত নেওয়ার জন্যে ভ্যানে তোলার আগের মুহূর্তে বোমা, রিভলবার নিয়ে বন্ধুরা অপারেশনে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাদের সঙ্গে থাকবে নাম্বার প্লেট বদলানো প্রাইভেট গাড়ি। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে আমাকে তোলার জন্যে ড্রাইভার অপেক্ষা করবে। আস্তে আস্তে আমার জ্বর ছেড়ে যাচ্ছিল। পালানোর ছক সফল করতে চাঙ্গা হয়ে উঠছিলাম। জেল থেকে প্রায় বেহুঁশ অবস্থায় আমাকে ভ্যানে তোলার সময়ে আমার দুহাতের হাতকড়া খুলে দিয়েছিল জমাদার। শুধু কোমরে বাঁধা ছিল দড়ির ফাঁস। সদর হাসপাতালের দোতলায় যে ডাক্তারের ঘরে আমাকে নিয়ে যাওয়ার কথা, তার কাছে আগে দু'বার জেল হাসপাতাল থেকে আমাকে পাঠানো হয়েছিল। দোতলায় ডাক্তারের ঘরের খানিকটা আগে বাঁদিকে এক চিলতে গলির মধ্যে কলঘর, পায়খানা। দ্বিতীয় দফায় হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে এসে পায়খানাটা ব্যবহার করেছিলাম। কল-পায়খানা যেমন নোংরা, তেমন জীর্ণ। বেকায়দায় না পড়লে ভেতরে কেউ ঢোকে না। প্রকৃতির চাপে সেবার না ঢুকে উপায় ছিল না। কাজ সারতে কয়েক মিনিট লেগেছিল। তার মধ্যে যা দেখার দেখে নিয়েছিলাম। ঘুলঘুলির চেয়ে একটু বড়ো জানলার চারটে সরু লোহার শিক মরচে ধরে প্রায় হেজে গেছে। আলগা হয়ে গেছে সিমেন্টের গাঁথনি। জানলার দুর্দশা দেখে আমার মনে সেদিন যে ইচ্ছে তীব্র হয়েছিল,

তখনকার মত তা গিলে নিলেও, ইচ্ছেটা মাথা ছেড়ে যায়নি। আজ সকালে কলঘরের সেই গলির কাছে এসে মনে হল, এ সুযোগ ছাড়ার মানে হয় না। হাসপাতালের সদর দরজাতে পুলিসের হেপাজত থেকে বন্ধুরা আমাকে ছিনিয়ে গাড়িতে তুলে উধাও হওয়ার পরিকল্পনা আগেভাগে করে রাখলেও, তার আগেই যদি কেটে পড়তে পারি, কেন সে ব্যবস্থা করব না? সবচেয়ে বড় কথা, গোলাবারুদ অপচয় না করে, কাজটা একা চুপচাপ করে ফেলা যায়। অযথা হল্লা কবে লাভ নেই। আমাকে না পেলে বন্ধুরা বেশিক্ষণ অপেক্ষা করবে না, নিঃশব্দে গুটিয়ে নেবে নিজেদের, তাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হবে না। সঙ্গী জেলের জমাদারকে বললাম, বহুত জোর টাট্টি লাগ গিয়া হ্যায়।

জ্বরের তাড়সে যার খাল খিঁচে গেছে, চলার ক্ষমতা নেই, ধুঁকছে, তাকে পায়খানায় ঢুকতে দিতে জমাদার সাহেবের আপত্তি হওয়ার কথা নয়। আপত্তি সে করল না। সঙ্গী এক জেলসিপাইকে বলল, দড়ির খুঁট ধরে কলঘরের বাইরে অপেক্ষা করতে। সে তাই করল। বলল, জলদি কাজ সারো।

কোমরে জড়ানো দড়ির আলগা ফাঁস নিয়ে কলঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে পায়খানায় ঢুকলাম। সে দরজাটাও ভেজালাম। জেলের কয়েদি বাঁধার দড়ি মানে, গোরুবাঁধার কাছির মত মোটা, ওজনদার। কাছি থাকার জন্যে ভেতর থেকে দুটো দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি আটকানোর উপায় নেই। সে চেষ্টা করলাম না। গোবেচারা মুখ করে পায়খানায় ঢুকে যা দেখলাম, তা কল্পনায় ছিল না। জানলার চারটে শিকের মাঝের দুটো এমন নড়বড়ে হয়ে রয়েছে, যে দুটো হ্যাঁচকা টানে লোহার শিকদুটো খুলে আমার হাতে চলে এল। উপড়ে আসা দুটো শিকের মাঝখান দিয়ে মুন্ডু গলাতে গিয়ে টের পেলাম, বাঁ অথবা ডানদিনের একটা শিক কম করে পাঁচ ইঞ্চি সরাতে হবে। গায়ে যত জোর আছে, সবটা এক জায়গায় করে চাপ দিতে মান্ধাতা আমলের সরু শিকটা মট করে ভেঙে গেল। তখনই কোমরের দড়িতে বাইরে থেকে টান পড়ল।

'ক্যা ভৈল বা' হাঁক দিল সিপাই।

আউর দো মিনিট সিপাইসাব।

আমার জবাব শুনে পাহারাদার স্বস্তি পেল। দড়িটা আগের মত টানটান রাখতে কায়দা করে কোমরের ফাঁস নিঃশব্দে খুলে কলের পাইপে জড়িয়ে দিলাম। হাসপাতালের আবর্জনা বোঝাই জানলার কুড়ি ফুট নীচে সরু গলিটাতে লোক চলাচল প্রায় নেই। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে জানলার বাইরে বেরিয়ে এসে ডান দেওয়ালে জলের একটা পাইপ পেয়ে গেলাম। তারপর আমায় পায় কে? ঘুড়ি ভোকাট্টা! হাওয়াই চপ্পল জোড়া পায়খানার ভেতরে রেখে আসা ছাড়া উপায় ছিল না। আমাকে উদ্ধার করতে দলের যে বন্ধুদের হাসপাতালের সামনে গেটে থাকার কথা ছিল, তাদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ আমার ছিল না। হাসপাতালের

পেছনের রাস্তায় এসে গজঘণ্টা যাওয়ার একটা বাস পেয়ে উঠে পড়লাম। দুটো টাকা ছিল পকেটে। বাসের ভাড়া দিতে অসুবিধে হয়নি। জেল পালানো যে এত সোজা, আমার ধারণা ছিল না।

এক সেকেন্ড থেমে সুপার্থ বলল, অবশ্য আমার বুক ফুটো করে তখন একটা গুলি চলে যাওয়া আরো সোজা ছিল। ভাগ্য ভাল, তেমন কিছু ঘটেনি। সুপার্থর শেষ কথাটা শুনে জয়া আঁতকে উঠলেও সে যে একই রকম ভাবছিল, বলতে পারল না। সে ভাবছিল সুপার্থর খোঁজে সম্ভাব্য ঠিকানাগুলোয় পুলিস হানা দিলে, তাদের বাড়ি বাদ যাবে না। সুপার্থকে না পেয়ে পুলিস যে তাকে তুলে নিয়ে যাবে, এ নিয়ে সন্দেহ নেই। মেয়েদের অ্যারেস্ট করে পুলিস যে খিস্তির লহরা ছোটায়, তার কিছু অংশ সে শুনেছে। জামিনে ছাড়া পাওয়া শ্রীরামপুরের দলীয় কর্মী বিনীতা, লিচুতলায় সভা করতে এসে, আড়ালে তাকে শুনিয়েছিল সেই কাহিনী। সবচেয়ে নরম কথাটা ছিল, 'বিপ্লব...ঢুকিয়ে দেব।'

নিজের হেনস্তা, ক্ষয়ক্ষতি নির্যাতনের চেয়ে জয়া বেশি করে ভাবছিল সুপার্থর নিরাপত্তা নিয়ে। জেল-পালানো বিদ্রোহী যুবকদের গুলিবেঁধা লাশ রাস্তায় ছড়িয়ে রাখার রেওয়াজ এ রাজ্যে চালু হয়ে গেছে, দেশ দুনিয়ার সবাই জানে। সব জেনেও চুপ করে থাকে। মৃত্যুও এখানে মুখ খুলতে ভয় পায়।

আজ বিকেলে অথবা মাঝরাতে এ পাড়া পুলিস ঘিরবে, আঁতিপাতি করে সুপার্থকে খুঁজবে, জয়া জানে। পুলিসও কম চতুর নয়। তারা জেনে গেছে, তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরের ছেলেরা কোনো ঠিকানাগুলো এড়িয়ে যাবে, কোনো আশ্রয়ে রাতে ঘুমোবে না। পুলিসের যেমন অনেক গুপ্তচর রয়েছে, তাদের চোখে ধুলো দেওয়ার মত বুদ্ধিমান ছেলে কম নেই। তারা শুধু বুদ্ধিমান নয়, তাদের চোখে নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন, মরতে তারা ভয় পায় না। বিশাল আমবাগানের নির্জনতম জায়গায়, যেখানে আগে সুপার্থর সঙ্গে কয়েকবার জয়া এসেছে. অদূরে চালাঘর, যেখানে আমের মরশুমে বাগান জমা নেওয়া মহাজনের রক্ষীরা ডেরা গাড়ে এবং তাদেরই তত্ত্বাবধানে থাকে দলের অস্ত্রভাণ্ডার, অনেক রাত সুপার্থ সেখানে বাগানরক্ষীদের সঙ্গে ঘুমিয়েছে, সেই চালাঘরের পেছনে ঝাঁকড়া আমগাছের তলায় দুজন বসল। মুখোমুখি নয়, পাশাপাশি। সুপার্থ বলল, পরশু ভোরে চলে যাচ্ছি গাংনেগড়। আপাতত সেখানেই আস্তানা। তুমি যাবে তো?

যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়ে আছি।

জয়ার পিঠের ওপর আলতো করে হাত রেখে সুপার্থ বলল, বিপ্লব, কবিতা আর নারী, এই তিনের মধ্যে এক নম্বরে কার জায়গা, এখনো বুঝে উঠতে পারিনি। তুমি জানো?

জয়া প্রথমে জানি না বললেও দু'সেকেন্ড পরে বলল, আমি যদি জিজ্ঞেস করি, বিপ্লব, কবিতা, আর পুরুষের মধ্যে কোনটা সবার আগে, তুমি কী জবাব দেবে?

সুপার্থ এক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, জানি না। একটা মেয়ের শরীর লুঠপাট করতে কখনো খেপে উঠলে তখনই কবিতার শরণাপন্ন হই। মাথায় নতুন একটা কবিতার লাইন এসে গেলে শরীরের তাপ কমে যায়। অসমাপ্ত কবিতার শেষ লাইন খুঁজে পেতে যখন যন্ত্রণায় ছটফট করি, তখন মাথায় ভেঙে পড়ে বিপ্লবের ঢেউ। টের পাই পৃথিবীটা বদলাতে হবে, ঢেলে সাজাতে হবে এই সমাজকে। কীভাবে মেশাব এদের জানিনা। মহা ধাঁধায় পড়ে গেছি আমি। বিপ্লব, কবিতা আর ভালবাসার মধ্যে কোনটা এক নম্বর, ভেবে চলেছি।

বিপ্লব, কবিতা আর ভালবাসা, কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না।

সুপার্থ বলল, ভালবাসা বললেই কেন মেয়েদের মুখ মনে পড়ে, জানি না। নমিতা, ডলি, ইন্দ্রাণী, প্রতিমা, মিতুনকে ভালবাসার কথা ভাবলেই মনে পড়ে তাদের মুখ, চোখ, চিবুক, সারা শরীর। পুলিসের হাতে ধরা পড়ার আগে চোখের সামনে সবসময় ভাসছিল তোমার মুখ। পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে হাসপাতাল থেকে আমার পালিয়ে আসার কারণ, শুধু বিপ্লব নয়, তুমিও। বোধহয়, সেটাই প্রথম কারণ। তুমি অসুস্থ শুনে, ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছিল তোমাকে।

নয়

বিপ্লবের জন্যে আত্মত্যাগ করার সঙ্গে অসুস্থ জয়াকে দেখার ইচ্ছে যে প্রবল হয়েছিল, জেল ভেঙে পালিয়ে আসার সেটাও যে একটা বড়ো কারণ, সেই সন্ধেতে আমবাগানে বসে দলীয় সহকর্মীদের তা জানাতে সুপার্থর গলা কাঁপেনি। অসম্ভব সাহসের সঙ্গে, গুছিয়ে, কবিতার মত করে কথাটা বলেছিল। বলেছিল, জয়াকে না দেখতে পেলে বিপ্লব করব কী করে? আর বিপ্লব না করে জয়াকে ধরে রাখব কীভাবে?

মেয়েদের নিয়ে দলের সভায় কথা চালাচালিতে যারা নাক কুঁচকোয়, মা, বউ এমনকী কুক্ষিগত মেয়েমানুষ থাকলেও সংসারকে স্ত্রীবিবর্জিত ভাবে, এবং সে বিষয়ে আলোচনা উঠলে হইচই করে থামিয়ে দেয়, সব দলেই এরকম লোক দু-একজন থাকে। আমবাগানের বৈঠকেও তারা ছিল। বিপ্লব আর ভালবাসাতে যে কোনো ঝগড়া নেই, সুপার্থ যখন বলছে, তাদের কারো কানে কথাগুলো ফালতু ঠেকেছিল। হাসপাতাল থেকে পালানোর তৈরি ছক না মেনে, সুপার্থ কেন পায়খানার জানলা ভেঙে পালাতে গেল, তারপর নির্ধারিত ডেরায় না গিয়ে অন্য

ঠিকানায় উঠল এবং কারো সঙ্গে পরামর্শ না করে জয়াদের বাড়িতে হাজির হল. ইত্যাদি প্রশ্ন করে যারা সুপার্থকে কোণঠাসা করতে চাইছিল, তাদের তৈরি বিসম্বাদের আগুন সুপার্থর একটা কথাতে দপ করে নিভে গিয়েছিল। সুপার্থ বলেছিল, পরশু আমি গ্রামে চলে যাচ্ছি। এ জন্মের মত এই যাওয়া। মুক্তির লড়াইতে জিতলে আমার জন্মান্তর ঘটবে। তখন আপনাদের মধ্যে আবার ফিরে আসব। জয়াও যাবে কয়েকদিন পরে। দল তাই চায়। আপনাদের কেউ কি আমার সঙ্গী হবেন?

প্রশ্ন যে তুলেছিল, তার কথা আটকে গেল। তাকে যারা তাতিয়েছিল, তাদের কেউ সাড়া দিল না। পাতা খসার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। বৈঠকের একজন, সুপার্থর অনুগামী সত্যমাস্টার বলল, আমি যাব সুপার্থর সঙ্গে।

সাবাস!

সুপার্থ হাত তুলে তাকে প্রেরণা জোগাল। মাঝবয়সী জটু রায়, ত্রিশ বছর ধরে যে বাম রাজনীতি করছে বলে দাবি করে, জিজ্ঞেস করল, রাজ্যপাট ছেড়ে তোমরা সবাই বনবাসে গিয়ে করবে কী? যাচ্ছ কবে?

তার বাঁকা গলার প্রশ্নের ভেতরে হুল ফোটানোর মত শ্লেষ লুকোনো থাকলেও, সুপার্থ পাত্তা দিল না। বলল, আমি যাচ্ছি পরশু, সোমবার। সত্যমাস্টার কবে যাচ্ছে, তার সঙ্গে কথা বলে ঠিক করে নেব। আদিবাসী এলাকায় আমি যাচ্ছি। সেখানেই থাকব, তারা যা খায়, খাব, মাঠে কাজ করব তাদের সঙ্গে। তারপর আস্তে আস্তে তাদের মধ্যে শুরু করব রাজনীতি প্রচার। শুরু হবে তাদের রাজনৈতিক শিক্ষা। আমাকে খাটতে হবে প্রচণ্ড। একাধারে নিজের পেট চালানোর জন্য শারীরিক খাটুনি এবং সেই সঙ্গে, সেই খাটুনির দ্বিগুণ, চারগুণ মানসিক খাটুনি। আমি পারব কি? কী জানি। পারতে আমাকে হবেই। জেল যদি ভাঙতে পারি, কয়েদ করে রাখার ব্যবস্থাটা ভাঙতে পারব না কেন? গাঁয়ের গরিব চাষিভাইদের ক্লাস নেওয়ার মত উপযুক্ত করে তুলতে হবে নিজেকে এবং এরই সঙ্গে সমান তালে চলবে আমার কবিতা লেখা, সাহিত্যসাধনা। ওটা বাদ দিলে চলবে না, ওখানে আমার স্বপ্নের রাজপুরী, আমার বিপ্লব, কবিতা, ভালবাসা।

কয়েক মাইল ব্যাপ্ত আমবাগান জুড়ে ছায়া নামার সঙ্গে ডাকতে শুরু করেছিল নানা পোকামাকড়। সেই শব্দপুঞ্জের গভীর থেকে জেগে উঠছিল সুপার্থর গলা। সে বলছিল, এই যে নতুন জীবনের দিকে যাচ্ছি, জানি না সেখানে জিততে পারব কিনা, তবে এটুকু জেনে গেছি, 'জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা'।

মনের গভীর থেকে চলকে ওঠা আনন্দে সুপার্থ যেন নিজের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছিল, যা বিপ্লব, কবিতা, ভালবাসা বিজড়িত এক সুপ্রাচীন, বিখ্যাত গল্প, এক প্রেমিকের আত্মকথন! বৈঠকে হাজির যারা, বুঝতে পারছিল না সুপার্থর সব কথা।

তারা ভাবছিল গোঁদলপাড়ার মেয়েন্যাকড়া, ছিটিয়াল ছেলেটার পাগল হতে দেরি নেই। হয়তো এর মধ্যে হয়ে গেছে। কিন্তু তার কথার ভেতরে কবিতার মত বাজতে থাকা আবেগ আর প্রত্যয়, সুপার্থর সঙ্গে তাদের খুনসুটি করার বাসনা ভোঁতা করে দিয়েছিল। তারা যেন টের পেয়েছিল, তাদের চেয়ে সুপার্থ হাজার মাইল এগিয়ে রয়েছে। মন্ত্রের সাধন অথবা মৃত্যুর আগে সে থামবে না। তার অনেক কিছু করা সাজে, যা অন্যকে মানায় না। সুতরাং হাসপাতাল থেকে সদর দরজার বদলে, পায়খানার জানলা ভেঙে তার পালানো নিয়ে যারা কৈফিয়ত চাইছিল, তারা চুপ করে গেল। তার মধ্যে বহুদিনের বামপন্থী, হুগলির বিপ্লবী নেতা প্রিয়তোষ করকে সুপার্থ বলল, আমার ভাগনি, মিমি ক্লাস নাইনে উঠেছে। পাঠ্য কয়েকটা বই তাকে জোগাড় করে না দিলে তার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবে। স্কুলে নতুন ক্লাস তো তিন মাস শুরু হয়ে গেছে। মুশকিল হয়েছে সেখানে। মিমিকে আপনার ভাইঝি মৌলি যে বইগুলো দিয়েছিল, মাধ্যমিকে ফেল করার পরে মৌলি সব ফেরত নিয়ে গেছে। মাধ্যমিক পরীক্ষায় আবার বসতে হলে বইগুলো মৌলির দরকার।

মৌলি যে প্রিয়তোষের দাদার মেয়ে, সবাই জানলেও মাধ্যমিকে তার ফেল করার খবরটা সম্ভবত পাঁচকান হয়নি। সুপার্থকে বাড়তি কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে প্রিয়তোষ বলল, মিমির লেখাপড়া যাতে আটকে না যায়, তার জন্যে যা করার করব।

প্রিয়তোষকে বিব্রত করতে তার ভাইঝির মাধ্যমিক ফেলের কথাটা যে সুপার্থ বলেনি, সবাই বুঝলেও প্রিয়তোষ গম্ভীর হয়ে গেল। সে কথা বাড়াল না। তার আশ্বাসে খুশি হয়ে সুপার্থ বলল, বাঁচা গেল, প্রিয়দা দায়িত্ব নিলে আমার চিন্তা নেই। গাঁয়ে যাওয়ার আগে মিমিকে খবরটা জানিয়ে দেব।

বৈঠকের মাঝখানে জিয়াদ এসে সুপার্থর কানে ফিসফিস করে কিছু বলে, আমবাগানের অন্ধকারে তখনই মিলিয়ে গেল। সুপার্থ গাঁয়ে যাওয়ার কথা বললেও কোথায় যাচ্ছে, বৈঠকে জানাল না। গোপন দলে এটাই নিয়ম। যারা জানে, তাদের কেউ যেমন মুখ খুলল না, যাদের অজানা, তাদের একজনও জানতে চাইল না, কোন অঞ্চলে সুপার্থ যাচ্ছে। আনোয়ার চলে যাওয়ার মিনিটখানেক পরে সুপার্থ বলল, আনোয়ার এখনই খালি করে দিতে বলল এ জায়গা। পদ্মপুকুরের দক্ষিণ-পশ্চিমে সাদা পোশাকের পুলিস ঘোরাঘুরি করছে। আমবাগানে চিরুনি তল্লাশির আগে এলাকায় নজরদারি বসিয়ে দিয়েছে। এর পরে রাত একটু বাড়লে সার্চলাইট নিয়ে আমবাগান ঘেরাও করবে।

খবর শুনে আমবাগানে সকলে উঠে দাঁড়ালেও সুপার্থ বসে থাকল। প্রিয়তোষ দাঁড়াল না। স্থির হয়ে বসে আছে সত্যমাস্টার, তার পাশে জয়া। ম্যালেরিয়ায় মাসখানেক ধরে শয্যাশায়ী যে জয়া আজ সকাল পর্যন্ত উঠে দাঁড়াতে পারছিল

না, সুপার্থকে দেখে এতটা চাঙ্গা হয়ে যাবে, সে নিজেও ভাবেনি। জিয়াদের খবর মিলে গেলে, পদ্মপুকুরের ধারের যে রাস্তা দিয়ে আমবাগানে এসেছে, সে পথে এখন যাওয়া যাবে না। উলটো রাস্তায় অনেকটা ঘুরে বাড়িতে ঢুকতে হবে। সবাইকে আলাদা করে ডেকে বাগানের কোন দিক দিয়ে কে বেরোবে, জানিয়ে সত্যমাস্টার বলল, প্রত্যেকে একা যাবে। কোনোমতে দুজনে একসঙ্গে নয়।

আমবাগানের বৈঠকে যারা এসেছিল, উত্তর-পশ্চিমের রাস্তা কম বেশি সকলে চেনে। অনেক বৈঠক তারা করেছে এখানে। বাড়িও তাদের কাছাকাছি এলাকায়। স্কুলে পড়ার দিনগুলোতে ব্যাপারির কাছে জমা দেওয়া এই বাগানে বৈশাখ, জষ্ঠি মাসে আমচুরি করতে আসেনি, এমন ছেলে এ চত্বরে নেই বললে, মিথ্যে বলা হয় না।

মাস্টারকে সুপার্থ তাড়া দিল, এবার আপনি উঠুন।

জয়া কীভাবে যাবে?

মাস্টার প্রশ্ন করতে সুপার্থ বলল, আমি পৌঁছে দেব।

জয়া বলল, আমাকে কারো পৌঁছোনোর দরকার নেই, একাই যেতে পারব।

তা জানি। আসলে আমি যেতে চাই তোমার সঙ্গে।

তার আঁতের কথাটা সুপার্থ টের পেয়েছে বুঝে, জয়া মুচকি হাসল। সুপার্থর সঙ্গে জয়া, অথবা জয়ার সঙ্গে সুপার্থকে রওনা করানোর জন্যে মাস্টার অপেক্ষা করছে দেখে, সুপার্থ বলল, সত্যদা আপনি এগোন। দু'মিনিটের মধ্যে আমরা রওনা হব।

দ্বিতীয় প্রশ্ন না করে পশ্চিমমুখো পায়ে চলা পথ ধরে মাস্টার এমন সন্তর্পণে হাঁটতে শুরু করল, যে তার পায়ের আওয়াজ পর্যন্ত শোনা গেল না। অন্ধকার আমবাগানে সত্যমাস্টারের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে জয়া পাশ ফিরে সুপার্থকে দেখতে পেল না। চমকে গেলেও গলা তুলে ডাকল না সুপার্থকে। জেল ভেঙে পালিয়ে আসা সুপার্থ যে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মৃত্যুর সঙ্গে চোরপুলিস খেলতে পারে, জয়া জেনে গেছে। চাপা গলায় সে প্রশ্ন করল, তুমি কোথায়?

ঘাসের আগা থেকে উঠে আসা অন্ধকার বনস্থলী গড়িয়ে গাংফড়িংয়ের ডানা ঝাড়ার শব্দের মত জয়ার প্রশ্ন বিশ্বচরাচরে আনত হয়ে যখন জবাব খুঁজে বেড়াচ্ছে, বাগানরক্ষীদের ঘরের পাশ থেকে ফিসফিস করে সুপার্থ বলল, দু'মিনিট। পোশাকটা বদলে নিচ্ছি।

সুপার্থর গলা শুনে আশ্বস্ত হলেও, তার হঠাৎ পোশাক বদলানোর দরকার কেন পড়ল, বদল করার পোশাক পেল কোথায়, জয়া ভেবে পেল না। পাহারাদারির ঘরের দিকে না তাকিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সে ভাবতে লাগল, পুরোপুরি সুস্থ হয়ে কবে সে গ্রামে গিয়ে পৌঁছোবে? জেল ভেঙে পালিয়ে সুপার্থ আজ দুপুরে তার খাটের পাশে এসে দাঁড়াতে পারে, সে কল্পনা করেনি। সুপার্থকে দেখে তার

অর্ধেক রোগ সেরে গেছে। তবু সে জানে, লম্বা পা ফেলে হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে। দূরের কোনো জিনিসে চোখ রাখলে মাথা ঘুরছে। সম্পূর্ণ সেরে উঠতে আরো কয়েকদিন লাগবে। ঠিক কতদিন সে জানে না। গ্রামে গিয়ে কাজ করার সংকল্পে তাকে জড়িয়ে ফেলেছে সুপার্থ। কৃষক পরিবারের মেয়ে-বউদের নিয়ে সংগঠন গড়তে হবে। এলাকা ছেড়ে পাকাপাকিভাবে গাঁয়ে চলে যাওয়ার আগে সুপার্থ নিশ্চয় জানতে চাইবে, জয়া কবে রওনা হচ্ছে।

পোশাক বদল করে যে সুপার্থ ফিরে এল, তাকে দেখে সেই অন্ধকারে প্রথমে জয়ার বুক ভয়ে ধড়াস করে উঠলেও মানুষটাকে চিনতে তার অসুবিধেও হয়নি। সুপার্থ হাসছিল জয়ার দিকে তাকিয়ে। লম্বা ছিপছিপে শরীর, মুখভর্তি দাড়ি গোঁফ, সুপার্থকে দেখলে এখন তরুণ সন্ন্যাসী ছাড়া আর কিছু ভাবা সম্ভব নয়। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিল তার রক্তবর্ণের পোশাক, ধুতি, ফতুয়া, মাথায় জড়ানোর চাদর পর্যন্ত লাল। সুপার্থ বলল, তোমাদের বাড়ি থেকে দুপুরে যখন বিশুদের বাড়িতে গেলাম, তখনই মাথায় এই বুদ্ধিটা খেলেছিল। বিশুকে বললাম কী করতে হবে তাকে। সাইকেল চেপে সে চটপট আমাদের গোঁদলপাড়ার বাড়ি থেকে বাবার এক দফা পোশাক, রক্তবর্ণ ধুতি, চাদর নিয়ে ফিরে এল। বাড়িতে তখন বাবা ছিল না। গোঁদলপাড়ার কাছাকাছি কোথাও আমি এসেছি শুনে, আমাকে একবার দেখতে মা এমন অস্থির হয়ে পড়ল যে তাকে শান্ত করতে বিশু আলটপকা বলে দিল, আপনার ছেলে রাতের যে কোনো সময়ে এখানে এসে একবার দেখা করে যাবে।

তুমি যাবে নাকি?

জয়ার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সুপার্থ বলল, এখন যাব গজঘণ্টায়, দিদির বাড়ি। আমাকে দেখে নিশ্চয় ভড়কে যাবে তারা। ভয় পেলেও বাড়িতে ঢুকতে দেবে। ক্লাস নাইনের পড়ার বইগুলো হাতে নিয়ে যেতে পারলে, মিমি খুশি হত। তোমার কি মনে হয় প্রিয়তোষদা বইগুলো জোগাড় করে দেবে?

প্রিয়তোষদা না পারলে, আমি জোগাড় করে গজঘণ্টার বাড়িতে তোমার ভাগনিকে পৌঁছে দেব।

উল্টোপথে যাওয়ার জন্যে অন্ধকার আমবাগানের গভীরে সেঁধিয়ে যাচ্ছিল তারা। জয়াকে বাড়ি ফিরতে বাড়তি এক কিলোমিটার হাঁটতে হবে। বাড়ি ফেরার তাড়া তার নেই। শরীর বেজুত হয়ে রয়েছে, হাঁটতে গিয়ে টের পাচ্ছিল। সুপার্থ নিচু গলায় বলল, বৈঠকে একটা বেআক্কেলে কাজ করে ফেললাম।

জয়া চুপ। সুপার্থ বলল, তোমার গ্রামে যাওয়ার কথাটা আমার আগ বাড়িয়ে বলা ঠিক হয়নি।

ভুলও হয়নি। দুপুরেই বলেছিলাম, গাঁয়ে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়ে আছি।

জয়া কথাটা বলতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সুপার্থ বলল, বাঁচলাম। জেলে বসে খবর পেয়েছিলাম, তুমি অসুস্থ। এখনো পুরো চাঙ্গা নয়, দুপুরে তোমাকে প্রথম দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম। সাত তাড়াতাড়ি গাঁয়ে তোমার যাওয়ার দরকার নেই। আমি যেখানে যাচ্ছি, তার আশপাশের গ্রামে তোমার থাকার ব্যবস্থা করে আমিই খবর পাঠাব। তোমার শরীর আশা করি ততদিনে সেরে উঠবে।

আমবাগানের পুব দিকে দুজন প্রায় পৌঁছে গিয়েছিল। অল্প দূরে লোকালয়, আলো দেখা যাচ্ছে। জয়া বলল, সাবধানে থেকো। দুপুরে রেডিয়োর খবরে হাসপাতাল থেকে তোমার পালানোর বিবরণ শোনানো হয়েছে। সাসপেন্ড হয়ে গেছে জেলের এক জমাদার সমেত দুজন পুলিসকর্মী।

ছোটো করে ঢোঁক গিলে জয়া বলল, তোমার খবর পেতে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

তাই?

হ্যাঁ।

শুনে খুশি হলাম। কিছু 'ফোটো' তুলিয়ে রাখতে হবে। বেঘোরে মারা পড়লে শহিদের ছবি যদি দু-একটা পাওয়া যায়!

সুপার্থর কথাটা শুনতে ভাল না লাগলেও জয়া মুখ খুলল না। রাতে অনেকক্ষণ যে কথাটা জ্বালাবে, ঘুমোতে দেবে না, অনুভব করল।

আমবাগান থেকে বেরিয়ে আসার আগে আলাদা হয়ে গেল দু'জন। সুপার্থ গেল লোকালয়ের বাইরে মেঠো পথে, জয়া এগোল পাকা রাস্তার দিকে।

দশ

অনন্ত স্মৃতির নক্ষত্রখচিত কুয়াশার মধ্যে পথ-পরিক্রমা কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে, জয়া বুঝতে পারছে না। সবটা বোঝার চেষ্টা সে করল না। অনুভব করল, পঁয়ত্রিশ বছর আগের ঘটনাগুলো এবং সেই সময়ের এক অনবগুণ্ঠিত কিশোরী, নানা কারণে দুর্বোধ্য থেকে গেছে। মানুষ বুঝতে পারেনি মানুষকে, নিজেকে আর নিজের সময়েকে। পুরোটা বোঝার মত মেধা যেমন তার ছিল না, সাহসও ছিল না। অনেক কথা, যা তখন বলা উচিত ছিল, বলতে পারেনি। বুকের মধ্যে অনুভূত সত্যকে বেনোজলে ভাসিয়ে দিয়ে অন্তরাত্মা যখন আক্ষেপে পুড়েছে, তখনো বানানো কিছু কথা পাখিপড়ার মত আবৃত্তি করে গেছে। নিজেকে প্রতারণা করার ঢেউ যে পাশের

মানুষটার গায়ে, সময়ের শরীরে লাগছে, সব কিছু মিথ্যে করে দিচ্ছে, এ সত্য উপলব্ধি করার মত মগজের জোর তখন ছিল না। মগজটা শরীরের ঠিক কোথায় থাকে, জানত না, জানার চেষ্টা করেনি। হৃদয়সর্বস্ব প্রাণী ছিল সে। হৃদয়কে ভাবত মগজ। জীবনের মানে ভুলে গিয়ে মৃত্যুহীন, জন্মহীন, চিহ্নহীন কুয়াশার মধ্যে পদচারণা করে প্রাণালোকযাত্রীদের কাছে পৌঁছোতে চেয়েছিল। নিজেকে ফাঁকি দিতে গিয়ে অন্যের ফাঁকির জালে যেমন আটকে গিয়েছিল, তেমনি মহাশূন্যে মিশিয়ে দিয়েছিল ঘড়ির কাঁটাতে বাঁধা সময় আর অমোঘ কালচেতনাকে। আজো কি চিনেছে নিজেকে, উপলব্ধি করতে পেরেছে সেই সত্য, যার খোঁজ চল্লিশ বছর ধরে করে চলেছে? সত্য বলে কি কিছু আছে? সবরকম সত্যকে এখন বানানো মনে হয়। মহাসময় যেমন সত্য, তেমনি মুহূর্ত কম সত্য নয়। আমৃত্যু সত্যমিথ্যের সংজ্ঞা নিয়ে ধাঁধা খেয়ে থাকাই সম্ভবত চরম সত্য। প্রকৃতির নিয়মের বাইরে আর কোথাও সত্য নেই।

শোয়ার ঘরের দরজা খুলে বাইরে এসে প্রভাত কলঘরে ঢুকেছে, ছিটকিনির খুটখাট আওয়াজ, আলগোছ পায়ের শব্দ শুনে জয়া বুঝতে পারল। কলঘরে যে ঢুকল, সেখান থেকে বেরিয়ে সে শুতে গেল কিনা, খেয়াল করার আগেই সে পুনর্বার ভেসে গেল মৃত্যুহীন, জন্মহীন পঁয়ত্রিশ বছর আগের তরল কুয়াশার স্রোতে। আমবাগান থেকে বেরিয়ে সেই সন্ধেতে সুপার্থ প্রথমে গিয়েছিল গজঘণ্টায় তার দিদির বাড়িতে। জেলা সদর হাসপাতাল থেকে চরমপন্থী বন্দি, রাজনৈতিক কর্মী, সুপার্থর পালানোর খবর, তখন গোটা জেলা এমনকী রাজ্যের মানুষ জেনে গেছে। পাঁচ হাজার টাকা ঘোষিত হয়েছে তার মাথার দাম। ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, চন্দননগর, মগরা, হুগলি থেকে শ্রীরামপুর, বালি পর্যন্ত পাড়ার রোয়াকে, চা-দোকানে, যারা তাকে চেনে, আর যারা চেনে না, চাপা গলায় তার জেল পালানো নিয়ে সম্ভব, অসম্ভব গল্প রচনা শুরু করে দিয়েছে। সুপার্থর ষোলো ভাইবোনের মধ্যে যে চারজন বেঁচেছিল, তাদের মধ্যে দুই বিবাহিত দিদির একজন থাকত মগরার কাছাকাছি গজঘণ্টাতে, আর একজনের শ্বশুরবাড়ি ছিল দমদমে। আমবাগান থেকে বেরিয়ে শহরের নির্জনতম পথ ধরে সুপার্থ গিয়ে উঠেছিল দিদির বাড়িতে। দুকিলোমিটার রাস্তা পেরোতে কয়েক ঘণ্টা লেগেছিল। রাত বারোটার পর, গোটা পাড়া যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, সুপার্থ এসে দাঁড়িয়েছিল দিদির বাড়ির বন্ধ সদর দরজার সামনে। বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে অনুমান করলেও দূর থেকে ঘরে আলো জ্বলতে দেখে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। দিদিকে জাগাতে বেশি হাঁকডাক করতে হয়নি। বন্ধ দরজায় খুটখুট শব্দ হতে দরজা না খুলে ঘরের ভেতর থেকে দিদি জিজ্ঞেস করল, কে?

বাইরে থেকে কেউ সাড়া দিল না। কিছুক্ষণ আগে বাড়িসুদ্ধ সবাই, রাতের 'শো'তে সিনেমা দেখে ত্রিবেণী থেকে ফিরেছে। কারো খাওয়া হয়নি। পোশাক

পাল্টে খেতে বসার আগের মুহূর্তে দরজায় টোকা পড়তে দিদি ভাবল, বোধহয় শম্ভু এসেছে। তার ছেলের বন্ধু, শম্ভু থাকত সামনের দুটো বাড়ি ছেড়ে, পরের বাড়িটায়। দিদির ধারণা হয়েছিল, দরজার বাইরে শম্ভু দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির সকলে, স্বামী, ছেলে, মেয়ে সকলে তখন জেগে, নির্ভয়ে দরজা খুলে দিয়ে বিটকেল লাল পোশাক জড়ানো এক সাধুকে দেখে ভয়ে আঁতকে উঠেছিল দিদি। মুখ দিয়ে হয়তো আওয়াজও করেছিল। হা হা করে হেসে সুপার্থ জানিয়ে দিয়েছিল নিজের আত্মপরিচয়, বলেছিল, আমি ভূত নয় রে, তোর ছোটোভাই, চিমটি কেটে দ্যাখ। তারপর ফিসফিস করে বলেছিল, আমাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারলে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার পাবি। তোর সংসারের অভাব মিটে যাবে। ডাকবি নাকি পুলিস?

সকাল এগারোটায়, পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে সদর হাসপাতাল থেকে যে পালিয়েছে, যাকে ধরতে সারা জেলা তন্নতন্ন করে পুলিশ খুঁজছে, রাত বারোটায় সেই ছোটোভাই, কাপালিক সেজে দরজায় এসে দাঁড়াবে, দিদি ভাবতে পারেনি। ভয়ে সত্যি সে বেহুঁশ হয়ে যেতে পারত। তেমন যে ঘটেনি, তার একটা কারণ সুপার্থব গায়ের রং পোশাক দুটোই তার চেনা। এই বেশে তার বাবা প্রায়ই এখানে আসে। বাবার পোশাক গায়ে চাপিয়ে ছোটোভাই হাজির হয়েছে বুঝে গিয়ে বলল, আয়, ভেতরে আয়। ভাইবোনের কথার মাঝখানে বাড়ির সকলে, এমনকী দিদির শাশুড়িও ঘিরে দাঁড়িয়েছিল তাকে। শাশুড়ির পেছনে সুপার্থর জামাইবাবু। মুখ চোখে উদ্বেগ থাকলেও বিরক্তি ছিল না। সদর দরজা বন্ধ করে দিদি খিল তুলে দিয়েছিল। ডাল, আলুভাতে, বড়িপোস্তর তরকারি দিয়ে এক থালা ভাত খেয়ে আরামে ঢেঁকুর তুলে মিমিকে সুপার্থ যখন বলছে, তার স্কুলের যাবতীয় বই জয়া দিয়ে যাবে, তখনই তার কাঁধে হাত রেখে দিদি বলেছিল, নতুন একজন মানুষ দেখাব তোকে।

ভাইকে হাত ধবে ঘরের মধ্যে এনে বিছানার মশারি তুলে দিদি বলল, দেখ, তোর ভাগনা হয়েছে।

কতদিন?

দেড় মাস চলছে।

মানে, আমি তখন জেলে ঢুকে গেছি। এ ছেলে ঠিক আমার মত হবে।

দেড় মাসের ভাগনেকে নিয়ে কথা বলার সময়ে সুপার্থ হাসছিল। খুশিতে ঝলমল করছিল তার মুখ। জামাইবাবু বলেছিল, যতদিন খুশি এখানে থাকো। পুলিসের নজর এড়িয়ে সাবধানে থাকতে হবে।

জামাইবাবুকে সে বলেছিল, আজ আর কাল, দুটো রাত থাকব। পরশু পালাব।

কোথায়?

দিদির প্রশ্ন শুনে সে বলেছিল, তিমিরহননে।

দিদিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলেছিল, গাঁয়ে যাব, চাষ করতে। অনেক চাষাবাদ বাকি রয়েছে।

দিদি আর প্রশ্ন করেনি। তাকে জামাইবাবু বলেছিল, ভাইকে বিছানা পেতে দাও, রাত কম হয়নি।

সুপার্থ ঘুমোয়নি। দিদিকে বাইরের ঘরে বিছানা পেতে রাখতে বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। ফিসফিস করে বলেছিল, মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। কেঁদেকেটে মা আটকে না দিলে মাঝরাতে ফিরব। না হলে, কাল অন্ধকার একটু ঘন হলে এসে যাব। মনে হয় মা আটকাবে না।

দিদির বাড়ি থেকে রাত একটায় বেরিয়ে গোঁদলপাড়ার বাড়িতে সুপার্থ গেল মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। অন্ধকার বাড়ি। কেরোসিনের অভাবে জ্বালানোর মত কোনো হারিকেন, কুপি, এমনকী একটুকরো মোমবাতিও বাড়িতে ছিল না। ঘুম থেকে সদ্য জেগে উঠে অন্ধকার ঘরে সুপার্থর মাথা, গলা, বুক, পিঠে হ্যাঁচোর প্যাঁচোর করে হাত বুলিয়ে গর্ভধারিণী মা যখন ছেলেকে দেখার চেষ্টা করছে, তখনই ফস করে একটা দেশলাই কাঠি জ্বলে ওঠার সঙ্গে চাপা গম্ভীর গলায় তার বাবা বলেছিল. আমার দেশলাই বাক্সে থাকল আর চারটে কাঠি।

কথাটা বলে ছেলের মুখের সামনে জ্বলন্ত কাঠিটা এনে স্ত্রীকে বলেছিল, দ্যাখো. ছেলের মুখ দেখে নাও। পাঁচ মিনিট বাদে আর একটা কাঠি জ্বালব। তারপরেও দেশলাই বাক্সে তিনটে কাঠি থাকবে।

মানুষটার কথার মধ্যেই জ্বলন্ত দেশলাই কাঠির পরমায়ু শেষ হয়ে যেতে নিস্তব্ধ শৃঙ্খলায় হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল অন্ধকার। তেজেশের কথা তখনো থামেনি। সে বলেছিল, পেটের ছেলেকে চিনতে আলোর দরকার হয় না! তবে হ্যাঁ, কাঠিটা না জ্বাললে এই সন্ন্যাসীকে দেখতে পেতাম না।

লম্বা একটা শ্বাস ফেলে বলল, মানিয়েছে ভাল।

বুকভর্তি উদ্বেগ নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে বলেছিল, সদর দরজা আটকে রাস্তার ওপর নজর রাখছি। তেনারা এলে তারক মন্ত্রে আমার হুংকার শুনতে পাবি। তখনই বাগানের রাস্তা ধরে পালাবি। তোর খোঁজে আজ রাতে, হয়তো শেষরাতে তেনারা একবার আসবেন। বাতাসে তাদের গায়ের গন্ধ পাচ্ছি।

অন্ধকার ঘরের বাইরে গিয়ে গভীরতর অন্ধকার থেকে শেষ কথাটা, বাবা যখন বলল, দু'হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে, মায়ের নিবিড় স্নেহের সংস্পর্শে বসে, সুপার্থ টের পেল। মা জিজ্ঞেস করল, কী খাবি?

দিদির বাড়িতে খেয়ে নিয়েছি। তোমরা কী খেলে?

মায়ের কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে যা বোঝার সুপার্থ বুঝে গেল। অন্ধকারে মা-বাবাকে দেখতে না পেলেও জীবন্ত অনাহারকে দেখতে পেল। ঘরের ভেজানো দরজা সামান্য ফাঁক করে মাঝে মাঝে বাবা এসে বলছিল, তুই এবার যা। তেনারা

কখন এসে পড়বে, কে বলতে পারে!

শহরতলির জনমানবহীন পথ ধরে দিদির বাড়িতে ফিরে আসার সময়ে সুপার্থর বারবার মনে হচ্ছিল, মানচিত্রে আঁকা দেশের মুক্তির জন্যে রক্তমাংসের মা-বাবাকে চোখের সামনে উপোস করে মরতে দেখেও কোন বিপ্লবের খোঁজে বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে সে? বুড়ো মা-বাবাকে এভাবে ফেলে রেখে যাওয়া গর্হিত অপরাধ, অনুভব করে গ্লানিতে ভরে যাচ্ছিল তার বুক। হেডলাইটের চেনা আলো ছড়িয়ে দূর থেকে যে গাড়িটা আসছে, তার নজর এড়াতে ফরাসি আমলের এক জীর্ণ বাড়ির পাঁচিলের আড়ালে সে সরে গেল। দিদির বাড়ির সামনে যখন সে পৌঁছোল, গোটা পাড়া ঘুমে কাদা। দিদির বাড়ি অন্ধকার, নিস্তব্ধ। সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে এ চিন্তা মাথায় এলেও, পরক্ষণে ভাবল দিদি ঘুমোবে না। জেগে বসে থাকবে তার জন্যে। বাস্তবিক তাই, বন্ধ সদর দরজায় কান রেখে তার অপেক্ষায় দিদি বসেছিল। আটকানো কপাটে আলতো করে সুপার্থ দুটো টোকা দেওয়ার পরের মুহূর্তে দরজার একটা পাল্লা খুলে দিদি বলল, আয়।

দিদির বাড়ি ছেড়ে কবে, সুপার্থ গাংনেগড় চলে গেল, জয়া না জানলেও নিরাপদে গজঘন্টা ছেড়ে যাওয়ার খবর সে পেয়েছিল।

এগারো

সারাক্ষণের কর্মী হয়ে জয়াকে চিঠি লিখে গাংনেগড়ে নিয়ে আসার সাত দিন আগে কাজের এলাকা সরেজমিনে তাকে একবার ঘুরে দেখে যাওয়ার ডাক পাঠিয়েছিল সুপার্থ। জয়া গিয়েছিল। গাংনেগড়ের কিছু আগে হুমলোকুমলোর বিল (চাকলোর বিল বলে অনেকে), বিলের ধারে জঙ্গল, ঝোপঝাড়ে বোঝাই দেড়হাজার একর সরকারি 'ভেস্ট' জমি। গরিব কৃষকদের নিয়ে ভূমিসংস্কারের আন্দোলন শুরু করার আদর্শ জায়গা হল, হুমলোকুমলোর চর। কাছের একটা ঝোপের ধারে দুজন অচেনা মানুষের সঙ্গে বসে চাপা গলায় সুপার্থ কথা বলছিল। জয়াকে দেখে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে, একমুখ হাসি নিয়ে বলল, তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।

সুপার্থর সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়েছিল অচেনা মানুষ দুটো। তাদের দেখিয়ে সুপার্থ বলল, এ গণেশ, পুরো নাম গণেশ বাউরি।

পাশের জনের নাম বলল, আব্বাস। দুজনই আমাদের কমরেড, এলাকার নেতা।

জয়াকে দেখিয়ে বলল, এ হচ্ছে প্রীতি, প্রীতির কথা তো আগেই তোমাদের

বলেছি, এলাকার মেয়েদের নিয়ে সংগঠন গড়তে পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে প্রীতি গাংনেগড় চলে আসছে। ডেমরা গ্রামে কানাই মুর্মুর বাড়িতে প্রীতির থাকার ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে। কানাইদার মেজো মেয়ে উজানির স্কুলের বন্ধু সেজে এসে এখানে থেকে যাবে।

উজানি কবে ফিরছে বাড়িতে?

আব্বাসের প্রশ্নে সুপার্থ বলল, কানাইদার কাছ থেকে জেনে নেব। মনে হয়, পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে তার স্কুলে পুজোর ছুটি পড়ে যাবে। হোস্টেল খালি করে মেয়েরা ফিরে যাবে যে যার বাড়ি। উজানিও ফিরবে। বেনাদহের হাটে সে অপেক্ষা করবে প্রীতির জন্যে। হাটের ভেতরে সবচেয়ে ভিড় জায়গাটাতে উজানির সঙ্গে প্রীতিকে মিলিয়ে দিয়ে ছিরু চলে যাবে নিজের মত, প্রীতিকে নিয়ে গাঁয়ে ঢুকে উজানি বলবে, স্কুলের বন্ধু। সামনে তার দিদির বিয়ে শুনে নেমন্তন্ন খেতে এসেছে। কানাইদার সংসারে জায়গা করে নেবে প্রীতি।

কথা বলার সময়ে মাঝে মাঝে জয়ার চোখে চোখ রেখে সুপার্থ মিটিমিটি হাসছিল। জয়া বুঝতে পারছিল, তাকে আরো একটু বাজিয়ে দেখতে, ভেবে নেওয়ার মত পাঁচ-সাত দিন সময় দিতে সুপার্থ ডেকে এনেছে। তার নাম হয়ে গেছে প্রীতি। গাংনেগড়ে সে আসার পরে সকলে জানবে তার নাম প্রীতি। জয়া নামটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভুলে যেতে হবে। মুখ ফসকে কখনো নিজেকে জয়া বলে ফেললে বিপদ হবে। জয়া যখন এত সব ভাবছে, সুপার্থ বলল, হুমলো-কুমলোর ধারে জঙ্গলের ভেতরে আমরা কয়েকজন রোজ সকালে তিরধনুক, চালানো 'প্র্যাক্‌টিস্' করি। পাখি মারি না। মাঠের মাঝখানে একটা কাকতাড়ুয়া খাড়া করে তির দিয়ে তার কলজে ফুটোর চেষ্টা করি। গত দিনে আমার ছোঁড়া একটা তিরও ছুঁতে পারেনি কাকতাড়ুয়ার শরীর। তবু হাল ছাড়িনি। রোজ সকালে দু-তিন ঘণ্টা 'প্র্যাকটিস' করছি, আর কবিতার জন্যে সিংহের নখের মত ধারালো শব্দ খুঁজে চলেছি। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে পাকা তিরন্দাজ আফতাব। যে কোনো লক্ষ্য সে ভেদ করতে পারে। গণেশ আর চাকান টুডুও কম যায় না। তাদের সঙ্গে টেক্কা দিতে আরো ছ'মাস কসরত করতে হবে আমাকে। শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে তাদের সমান ঘৃণা আমার মনে না জমলে তির মেরে কাকতাড়ুয়ার কলজে আমি ফুটো করতে পারব না। প্রবল শ্রেণীঘৃণা মনে না জাগলে বিপ্লবী হওয়া যায় না।

কথার মধ্যে সুপার্থর পাশাপাশি জয়া হেঁটে যাচ্ছিল। তাদের পেছনে আব্বাস। মাঠের কাজে চলে গেছে গণেশ। ছিরু গেছে ঘরে পান্তা খেতে। নতুন বিয়ে করা কচি বউ আছে তার ঘরে। সুপার্থর কথা থেকে জয়া জানতে পারল, ছিরুর বউ-এর নাম ময়না। সুপার্থ বলল, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ময়নাকে একবার না দেখলে ছিরুর হাঁফ ধরে।

কথাটা বলে হাহা করে হাসার মধ্যেও কিছুটা অনামনস্ক দেখাল সুপার্থকে। পায়ে-চলা রাস্তার শেষে ডাঙা জমির ওপর একটা পাকা বাড়ি। বাড়িটা বেশ বড়োসড়ো। বাড়ির সামনে, পেছনে খামারে তিন-চারটে ধানের গোলা রয়েছে। টিনের চাল লাগানো মাটির মস্ত গোলা। সবচেয়ে বড়ো গোলার ভেতরে বাঁশের তৈরি মাচানে সুপার্থ থাকে। গোলার মাথার কাছে মাচার ছোট দরজা দিয়ে গুঁড়ি মেরে মানুষ ভেতরে ঢুকতে পারে। দরজা পর্যন্ত পৌঁছোতে একটা মই খাড়া করা রয়েছে। বুকের ভেতরে ধুকপুকুনি বেড়ে গেলেও মই বেয়ে গোলার টং-এ দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছোল জয়া। তাকে আগলাতে তার দুধাপ নীচে দুহাত বাড়িয়ে সুপার্থ দাঁড়িয়ে রয়েছে। এক চিলতে দরজা দিয়ে ভেতরে নজর করে জয়া দেখল, সেখানে ধানের পাহাড়, গোলার বারো আনা সোনালি ধানে ভরে রয়েছে। নিচু গলায় সুপার্থ বলল, যার গোলা, তার নাম মুরারি ঘোষ। তার বাড়িতে আমি মুনিষ খাটি। রাতে গোলা আগলাই, দিনে মাঠে কাজ করি। কাজটা আমাকে জুটিয়ে দিয়েছে গণেশদা। বাউরি সম্প্রদায়ের লোক হলেও এই ডেমরা গাঁয়ে গণেশদার বেজায় হেঁকড়। জোতদার মুরারি ঘোষ পর্যন্ত গণেশকে সমঝে চলে। গণেশ সামনে এসে দাঁড়ালে কেমন চুপসে যায়।

কেন?

জয়া প্রশ্নটা করতে সুপার্থ বলল, সে অনেক গল্প। তুমি এখানে এলে বলব।

মুরারি ঘোষের খামারবাড়ি ছেড়ে জঙ্গলের পথ দিয়ে দুজনে ফের হেঁটে চলল গুমলোকুমলোর বিলের দিকে। তখনই জয়া শুনল, আমবাগান থেকে সেদিন সন্ধেতে বেরিয়ে গজঘণ্টায় দিদির বাড়িতে পৌঁছোনোর পর থেকে সুপার্থ কী করেছিল! বিপ্লবের প্রতি দায়বদ্ধ থাকার সঙ্গে নিরন্ন মা-বাবাকে দুবেলা ভাতের জোগান দেওয়া সম্ভব কিনা, এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। বিপ্লবী যুদ্ধে জয়ী হওয়ার পরে যদি শোনে দু'মুঠো ভাতের অভাবে মা বাবা শুকিয়ে মরেছে, তাহলে সে কী করবে? জয়াকে প্রশ্ন না করলেও সেই রাতের বিবরণ শোনাতে শুরু করে কথাগুলো সুপার্থ বলেছিল। জয়া শুনেছিল। চুপচাপ শুনে যাওয়া ছাড়া তার কিছু করার ছিল না।

আমবাগানে সেই সন্ধের পর থেকে সেও স্বস্তিতে নেই, জয়া বলেছিল। সেই রাতে এবং পরে আরো এক রাতে, সুপার্থর খোঁজে তাদের বাড়িতে চড়াও হয়েছিল পুলিস। বাড়ি লণ্ডভণ্ড করেছিল। চড়া গলায় তারা জানিয়েছিল, দুপুরে সুপার্থর এ বাড়িতে ঢোকার পাকা খবর পেয়ে তবেই তারা এসেছে। সুপার্থকে না পেলে বাড়িতে যে সব ছেলে মেয়ের বয়স, আঠারো থেকে ত্রিশ, তাদের সবাইকে ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরে দেবে। আখমাড়াই কলে পেশাই করে নিংড়ে নেওয়া হবে তাদের বিপ্লবীয়ানা। আরো অনেক কথা তারা বলেছিল। শিশ্ন কেটে নেওয়া,

যোনি ও পায়ু মন্থনের রক্তাক্ত আনন্দ উপভোগের বৃত্তান্ত এবং বিবিধ। কথাগুলো এত ভদ্র ভাষায় বলেনি। অকথা শব্দগুলো, হিমালয়ের চূড়োয়, মহাদেবের জটার ভেতর লুকিয়েও জয়ার পক্ষে উচ্চারণ করা সম্ভব নয়। কথাগুলো যে বলতে পারেনি সুপার্থকে। জয়া না বললেও তার মুখ দেখে যা বোঝার সুপার্থ বুঝেছিল। পরিস্থিতি যে দ্রুত ঘোরালো হচ্ছে, জয়াকে সে বলেছিল। জয়াও জানত। তার চোখের সামনে যা ঘটার, ঘটছিল। সংবাদপত্রও তো একটা চোখ। দলের সংবাদপত্র পড়ে জানতে পারছিল 'বিপ্লব' কোনো 'আপ্তবাক্য' নয়, হাতে-কলমে করে দেখাতে হয়। রাজ্য জুড়ে কৃষক-সংগ্রামের ঢেউ যত বাড়ছিল, কলকাতা সমেত অন্য শহরগুলো, রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে তেতে উঠছিল, তত বদলে যাচ্ছিল রাষ্ট্রীয় বলাৎকারের বাচন, বলাৎকার যারা চালায় তাদের মুখের ভাষা। বুলেট আর খিস্তি সমানভাবে মানুষের প্রাণ, সম্মানবোধকে ধরাশায়ী করছিল। সুপার্থর মতে, রাজ্যে যে দুটো যুক্তফ্রন্ট সরকার এল আর গেল, দুটোই গাড্ডু সরকার। কমিউনিস্টদের সামনে রেখে সাধারণ মানুষের সঙ্গে ফেরেব্বাজি করে তারা আগাম জানিয়ে গেল, বিপ্লবী বামপন্থা কত বড়ো দুর্দিনের মুখোমুখি হতে চলেছে। পাকা মাঝি না হলে এই ঘূর্ণি স্রোতে নৌকোর বেহাল হওয়া থেকে ভরাডুবি পর্যন্ত ঘটে যেতে পারে। দল আর দলীয় নেতাদের ওপর জয়াকে আস্থা রাখতে বলেছিল সুপার্থ। সুপার্থ যে খুব তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে, টের পেতে জয়ার অসুবিধে হল না। কবিতা লেখা কি সে ছেড়ে দিয়েছে? তার মজ্জায় ঢুকে গেছে রাজনীতি? হতে পারে। তখনই আব্বাস বলল, কমরেড, তোমার লেখা ওই কবিতাটা প্রীতিদিকে শুনিয়ে দাও।

সবটা লেখা হয়নি। অনেকগুলো লাইন বাকি রয়ে গেছে। সমাজবদলের দর্শনের সঙ্গে প্রথমে ভাবাদর্শগতভাবে, তারপর গুণগতভাবে কবিতাকে মেলানো দরকার। চেষ্টা করছি। সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

'কবিতা' শব্দটা শুনেই যে সুপার্থর বুকের মধ্যে আলোড়ন জেগেছে, দিগদিগন্ত জুড়ে ভালবাসার মেঘরোদ্দুর রেখা তার চোখে পড়ছে, জয়ার বুঝতে অসুবিধে হল না। সুপার্থ বলল, আমার যে কবিতাটা আব্বাস শোনাতে চায় তোমাকে, সেটা এখনো শেষ লাইন পর্যন্ত লিখে উঠতে না পারলেও মাঝখানের কয়েক পংক্তি মনে করতে পারছি। স্পষ্ট উচ্চারণে, থেমে থেমে, পৃথিবীর যাবতীয় মমতা কণ্ঠস্বরে আহ্বান করে, সুপার্থ বলতে থাকল,

'তবু বেঁচে থাকা কী আশ্চর্য সুন্দর
তবু বেঁচে থাকা মোহহীন সেই গান শুনে
রক্তের স্রোতে আগুনের নীচে সংগ্রাম।'

হুমলোকুমলোর বিলের ধারে, মাঝদুপুরের রোদ যেখানে কয়েকটা বিশাল

গাছের ডালপালা ছড়িয়ে ঘন ছায়ার ভাস্কর্য রচনা করেছে, সেখানে, সেই ছায়ার নীচে দাঁড়িয়ে জয়াকে সুপার্থ বলল, দ্যাখো, তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি, বলা দরকার।

মুচকি হেসে আব্বাস সরে যেতে জয়া জিজ্ঞেস করল, কী কথা? না, মানে, আমি তোমাকে ভালবাসি, বলা হয়নি। তুমি কি ভালবাসো?

বলব কেন?

৩বু বলো।

জয়ার দু'ঠোঁটের রেখায় যে হাসি চিকচিক করছে, তার অর্থ বুঝতে সুপার্থর অসুবিধে না হলেও আত্মকথনের ভঙ্গিতে সে বলছিল, ভালবাসা আমার কাছে স্বপ্ন। আমাকে কেউ কোনেদিন ভালবাসল না, একটি মেয়ের ভালবাসা যে কী, তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবু ভালবাসা বুকের মধ্যে বেজে ওঠে, ইচ্ছে করে ভালবাসা পেতে। মেয়েদের নি।ে চিরদিন স্বপ্ন-ই দেখে গেলাম, শুধু স্বপ্নই। যদিও অবজ্ঞা থেকে আমার সঙ্গে তুমি মেলামেশা শুরু করেছিলে, তবু তোমাকে নিয়ে নতুন করে আমি স্বপ্ন দেখা শুরু করেছি। নিদারুণ এই সময়ের চাপ, আগুন, আশা করি এই স্বপ্ন গিলে খাবে না!

জয়া বুঝতে পারছিল, ভালবাসার কথা বলতে শুরু করে কবিতায় ডুবে যাচ্ছে সুপার্থ। একাকার হয়ে যাচ্ছে তার বিপ্লবের সাধনা, কবিতা আর ভালবাসা। কোনো খাদ নেই এখানে। এ মানুষকে ফেরানো যায় না, সম্ভব নয় খালি হাতে ফেরানো।

জয়ার জবাবের অপেক্ষা না করে সুপার্থ বলল, তিরধনুক আজো এই আদিবাসী এলাকার প্রধান হাতিয়ার। তিরধনুক চালানো রোজ 'প্র্যাকটিস' করলেও বহুদিন কবিতা লিখতে পারছি না। মাঝে মাঝে কষ্ট সুতীব্র হয়ে ওঠে। না লিখতে পারার কষ্ট আমাকে দগ্ধায়। নতুন দিনের যে গান, যা পৃথিবীর গভীর পর্যন্ত চিরদিন উজ্জ্বল, তা আর বুকের মধ্যে বেজে ওঠে না। আমার মুক্তির ডাকের সুর এরকম যদি সরে যেতেই থাকে, আমার কথাগুলো কি কর্কশ হয়ে উঠবে না?

জয়া বলল, কর্কশ কথা তুমি বলতেই পারবে না কখনো। তোমার ভালবাসা আর বিপ্লব মিলে তোমার কবিতা। তোমার সঙ্গে অনেকদূর যেতে হবে আমাকে, আমি যাব।

সুপার্থর সঙ্গে সেই বিকেলে ছাড়াছাড়ি হওয়ার আগে মিমিকে তার পাঠ্য বইগুলো পৌঁছে দেওয়া হয়েছে. জয়া জানিয়েছিল। দুচোখে খুশির রুপোলি কণা ছড়িয়ে সুপার্থ বলেছিল, আমি জানতাম, তোমার কথার নড়চড় হবে না।

বারো

বেনাদহের হাটে উজানির সঙ্গে জয়াকে দেখা করিয়ে দিয়ে ছিরু চলে যাওয়া পর্যন্ত, তাদের সঙ্গে ছিল সুখলতা, জয়ার মা। উজানির সঙ্গে জয়ার যেমন পরিচয় হল, তেমনই আদিবাসী মেয়েটাকে দেখে খুশি হল সুখলতা। সতেরো, আঠারোর উজানি মগরার এক খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ে। থাকে, স্কুলের লাগোয়া ছাত্রীনিবাসে। মিশনারিদের কৃপায় বিনিপয়সার ছাত্রী সে। পড়া, থাকার খরচ, তাকে দিতে হয় না। জয়ার সঙ্গে তার বয়সের ঈষৎ হেরফের হলেও দুজনকে স্কুলে এক ক্লাসে পড়া বন্ধু হিসেবে চালিয়ে দেওয়া কিছু কঠিন নয়। বরং জয়ার চেয়ে বয়সে কম হলেও মাজা কালো রং, টানটান করে বাঁধা তেলচুকচুকে খোঁপা, পরনে লাল শাড়ি, ছাত্রীনিবাসে দু'বেলা নিয়মিত খেতে পাওয়া স্বাস্থ্যোজ্বল সুপুষ্ট শরীর, সাঁওতাল কন্যা উজানিকে দু-এক বছরের বড়ো মনে হতে পারে। কথায় কথায় খিলখিল করে উজানি হাসছিল। হাটের মানুষ কে তাকাচ্ছে, কে ফুট কাটছে, হাসির অভিঘাতে দাঁড়িয়ে পড়ছে, খেয়াল করার প্রয়োজন বোধ করেনি। জয়ার সঙ্গে পরিচয়ের শুরু করে 'প্রীতিদিদি, প্রীতিদিদি' করে এমন ডাকাডাকি শুরু করে দিল যে ডেমরা গ্রামে তাদের বাড়িতে সাতদিন না কাটতে, সে 'প্রীতি' বনে গিয়ে নিজের জয়া নামটা ভুলতে বসল। সুখলতাকে আগে থেকেই জয়া শুনিয়ে রেখেছিল সুপার্থর সঙ্গে হুমলোকুমলোর বিলের চরে তার দেখা হওয়ার বৃত্তান্ত, নাম পাল্টে সেখানে তাকে প্রীতি সেজে আদিবাসী এক খেতমজুর পরিবারে থাকতে হবে, গতরে খেটে নিজের পেট চালাতে হবে, এইসব টুকরো তথ্য। সুপার্থও মুনিষের কাজ করে অন্নসংস্থান করছে, শুনিয়েছিল। হুমলোকুমলোর বৃত্তান্ত শেষ করে কয়েক সেকেন্ড নিস্তব্ধ থেকে বলেছিল, তাকে নিয়ে সুপার্থর স্বপ্ন দেখার ঘটনা! ছিরুর হাতে পাঠানো সুপার্থর চিঠিতে তাই 'কাগজে মুড়ে একটু সিঁদুর এনো' লাইনটা পড়ে সুখলতা চমকে যায়নি। জয়া বিরক্ত হয়েছিল। কপাল কুঁচকে থাকা মেয়েকে দেখে সুখলতা বলেছিল, কবি হলেও সুপার্থ যে কাণ্ডজ্ঞানহীন নয়, চিঠি পড়ে বুঝলাম। হিন্দু ঘরের বিবাহিতা মেয়ের সিঁথিতে সিঁদুর না থাকলে শুধু দেশগাঁয়ের মানুষ কেন, শহুরে লোকও নাক সিঁটকোয়, সন্দেহ করে, ভাবে, স্ত্রী-পুরুষটি অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে আছে। অতিষ্ঠ করে তোলে তাদের জীবন। সুপার্থ বুদ্ধিমান। পরিস্থিতি সামলাতে এছাড়া তার উপায় ছিল না। কাঠের তৈরি নিজের পুরনো একটা সিঁদুর কৌটে সিঁদুরে ভরে, জয়ার থলিতে ঢুকিয়ে দিয়েছিল সুখলতা। বলেছিল, জীবনটা এরকম। অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যেতে হলে কিছু পথ গায়ে অন্ধকার মেখে যেতে হয়। অভিমানের জায়গা নেই এখানে। মায়ের ব্যাখ্যাতে জয়ার কপালের রেখা মসৃণ হয়েছিল, বিরক্তি কেটে গিয়ে হালকা হয়েছিল মন। উজানির সঙ্গে তার গাঁয়ের দিকে জয়া রওনা হওয়ার আগে শেষবারের মত মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে সাবধানে থাকতে

বলেছিল সুখলতা। দরকার পড়লে, শ্রীরামপুরে মাসির বাড়িতে চলে গিয়ে, সেখান থেকে মা-বাবাকে খবর দিতে বলেছিল।

মা-মেয়ের সব কথা উজানির কানে যায়নি। শুনতেও চায়নি সে। গাংনেগড়ের চেনা মানুষ তার চারপাশে কম ছিল না। গাঁয়ের কাউকে পেয়ে গল্পে মেতে উঠেছিল। শরতের সকাল পেরিয়ে দুপুর, ধীরে ধীরে গড়াচ্ছিল বিকেলের দিকে। বেনাদহের হাট থেকে গাংনেগড়ের ডেমরা গ্রামে পায়ে হেঁটে পৌঁছোতে কম করে চার ঘণ্টা লাগে, গাংনেগড়ের কয়েক মাইল আগে হুমলোকুমলোর চরে সুপার্থর সঙ্গে কয়েকদিন আগে দেখা করতে গিয়ে জয়া জেনেছে। মাঠের পর মাঠ, আলপথ, পায়ে-চলা পথ, হাঁটছে তো হাঁটছেই, পথ আর ফুরোয় না, পথের যেন শেষ নেই, সকাল সাতটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাঝদুপুরের একটু আগে, সূর্য যখন প্রায় মাথার ওপরে, তখন গাংনেগড় পৌঁছেছিল। দ্বিতীয় দফায় গাংনেগড় রওনা হয়ে সময়ের হিসেব করে জয়া অনুমান করেছিল, সন্ধের আগে গাংনেগড় পৌঁছোতে পারবে না। আশ্বিন শেষের চড়া রোদ মাথায় নিয়ে, তেপান্তর পেরিয়ে ডেমরায় কানাই মুর্মুর ভিটের দরজায় পা রাখতে অন্ধকার হয়ে যাবে। তা হোক, মায়ের কথাটা, অন্ধকার পেরিয়ে আলোর কাছে পৌঁছোতে হয়, তার মাথার মধ্যে ভুলে যাওয়া গানের কলির মত রিনরিন করে বেজে চলেছিল। অসুবিধে যাই থাকুক, সে তোয়াক্কা করে না। তার সামনে অনেক কাজ, গাংনেগড় এলাকার গ্রামগুলোতে নতুন সমাজ গড়ার কারিগরিতে মেয়েদের সংগঠিত করতে হবে। কাজটা কত শক্ত, সে জানে। মেয়েদের প্রথমে বোঝাতে হবে মানুষ হিসেবে তারা পুরুষের সমান, সম্পূর্ণ-মানুষ, মেয়েলি অন্ধকারের গর্ত থেকে পৃথিবীর আলোয় বার করে এনে, মানুষ হিসেবে তাদের আত্মমর্যাদা জাগিয়ে তোলার পরেই মগজে নবযুগ গড়ার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা পুরে দেওয়া সম্ভব। চুঁচুড়া, চন্দননগরের মেয়েদের সঙ্গে গাংনেগড়ের গরিব চাষি পরিবারের মেয়েদের অনেক তফাত। তার পরিবারের বিধবা পিসি যদি বলতে পারে, 'মাইয়া মানুষ আবার মানুষ নাকি' তাহলে শিক্ষাদীক্ষার আলো থেকে হাজার মাইল দূরে, মধ্যযুগের অন্ধকারে পড়ে থাকা গাঁয়ের হাড়হাভাতে, গরিব মেয়েদের, কী ধরনের বচন ঘরের মানুষের কাছ থেকে শুনতে হয়, জয়া অনুমান করতে পারে। কোণঠাসা ইঁদুরের মত ঘরবন্দি সেই মেয়েদের দেশ, কাল, সমাজ, ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে সচেতন করে তোলা কম কঠিন কাজ নয়। তাদের গলায় বাঁধা নানা মাপের অনেকগুলো শেকল কাটতে হবে।

জয়ার মত সঙ্গিনী পেয়ে খুশিতে হইহই করে হাঁটছিল উজানি। সামনে তার বিয়ে। হয়তো সে কারণেই আনন্দে উচ্ছল এই সাঁওতালকন্যা। মেয়ে মাত্রেই এ রোমাঞ্চ অনুভব করে। দেশজোড়া কৃষকবিপ্লবের ঘনায়মান ঝড় নিয়ে, মেয়েদের জঙ্গী সংগঠন গড়া সম্পর্কে সে একটাও কথা বলছিল না। তার কথা বলার যত উৎসাহ নিজের স্কুল নিয়ে, সেখানের বন্ধু, ছাত্রীনিবাসের মেয়েদের নিয়ে, নিজের

আসন্ন বিয়ে প্রসঙ্গে, দিদি জামাইবাবুকে নিয়ে গায়ে কাঁটা দেওয়ার মত কিছু কথা অবলীলায় বলছিল, যা শুনলে দু'কান গরম হয়ে যায়। জয়ার তা হয়েছিল, তবু সে মুখ খোলেনি। কথা বলার নিয়ম আগের কয়েক বছরে কিছুটা সে শিখে গেছে। সে জেনে গিয়েছিল, নিজে কথা বলার আগে অন্যের কথা শুনতে হয়, ক্রমাগত শুনে যেতে হয়, কথা বলিয়ে, বলিয়ে কথা বলার ধকলে বক্তাকে ক্লান্ত করে দিতে হয়। তার কথার মধ্যে এমন কিছু ফাঁকফোকর তৈরি হতে থাকে, যার মধ্যে দিয়ে নিজের কথার ঝাঁপি নিয়ে ঢুকে পড়ার সুযোগ শ্রোতা পেয়ে যায়। বক্তা তখন হয় শ্রোতা, শ্রোতার কথা অবাক হয়ে সে শুনতে থাকে। পৃথিবীতে শোনার মত এত বিষয় আছে জেনে বিমোহিত হয়। দিকচিহ্নহীন তিনটে মাঠ পেরিয়ে, বিকেল ফুরোনোর কিছু পরে, মাথার অনেক ওপর দিয়ে ছিঁড়ে যাওয়া মালার মত এক ঝাঁক ধূসর বক যখন পশ্চিম আকাশ থেকে উত্তরদক্ষিণ দিকে উড়ে যাচ্ছে, সেই স্তব্ধতার মুহূর্ত তখন এসে গিয়েছিল। একটানা দু'ঘণ্টার বকবকানি থামিয়ে জয়ার মুখ থেকে উজানি শুনছিল, মেয়ে-পুরুষের সমান অধিকারের কথা, লেখাপড়া শিখে সসম্মানে তাদের বেঁচে থাকার কাহিনী। কিছু বিত্তবান মানুষের কুক্ষিগত এই পৃথিবীতে অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে কীভাবে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে মর্যাদার ফারাক গড়ে ওঠে সেই বিবরণ। সংসারে ভাতের অভাব ঘটলে, হাঁড়িতে স্বামীর ভাত আগলে বউ কেন না খেয়ে, শুকনো মুখে চুপচাপ কাটিয়ে দেয়, বাড়ির ছেলে সন্তান অসুস্থ হলে, ঘটিবাটি বেচে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাকে ডাক্তার দেখাতে মা-বাবা ব্যস্ত হয়ে পড়ে, অথচ রোগভোগে মেয়ে-সন্তান বিনা চিকিৎসায় দিনের পর দিন ঘরের কোণে পড়ে থাকলে অভিভাবকরা গ্রাহ্য করে না, সেই বৃত্তান্ত। মা, বাবা, অভিভাবকরা কী নিষ্ঠুর, মেয়ে-সন্তানের জন্যে তাদের কি দয়ামায়া নেই? বাইরে থেকে দেখে সেরকম মনে হলেও প্রকৃত ঘটনা তা নয়। সমাজের চেহারাটাই এরকম। ধনী পরিবারে এরকম ঘটে না। মেয়েরাও সেখানে ছেলের সমান ভাত পায়, আদরযত্ন পায়, দরকার মত সমান চিকিৎসা পায়, কেন এমন ঘটে? কেন?

জয়ার ব্যাখ্যার সঙ্গে উজানির ছেলেবেলা থেকে দেখা নানা ঘটনা মিলে যেতে, বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গল্পের মতো সে শুনে যাচ্ছিল নতুন পাওয়া দিদির মুখের কাহিনী। 'কেন এমন ঘটে' প্রশ্ন তুলে দিয়ে, তার বুকের ভেতরে জয়া আলোড়ন জাগালেও জবাবটা জানা ছিল না। বিকেলের আলোছায়া জড়ানো ফসল কাটা ধুধু মাঠ জুড়ে 'কেন' শব্দটা বাতাসের স্তরে স্তরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। পায়ে-চলা পথ ছেড়ে আলের ওপর দিয়ে পাশাপাশি হাঁটছিল দু'জন। জয়ার মুখের দিকে, আরো কিছু শোনার জন্যে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল উজানি। প্রীতিদিদিকে ঘিরে তার মনে যেমন সম্ভ্রম তৈরি হচ্ছিল তেমনি গড়ে উঠছিল রহস্যের বলয়। বেদেগ্রামের গণেশ বাউরি, যাকে সে গণেশখুড়ো বলে, সেই বলেছিল প্রীতিদিদিকে তাদের গাঁয়ের

বাড়িতে নিয়ে যেতে। আদিবাসী সমাজে মেয়ের বিয়ের আয়োজন, উপাচার নিজের চোখে প্রীতিদিদি দেখতে চায়। বিয়েতে শহুরে একটা মেয়েকে গাঁয়ের বাড়িতে নিয়ে যেতে উজানির উৎসাহ কম ছিল না। বিয়ের উৎসবের সঙ্গে জড়ানো নতুন এক খেলা ভেবেছিল। আবছা অন্ধকার ফাঁকা মাঠের মাঝখানে, হঠাৎ সে টের পেল, সদ্য চেনা, প্রায় সমবয়সী এই মেয়েটা শুধু এক আদিবাসী মেয়ের বিয়ে দেখতে যাচ্ছে না, ঝুলি-বোঝাই করে এমন সব গল্প নিয়ে যাচ্ছে, যা গাঁয়ের মেয়েরা গোগ্রাসে গিলবে। তার ঠাকুমা, দিদিমার চেয়ে এ বড়ো কথকঠাকুরানি। প্রীতিদিদিকে ভীষণ কাছের মানুষ মনে হল তার, সহপাঠিনীর মত, আবার দূরেরও বটে। উজানির মুখের দিকে তাকিয়ে জয়া জিজ্ঞেস করল, কী ভাবছ?

তুমি কত জানো! বেশ লাগছে তোমার কথাগুলো শুনতে।

তোমাদের পাড়ার সব মেয়ে কি পছন্দ করবে এসব কথা?

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে উজানি বলল, সবাই শুনবে না। কিছু মেয়ে শুনবে। তাদের অনেকের মাথায় এসব কথা ঢুকবে না। উজানিকে চুপ করে থাকতে দেখে জয়া বলল, একটা কথা কিন্তু মনে রেখো, আমরা দুজন স্কুলে এক ক্লাসে পড়ি, মেয়েদের হোস্টেলে এক ঘরে থাকি।

গণেশখুড়ো আগেই তা শিখিয়ে রেখেছে।

উজানিকে কতটা গণেশ বাউরি শিখিয়ে রেখেছে, না জেনেও জয়া টের পেল, ডেমরার আশপাশের কোনো গাঁয়ে শহর ছেড়ে সুপার্থ ডেরা করেছে, এখবর উজানির কানে এখনো পৌঁছোয়নি। আত্মগোপন করার পদ্ধতি মেনে চলেছে সুপার্থ। আড়াল থেকে দলকে চালাচ্ছে, যার জন্যে যে কাজ বরাত করছে, তাকে দিয়ে সেই কাজ করিয়ে নিচ্ছে। গাংনেগড়ের ডেমরা গ্রামে কানাই মুর্মুর ঘরে তার চার মেয়ের সঙ্গে জয়ার থাকার ব্যবস্থা সে ভেবেচিন্তে করেছে, সন্দেহ নেই। পাশের কোনো গাঁয়ে যেখান থেকে জয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সহজ, সেখানে নিশ্চয় সে রয়েছে। কানাই মুর্মুর একটা ছেলেও আছে। তার বয়স কত জয়া না জানলেও যোগাযোগের কাজে তাকে সুপার্থ তৈরি করে নিতে পারে। কানাই-এর বাড়িতে তার পৌঁছোনোর খবর পেয়ে আজ রাতে হয়তো সুপার্থ দেখা করতে আসবে, কীভাবে কাজ শুরু করতে হয়, জানিয়ে দেবে। পুরুষরা মুনিষ খেটে যেখানে পেটের ভাত জোটায়, একজন মেয়ে সেখানে কীভাবে নিজের ভরণপোষণ চালাতে পারে, শুরু থেকে এ চিন্তা জয়ার মাথায় রয়েছে। সুপার্থকে প্রশ্নটা, সেবার দেখা হওয়ার সময়ে করতে না পারলেও সে ধরে নিয়েছে মেয়েদের জন্যেও 'মুনিষ' খাটার মত কাজ গাঁয়ে জুটে যাবে। খেতে ধান কাটতে পারে না সে, ঢেঁকিতে কখনো ধান ভাঙেনি, ভাঙা ধানে পাড় দেয়নি, মাথায় করে ধানের বস্তা, সবজির বোঝা, এক হাট থেকে অন্য হাটে পৌঁছোতে হয়নি, এসব করার কথা যে ভাবতে হয়, কল্পনা করেনি। মাইল পাঁচ, ছয় হাঁটার পরে ভরসন্ধেতে, মাঠের

পাশে কোনো ভাগাড় থেকে সমাসন্ন রাতের বার্তা জানাতে, শিঙা ফোঁকার মত যখন প্রথম দফা শিয়াল ডাকল, দু'একটা জোনাকি অন্ধকারের গভীরতা মাপতে কোটর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে, উজানিকে জয়া জিজ্ঞেস করল, তাদের গাঁয়ে স্কুল আছে কিনা? সেটা ছেলেদের স্কুল, না মেয়েদের স্কুল, এরকম আরো কিছু প্রশ্ন। প্রশ্নের উত্তরগুলো তার অজানা ছিল না। গাংনেগড়ের দু'চার মাইলের মধ্যে কোথাও স্কুল নেই, সুপার্থ বলেছিল। মগরায় পিসির বাড়িতে থাকার সময়ে উজানির প্রাথমিক শিক্ষা হয়। সেটুকুও হয়েছিল মিশনারিদের কল্যাণে। তারপর গাংনেগড়ে ফিরে এসে দু'বছর মা-বাবার ঘরসংসার আর মাঠের কাজ করার পরে, দ্বিতীয়বার মগরায় গিয়ে মিশনারিদের যোগাযোগে স্কুলে পড়ার সুযোগ পেয়েছিল।

উজানি সম্পর্কে এত তথ্য জানার পরেও জয়া যে প্রশ্নগুলো করছিল, তার কারণ, সবচেয়ে বেশি করে জানার বিষয়টাকে মোড়কে জড়িয়ে উজানির সামনে হাজির করতে চেয়েছিল। সুযোগ আসতে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের গাঁয়ে যাদের বিয়ে হয়নি, সংসারে যারা ঢোকেনি, সারাদিন তারা কী করে?

কলকল করে হেসে উঠে উজানি বলেছিল, বিয়ে হোক আর না হোক, দশ বছর বয়স হওয়ার আগেই হাড়ভাঙা খাটুনিতে মেয়েরা অভ্যস্ত হয়ে যায়। সাতসকালে ঘুম থেকে উঠে কখনো মা, কখনো দিদির সঙ্গে জ্বালানি কুড়োতে জঙ্গলে যেতে হয়, নিজেদের ধানজমি থাকলে, সেখানে থেকে কেটে আনা আধশুকনো নাড়া (ধানআঁটির গোড়া) রোদে দিয়ে শুকোতে হয়, পুকুর থেকে, টিউকল থেকে জল আনতে হয়, ছোটো ভাইবোনদের দেখভাল করা, হাগানো, নাওয়ানো, খাওয়ানো, ভিজে কাঁথা, ইজের, গেঞ্জি ধোয়া, আধভিজে জ্বালানিতে মাটির উনুন জ্বালাতে ধোঁয়ার কামড়ে অন্ধ হয়ে যাওয়া, কয়েক মাইল দূরের মাঠে বা গঞ্জে যেখানে মা-বাবা, 'মুনিষ' খাটছে তাদেব পান্তা পৌঁছোনো, কাজের শেষ নেই, দম ফেলার ফুরসত মেলে না। চাষের সময় দরকারে মা-বাবার সঙ্গে মাঠের কাজে যেতে হয়। কাজের মরশুম ফুরোলে কাজের আশায় হা-পিত্যেশ করে বসে থাকা, বাবা-দাদার খিস্তি শোনার সঙ্গে কখনো আধপেটা খেয়ে, কোনোদিন উপোস করে কাটানোর সময়ে মনে হয়, কী দরকার ছিল আমার জন্মানোর?

ডেমরা গাঁয়ের মেয়েদের বৃত্তান্ত উজানি যখন সাবলীলভাবে শোনাচ্ছে, জয়ার শরীরের ভেতরটা অজানা ভয়ে শিরশির করলেও আরো জানার জন্যে সে প্রশ্ন করে যাচ্ছিল। স্বাভাবিক ছিল তার কণ্ঠস্বর। উজানি যখন শোনাল যে প্রায় সব সংসারে আট থেকে দশ সন্তান ভূমিষ্ঠ হলেও তিন-চার জনের বেশি বাঁচে না, মেয়ে-সন্তানের মৃত্যুই বেশি, তখন জয়ার কথা আটকে গেল। সে অনুভব করল, লিঙ্গ বৈষম্য আর মৃত্যু যেখানে একাকার হয়ে আছে, সেখানে মৃত্যুর সঙ্গে নিত্যদিন পাঞ্জা কসে মেয়েদের ব্যূহ বানাতে হবে। ছেলেদের ব্যূহ আর মেয়েদের ব্যূহ মিলে গড়ে উঠবে নতুন সমাজ গড়ার বাহিনী। নবযুগ গড়ার বাহিনী তৈরির কল্পনায় মশগুল হয়ে কলেজে পড়া, একুশ বছরের এক শহুরে মেয়ে প্রায় সমবয়সী স্কুলে

পড়ার এক আদিবাসী মেয়ের পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছিল, ক্রমশ গভীর অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যাওয়া গাংনেগড় নামে এক অজ পাড়াগাঁয়ের নিরুদ্দেশে। নিরুদ্দেশেরও ঠিকানা থাকে। সেই ঠিকানায় তার জন্যে যে অপেক্ষা করছে, সারা জীবন এক সঙ্গে পথ চলার সঙ্কেত পাঠিয়েছে, তার মুখটা মনে করে সে ভরসা পেতে চাইল। মায়ের দেওয়া কাঠের সিঁদুরকৌটোটা সুপার্থর হাতে তুলে দিলে, সে কী করবে জয়া জানে। কানাই মুর্মুর বাড়িতে সকলের সামনে তার সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা টেনে অনায়াসে বলে দেবে, এই মেয়ে আমার বধূ আমার স্ত্রী, ধর্ম, বাড়ি, জীবনসঙ্গিনী।

কী ভাবছ দিদি?

উজানির প্রশ্নে জয়া কী বলবে ভেবে পেল না। মাঠের পর মাঠ পেরোনোর ধকলে ক্লান্তিতে নুয়ে পড়ছে তার শরীর। উজানির দিকে তাকিয়ে তাকে খুঁজে পেল না। অন্ধকার যতটা ঘন হয়েছে, তার চেয়ে বেশি অন্ধকার দেখছে, এমন ভ্রম হল। অন্ধকারে ভাঙা আলপথে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে ডান পায়ের চটির বুড়ো আঙুলের 'স্ট্র্যাপ' ছিঁড়ে যেতে দাঁড়াতে হল তাকে। উজানি জিজ্ঞেস করল, পায়ে লাগেনি তো?

লাগেনি, তবে মুশকিল হয়েছে একটা।

কী হল?

চটির 'স্ট্র্যাপ' ছিঁড়ে গেছে।

উবু হয়ে বসে উজানি খুলে নিল জয়ার পায়ের ছেঁড়া চটি। জয়া ঠেকাতে চাইলেও উজানি পাত্তা দিল না। অন্ধকারে উজানির হাতে কাচের চুড়ির ঠুং-ঠাং শব্দ শুনে, সে কী করছে জয়া অনুমান করতে পারল। চুড়িতে লাগানো একাধিক সেফটিপিন গেঁথে উজানি চেষ্টা করছে তার 'স্ট্র্যাপ'-ছেঁড়া চটি ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে। জয়ার দু-পা ঝনঝন করছিল। তিন ঘণ্টার বেশি হেঁটে একটু দাঁড়াতে, সেই সুযোগ আরো একটু বাড়িয়ে পা দুটোকে কিছু সময় বিশ্রাম দিতে চাইছিল সে। চটি ছিঁড়ে যেতে সেই অবকাশ মিলল। আলপথের ধারে ঘাসের ওপর বসে পড়তে ইচ্ছে করলেও সাহস পেল না। কী জানি, বসলে যদি উঠে দাঁড়াতে না পারে, এমন সংশয় মনে জাগলে বসা যায় না। ঘাসের ওপর বসলে ঘুমিয়েও পড়তে পারে। সে সুযোগ ঘটল না। উজানি চটি মেরামত করে তার পায়ের কাছে রেখে বলল, গাঁয়ে প্রায় পৌঁছে গেছি। আর পোয়াটাক রাস্তা পেরোলে আমাদের ঘর। সে পর্যন্ত চলে যাবে তোমার চটি।

অন্ধকারে চোখ সয়ে গেছে জয়ার। চটিটা পায়ে গলিয়ে বাঁ হাতের তর্জনীর ডগা মুখে পুরে উজানিকে কথা বলতে দেখে, জিজ্ঞেস করল, আঙুল চুষছো কেন?

সেফটিপিন ফুটে গেল।'

রক্ত বেরোচ্ছে?

ও কিছু নয়।

জয়াকে দেখে উজানি যতটা মুগ্ধ হয়েছে, উজানির সঙ্গে কিছুক্ষণের পরিচয়ে জয়া তার চেয়ে বেশি আশ্বস্ত হয়েছে। গাংনেগেড়ের সাঁওতাল মেয়ে, উজানির মত আরো দু'একজন মেয়ে মিললে ঝড়ের মত গড়ে উঠবে মেয়েদের সংগঠন, এ আশা অবান্তর নয়। সংগঠনের বড় কথা হল তার মগজ। উজানির মত কয়েকজনকে নিয়ে মগজটা যদি তৈরি করা যায়, পরের কাজগুলো তরতর করে এগিয়ে যাবে। বড় তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যাচ্ছে উজানির। বিয়ের পরে উজানিকে কি সংগঠনে ধরে রাখা যাবে? ডাকাবুকো এই মেয়েটার এত তাড়াতাড়ি বিয়ে না হলেই ভাল হত। কথাটা জয়া বলতে পারল না, কারণ তা বলার মত নয়। মুখ থেকে আঙুল বার করে উজানি বারবার দেখছে, রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে কিনা। জয়া আঙুলটা দেখতে চাইতে উজানি জানাল, রক্ত বন্ধ হয়েছে।

মুখ থেকে আঙুল বার করে নিয়ে দুজনে যখন হাঁটতে শুরু করল, ডেমরা গ্রামের সীমান্তে ঝাঁকড়া একটা গাছের মাথায় আধখানা চাঁদ উঠেছে। উজানি বলল, রক্ত খুব দামি। মানুষ একফোঁটা রক্ত নষ্ট করতে চায় না। সত্যি কিনা?

জয়ার দিকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়ে তার উত্তর শোনার জন্যে উজানি যখন কান খাড়া করে রয়েছে, জয়া বলতে পারল না যে, শ্রেণীশত্রুর রক্তে হাত না রাঙালে নতুন সমাজ গড়া সম্ভব নয়। উত্তর শুনতে উজানি আকুলি বিকুলি করল না। সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া তার কাছে অবশ্য করণীয় কাজের মধ্যে পড়ে না! মুখ বুজে সে হাঁটতে থাকল। প্রসঙ্গ বদলাতে চাঁদের মুখে পাঁচ আঙুল ছড়ানো ঝাঁকড়া গাছটা দেখিয়ে জয়া প্রশ্ন করল, ওটা কী গাছ?

হিজল।

জয়া আর প্রশ্ন করল না।

তেরো

জয়া যা জেনেছিল, তাই ঘটল। রাত এগারোটার কিছু আগে সমস্ত গাংনেগড় যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, ডেমরা গাঁয়ের কতিপয় কুকুর, কানাই মুর্মুর পরিবারের সঙ্গে গণেশ বাউরি, আফতাব, ছিরু সোরেন ছাড়া কেউ জেগে নেই, তখনই তাদের চোখের সামনে কুপির আলোয় জয়ার সিঁথিতে সিঁদুরের চিহ্ন এঁকে সুপার্থ বলল, ইনি আমার স্ত্রী, আমার জীবনসঙ্গিনী। বিবাহিতা মেয়েদের এই চিহ্ন ধারণ করতে হয়, মান্ধাতা আমলের এই নিয়ম আমরা দুজন না মানলেও সমাজের কথা মাথায় রেখে এটা করলাম।

কানাই মুর্মুর পরিবারের সবাই, গণেশ, আফতাব, ছিরু, এই বিবাহবাসরের জন্যে যেন তৈরি ছিল। গণেশ জোগাড় করে রেখেছিল দুটো ষাঁড়া মোরগ, চাকান টুডু আর ছিরু মিলে এনেছিল পাঁচ কেজি মোটা, আকাঁড়া চাল, সব আয়োজন সন্ধে থেকে হয়ে আছে, কানাই মুর্মুর বাড়িতে ঢুকেই জয়া আন্দাজ করেছিল। সুপার্থ সেখানে এসেছিল আধঘণ্টা পরে। নরম গলায় জয়াকে জিজ্ঞেস করেছিল, এতটা হেঁটে আসতে কি খুব কষ্ট হল?

জবাব না দিয়ে জয়া হাসল। চাপা গলায় সুপার্থ বলেছিল, বিয়ের ব্যাপারটা আজ রাতে সেরে ফেলতে চাই। এখানকার পার্টি কমিটিও রাজি হয়েছে, কাল সকালে গাঁয়ের মানুষ দেখবে উজানির সঙ্গে এসেছে তার স্কুলের বিবাহিতা এক বন্ধু। বিবাহিতা যখন, তার স্বামী আছে। সেই পতিদেবতাটি যে আমি, তা জানতে আরো কিছুদিন লাগবে।

গলা নামিয়ে সুপার্থ প্রশ্ন করেছিল, সিঁদুর এনেছ?

চটের থলি থেকে সিঁদুর কৌটো বার করে সুপার্থের হাতে দিয়ে জয়া বলেছিল, এসব সংস্কার আমি কিন্তু মানি না।

আমি মানি নাকি?

জয়ার চোখে চোখ রেখে সুপার্থ বলেছিল, আমরা না মানলেও এমন কিছু কাজ আমাদের করতে হয়, সাধারণ অবস্থায় যা ভাবতে গা ঘিনঘিন করে।

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে সুপার্থ বলেছিল, মনে করে দ্যাখো, বারিদ খুন হওয়ার সন্ধেতে বাড়ির খাটাপায়খানার গামলার পাশে তোমার লুকিয়ে থাকা। স্বাভাবিক অবস্থায় কাজটা তুমি করতে পারতে না। গভীর কোনো ধ্যান থেকে সেই সন্ধেতে পেরেছিলে। সেই ধ্যানটাই লক্ষ্য। লক্ষ্যে পৌঁছোতে পথের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে মাথা ঘামালে চলে না।

জয়া কথা বাড়ায়নি। সুপার্থর হাতে সিঁদুরকৌটো দিয়ে ঘরের দাওয়া ছেড়ে ঘরের ভেতরে যেখানে উজানি, তার দিদি বোন মা জটলা করছিল, সেখানে চলে গিয়েছিল। ফিসফিস করে কথা বলছিল তারা। জয়া ঘরে ঢুকতে চুপ হয়ে গেল। প্রথম মুখ খুলল উজানি। বলল, প্রীতিদিদি, তোমার পেটে পেটে এত?

চাপা গলায় কথাটা বললেও খিলখিল করে উজানি এমন হাসতে থাকল, যার তরঙ্গ নিস্তব্ধ গ্রামের শেষ প্রান্ত থেকে শোনা যায়। বাড়ির উঠোনে কাঠের চুলোয় দাউদাউ করে ফুটছে ভাতের হাঁড়ি। বড়সড় মাটির তিজেল হাঁড়ি থেকে উপচে ওঠা ফেন গড়িয়ে পড়ছে। মুরগি কেটে রান্না, আগে হয়ে গিয়েছিল। ভাতের হাঁড়ি নামলে সকলে খেতে বসবে। জয়ার কানের কাছে মুখ এনে নিচু গলায় উজানি বলল, রাজপুত্তুরের মত দেখতে তোমার বরকে। আমার বরটাও সুন্দর, কঠিন জোয়ান, দারুণ ধামসা বাজায়। বিয়ের রাতে তুমি শুনবে তার ধামসার বোল।

মেয়েদের কথার মধ্যে ভাত সেদ্ধ হয়েছে কিনা দেখতে উঠোনে চুলোর সামনে

গিয়ে দাঁড়াল মা। কুপির ম্লান আলোয় লকলকে ছায়ার সঙ্গে ঘরের মধ্যে যৎসামান্য কথাচালাচালি থেকে কানাই মুর্মুর সংসারের যে ছবি জয়া পেল, তা স্বস্তিদায়ক নয়। বেনাদহের হাটে পরিচিত বন্ধু উজানির আরো তিনবোন, এক ভাই আছে। বোনদের দুজন বড়, একজন ছোট। সবচেয়ে বড় জন, নাম, কুরচি স্বামী পরিত্যক্তা, তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে বাবার সংসারে থাকে। শুরু থেকে তাকে কুণ্ঠিত, কোণঠাসা মনে হল জয়ার। মেজবোন মহুলি, শক্তপোক্ত শরীর, জোতদারের জমিতে চাষের কাজ করে। উজানির মত ঝেঁঝে কথা বলছিল সে, থেকে থেকে হাসছিল। মহুলিও যে মেয়েদের সংগঠনে সম্পদ হবে, একনজরে জয়া বুঝতে পারল। সেজবোন উজানিকে কয়েক ঘণ্টায় অনেকটা জেনে গেছে জয়া। তার চরিত্রে নেত্রী হওয়ার সহজাত গুণ রয়েছে। স্বামী-পরিত্যক্তা মনমরা কুরচিকে ব্যক্তি-জীবনের হতাশা থেকে বার করে এনে যদি স্বাবলম্বী, আত্মবিশ্বাসী হওয়ার দুর্জয় সাহসে জাগিয়ে তোলা যায়, তাহলে হয়তো সে মেদিনীপুরের বীর নারীশহিদ মাতঙ্গিনী হাজরার মত গণ-আন্দোলনের সামনের সারিতে এসে যেতে পারে। এক বাড়ি থেকে তিন বোনকে কর্মী হিসেবে পাওয়া গেলে এলাকা ঘুরে যে আরো অনেককে পাওয়া যাবে, এ নিয়ে জয়ার সন্দেহ নেই। মেয়েদের নিয়ে তখন ঘূর্ণিঝড়ের মত আন্দোলন গড়ে উঠবে। সবচেয়ে ছোট, আট-দশ মাসের ঘুমন্ত বাচ্চাকে কোলে নিয়ে কুরচি শুনে যাচ্ছে সকলের কথা। একবারের জন্যে সে এখনো মুখ খোলেনি।

ঘর বলতে এই একটাই। সেটাই বাড়ি। উঠোনের কোণে কোমর সমান ঝুপড়ি, মানুষের বাসের যোগ্য নয়। হাঁস, মুরগি, হয়তো একটা ছাগল আছে সেখানে মূল ঘরের বাইরে মাটির দাওয়া, গোবরজলে নিকোনো পরিষ্কার। জানলার বাইরে সেই বিশাল হিজলগাছের পুবে হেলে পড়েছে আধখানা চাঁদ। ঘুলঘুলির মত ছোটো জানলা দিয়ে কিছুটা আলো এসে পড়েছে ঘরে। সেই আলোতে কুপির আলো ঈষৎ জোর পেয়েছে। ঘরের মেঝেতে ঘুমিয়ে কাদা হয়ে থাকা দিদির চার, পাঁচ বছরের দুটো বাচ্চাকে মাংস-ভাত খাওয়ার লোভ দেখিয়ে যে জাগাতে চাইছে, সে কানাই মুর্মুর সবচেয়ে ছোট মেয়ে ঝনঝনি। বয়স দশের বেশি নয়। দিদির ছেলেমেয়েকে জাগাতে সে যখন টানাহ্যাঁচড়া করছে, ঘরের বাইরে থেকে সাত, আট বছরের একটা ছেলে এসে তার সঙ্গে হাত লাগাল। উজানি বলল, এ আমাদের ছোট ভাই পবন। ঘুমন্ত দুই শিশু জেগে উঠে কী ঘটছে বুঝতে না পেরে একজন হতভম্বের মত বসে থাকল, চোখ কচলাতে থাকল আর একজন।

উনুন থেকে ভাতের হাঁড়ি নামানো হয়েছিল। মাংস আগে থেকে রান্না করা ছিল। সকলে উঠোনে এসে দাঁড়াতে, শালপাতা দাওয়ায় পেতে, খেতে বসার ব্যবস্থা যখন হচ্ছে, তখনই সেই কাণ্ডটা সুপার্থ করল। জয়ার সিঁথিতে সিঁদুর টেনে দিয়ে তাকে সহধর্মিনী করার অঙ্গীকার নিল। জয়া সামান্য লজ্জিত হলেও আনুষ্ঠানিকতাহীন, সরল এই বিয়ের পদ্ধতিতে খুশি হওয়ার সঙ্গে নিশ্চিন্ত বোধ করল। শাঁখ না বাজলেও, উলুধ্বনিতে নিস্তব্ধ ডেমরা গ্রামের অন্ধকার কেঁপে না উঠলেও নমো

নমো করে বিয়ের অনুষ্ঠান চুকে যাক, এটাই সে চেয়েছিল। সুপার্থর সঙ্গে আমৃত্যু পথ চলতে এটুকুই যথেষ্ট বিবেচনা করেছিল সে। পুরোহিত ডেকে মন্ত্রোচ্চারণ করে, যজ্ঞের আগুন জ্বেলে যারা বিয়ে করে, তাদের সংস্কারকে সে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে না দিলেও, ও ধরনের বিধি মেনে বিয়ে করার চিন্তা সে কখনো করেনি। এ প্রথায় তার সায় নেই। বাড়ি থেকে বিশ, পঁচিশ মাইল দূরে অচেনা এক সাঁওতাল পরিবারে বিয়ের এই অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে সে অখুশি হল না। বরং খুশিই হল। তবে বিয়ের এই আকস্মিকতায় সে বিহ্বল হয়েছিল। গাংনেগড় পৌছোনোর দু'ঘণ্টার মধ্যে বিয়ে হয়ে যাবে, সে ভাবেনি। সব আয়োজন সুপার্থ করে রেখেছে জানতে পারেনি। অনেক ভেবে প্রথম রাতে বিয়ের পাট সুপার্থ সেরে ফেলতে চেয়েছে, এ নিয়ে তার সন্দেহ নেই। সুপার্থ জানায়নি। তার পক্ষে জানানো সম্ভব ছিল না, জয়া অনুমান করতে পারল। কিন্তু তারপর? নতুন বউ নিয়ে সুপার্থ থাকবে কোথায়? ধানের খোলার ভেতরে বাঁশের মাচায়, সুপার্থ নিশ্চয় তাকে থাকতে নিয়ে যাবে না। কানাই মুর্মুর একটা ঘরে, তার একঝাঁক পোষ্যদের সঙ্গে শুরু হবে না তাদের দাম্পত্য জীবন। কানাই-এর মাটির ভিটেতে আরো একটা চালাঘর থাকতে পারে। বাড়িতে ঢোকার সময়ে গরিব সাঁওতাল কৃষকের বাস্তুর চৌহদ্দি ভাল করে সে দেখেনি। পথ চলার ক্লান্তিতে দু'চোখে এমন ধুতরো ফুল দেখছিল যে পা ছড়িয়ে বসতে চাইছিল দাওয়ার ওপরে। বসেও ছিল। তখনো জানত না, একটু পরেই তার বিয়ে। দলের সঙ্গে কথা বলে বিয়ের প্রস্তুতি সুপার্থ পাকা করে রেখেছে।

উঠোনে পাত পেতে সবাই খেতে বসেছে। সবাই নয়, শুধু পুরুষরা, তাদের সঙ্গে নতুন বউ জয়া বসেছে। কানাই মুর্মুর বউ-মেয়েরা বসবে অতিথিদের খাওয়া চুকলে। জয়ার অস্বস্তি হলেও কিছু বলার উপায় নেই। সদ্য এই সংসারে সে এসেছে, প্রায় উটকো লোক। মুখ বুজে খেতে না বসে তার উপায় নেই। উজানির ছোট বোন ঝনঝনি অবশ্য বসে গেছে। তার দিদি খাওয়াতে বসেছে ঘুমে ঢুলতে থাকা দুই বাচ্চাকে। কোলের বাচ্চাটাকে ঘুম পাড়িয়ে ঘরে রেখে এসেছে। জয়া, সুপার্থকে মাঝখানে রেখে গোল হয়ে বসেছে সকলে। মাঝখানে ভাতের হাঁড়ি, মাংসের হাঁড়ি। দুটোই মাটির হাঁড়ি। ধোঁয়া বেরোচ্ছে ভাতের হাঁড়ি থেকে। দুটো কুপির সঙ্গে একটা হারিকেন জ্বলছে। হিজল গাছের মাথা টপকে আধখানা চাঁদ উঠোনের ওপরে সরে এসে সার্চলাইটের মত নৈশভোজের আসরে আলো ফেলেছে। ভাতের গ্রাস, জয়া মুখে পুরতে, উজানি বলল, প্রীতিদিদির বিয়েতে ধামসা, মাদল বাজিয়ে নাচগান করতে পারতাম আমরা। আমাদের গাঁয়ে তো কম ছেলেমেয়ে নেই।

গণেশ বাউরি বলল, কিছু অসুবিধে ছিল। দু'এক দিনের মধ্যে জানতে পারবি, কী মহাকাণ্ড চলছে এখানে। তবে তোর বিয়েতে নাচগান হবে।

গণেশের কথার প্রথম অংশ উজানির বোধগম্য না হলেও সে প্রশ্ন করল না। জয়াকে ফিসফিস করে সুপার্থ বলল, ভাল করে খাও। কাল থেকে হয়তো দু'বেলা ভাত জুটবে না।

খিদেতে জয়ার পেটের নাড়িভুঁড়ি এমন মোচড় লাগাচ্ছিল, যে কথা না বলে সে খেয়ে চলল। চাকান টুডু আর ছিরুর পাতে ভাতের পাহাড়। লোহার হাতায় তুলে জলের মত ছ্যারছেরে ঝোল আর দু'এক টুকরো মাংস, পাতে পড়ার কয়েক মিনিটে তা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কানাই মুর্মুর বউ পরিবেশন করছিল। তাকে সাহায্য করছিল দুই মেয়ে, মেজদি আর উজানি। ঘরে ঢুকে কুরচি, মহুলিকে 'বড়দি', 'মেজদি' বানিয়ে নিতে জয়ার বেশি সময় লাগেনি। তার 'দিদি' ডাক সানন্দে মেনে নিয়েছিল দুই সাঁওতালকন্যা। কুরচি বলেছিল, ভারি ভাল একটা 'বুন' আমরা পেল্যাম বটে।

কানাই মুর্মু সমেত পুরুষদের (সুপার্থ বাদে) খাওয়ার বহর দেখে, মেয়েদের জন্যে শেষপর্যন্ত কিছু না-ও থাকতে পারে, এমন ভয় জয়া পাচ্ছিল। তেমনি কিছু ঘটল না। মাংস সামান্য অবশিষ্ট থাকলেও ভাত, ঝোল ছিল যথেষ্ট। তিন মেয়ে নিয়ে মা যেমন তৃপ্তি করে বিয়ের ভোজ খেল, তখন মাংসের হাঁড়ির অগাধ ঝোলের মধ্যে কয়েক কুঁচো মুরগির মাংস ছাড়া কিছু ছিল না। খাওয়ার মধ্যে আর খাওয়া শেষ করে উঠোনের দু'পাশে বাড়তি কোনো ঘর জয়া দেখতে না পেলেও খড়ের ছাউনি দেওয়া ঝুপড়িটা যে মানুষের বাসযোগ্য নয়, প্রথম দর্শনে টের পেয়েছিল। অন্ধকার ঝুপড়ির ভেতর থেকে তখনই ছাগলের ডাক ভেসে এসে জানিয়ে দিল, তার ধারণা ভুল নয়। তাকে সিঁদুর পরানোর এই রাতটা সুপার্থর কাছে যে তার বিপ্লবী কর্মসূচি, অথবা কবিতার অংশ, জয়ার বুঝতে অসুবিধে হল না। শুধু সুপার্থ কেন, ঘটনাটা তাকেও একইভাবে মেনে নিতে হবে। তাদের দুজনের লক্ষ আর লক্ষে পৌঁছোনোর পথ আলাদা নয়। তবু হৃদয় নামে যে বস্তুটা বুকের মধ্যে অথবা মগজে থাকে, কাজ করে, আকাঙ্ক্ষার নদী ঢেউকে তুলে তৃপ্তি পায়, সেই ঢেউ ভাঙার শব্দহীন ছলাৎছল আওয়াজ শুনতে না চেয়েও সে শুনতে পাচ্ছিল। বেনাদহের হাট থেকে ডেমরা পর্যন্ত সুদীর্ঘ রাস্তা পায়ে হেঁটে আসতে শরীর যখন ঘামে ভিজে উঠেছে, শাড়ির আঁচলে মুখ মুছলেও ব্লাউজ, অন্তর্বাস শরীরে আটকে যাচ্ছে, তখন থেকেই ঢেউ ভাঙার মৃদু আওয়াজ, সুদূর এক দ্বীপান্তর থেকে তার কানে আসছিল। ঢেউ-এর ছোঁয়া টের পেয়েও কিছু করার ছিল না। সূর্য ডুবতে পৃথিবীর তাপ কমেছিল। ভিজে পোশাক ক্রমশ শুকিয়ে গেলেও কানাই মুর্মুর বাড়িতে পৌঁছে সেগুলো বদলানোর কথা, ভেবে রেখেছিল। ঘুমোনোর আগে দ্বিতীয় শাড়ি, জামা শরীরে জড়িয়ে, ধুলোমাখা ঘর্মাক্ত পোশাক কেচে শুকোতে দেওয়ার চিন্তা মাথায় ছিল। দুটো শাড়ি-ই ছিল তার সঙ্গে, একটা শরীরে, অন্যটা চটের থলিতে। দেশের গরিব চাষি পরিবারের মেয়ে, বউদের দুটোর বেশি শাড়ি থাকে না, সুপার্থর মত সেও জানে। তিনটে শাড়ি থাকা মানে সেখানে বড়োমানুষী। গাঁয়ের দরিদ্রতম মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সমাজবদলের কাজ করতে হলে তাদের মাপে জীবনযাপন করতে হয়। বেমানান কিছু সেখানে চলবে না। রাস্তায় উজানির কাছে সে শুনেছে, তাদের বাড়িতে কলঘর দূরের কথা, পায়খানা পর্যন্ত নেই।

তাদের পাড়ায় কারো বাড়িতে নেই। শেষ রাতের অন্ধকারে, দূর থেকে যখন মানুষ চেনা যায় না, তখন মাঠঘাটে তাদের কাজ সারতে হয়। গাঁয়ের মেয়েদের এছাড়া উপায় কি? মা, ঠাকুমারও রাতের অন্ধকার থাকতে মাঠের ঝোপঝাড়ের আড়ালে সকালের কাজ সেরেছে। আজো সারে। উজানি বলেছিল হোস্টেলে থেকে তার এমন অভ্যেস হয়ে গেছে, ডেমরাতে এসে খুব অসুবিধে হয়। খোলা আকাশের নীচে ফাঁকা মাঠের মধ্যে এইসব কাজ সারতে গিয়ে মনে হয় কয়েক হাজার চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে। দেশগাঁয়ে সুবিধে হল, কেউ তাকায় না। তবু মনে হয়, প্রস্তরযুগে সে পড়ে আছে।

কুপির আলো কমে আসছে, হারিকেন নিভু নিভু। কেরোসিন বাড়ন্ত, বুঝতে জয়ার অসুবিধে হয় না। তখনই গণেশ বলল, কানাই-এর পরিবারের সকলে আজ রাতে ভাগাভাগি করে ছিরু আর চাকানের ঘরে থাকবে। কানাই ঘুমোবে এ বাড়ির দাওয়াতে। ছিরু, চাকান থাকবে আমার ভিটেতে। আজ বিয়ের রাতটা, কানাই-এর এই ঘর, কমরেড বিভু আর তার বউ-এর জন্যে ছেড়ে দেওয়া হবে। কেউ নারাজ আছো?

গণেশের প্রশ্নে সকলে যখন চুপ, সুপার্থ গাংনেগড়ে, যার পরিচয়, বিভু, বলল, আমি রাজি নই।

সুপার্থর কথাতে কিছুটা হতভম্ব হয়ে গণেশ বলল, কাল বৈঠকে এরকমই তো ঠিক হয়েছিল।

আজ সকালে হাওয়া বদলে গেছে। খবর আছে, আমার মনিব, মাঝরাতে ধানের গোলায় হঠাৎ হাজির হবে। আমার ওপর চৌকিদারি করতে মাঝে মাঝে এরকম করে। সকালে খবরটা আমার কানে দিল মনিবের খাসচাকর, ঝাড়ু। আমার চালচলন নাকি মুরারি ঘোষের বেখাপ্পা লাগছে। ঝাড়ু এই কদিনে খুব ন্যাওটা হয়ে গেছে আমার। ভুল খবর দেবে না। ফলে, মুরারির গোলার মাচানে আজ রাত না কাটিয়ে আমার উপায় নেই।

কানাই বলল, কঠিন ঝামেলা বটে।

মনের মধ্যে সদ্য জ্বলে ওঠা একটা আলো দপ করে নিভে গেলেও জয়ার পৃথিবী যে অন্ধকার হয়ে গেল এমন নয়। মুখ ম্লান করার মত কিছু ঘটেনি। ফুলশয্যার রাত কাটাতে সে এখানে আসেনি। স্বপ্নেও এ চিন্তা তার ছিল না। তবু বুকের মধ্যে এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া বয়ে যাওয়ার অনুভূতি হল তার। সুপার্থকে কিছুক্ষণের মধ্যে ধানের গোলায় ফিরতে হবে শুনে গণেশ, আফতাব, ছিরু, চাকান, কানাই, গোল হয়ে দাঁড়িয়ে যখন আলোচনা করছে, উজানিকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে জয়া জানাল, সে একটু ভাল করে হাতমুখ ধুতে চায়। শাড়ি ব্লাউজ বদলানোও দরকার। তাদের চাপাগলার কথা কারো কানে গেল না। তেল ফুরিয়ে আসা হ্যারিকেনের শিখা দপদপ করলেও উজানি সেটা তুলে নিয়ে জয়াকে বলল, চলো, পুকুর ঘাটে যাই!

উজানির সঙ্গে নিজের থলিটা নিয়ে জয়া যখন পুকুরঘাটে যাচ্ছে, শুধু সুপার্থ একবার তাকাল, অন্যরা, ঘরে ফেরার তোড়জোড় করেছে। কারো হাতে ঘড়ি ছিল না। আকাশের চাঁদ দেখে গণেশ বলল, একটা বাজতে দেরি নেই।

হাতের কাছে ঘড়ি থাকলে মিলিয়ে দেখা যেত, গণেশের আন্দাজে খুব বেশি দু-চার মিনিট হেরফের হয়েছে। পুকুরঘাটে ঘাট বলতে কিছু নেই। কয়েক খণ্ড তাল গাছের গুঁড়ি, সিঁড়ির মত জলের কাছাকাছি গিয়ে থমকে গেছে, তারপর দু-তিনটে কালো পাথর, সেই পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে দুহাতে জল নিয়ে হাত-মুখ-গলা, শরীরের যতটা সম্ভব ধুয়ে থলি থেকে গামছাটা উজানিকে বার করে দিতে বলল জয়া। গামছায় হাত মুখ মুছে তালের গুঁড়িতে পা রেখে সাবধানে পাড়ে উঠল। চারপাশ সতর্ক চোখে দেখে শাড়ি, ব্লাউজ, অন্তর্বাস বদলে, আবার সেই পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে ছাড়া পোশাক কাচল। গামছাটাও কেচে নিল। তেলের অভাবে হ্যারিকেন নিভে গেলেও চাঁদের আলোয় গুঁড়ো পানা ভর্তি পুকুর দেখা যাচ্ছে। পুকুরের ওপারে বাঁশবনে ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে জোনাকির ঝাঁক। অস্থির, উড়ন্ত আলো ছাড়া কিছু দেখতে পেল না সে। হাত মুখ ধুয়ে একটু আরাম পেলেও ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর। খানিক সময় বিশ্রাম দরকার। শাড়ির আঁচল পেতে কাত হয়ে শুলেও সে এখন ঘুমোতে পারে। খাটের ওপর নরম বিছানায় ঘুমোনোর অভ্যেস বিসর্জন দিয়েই সে এখানে এসেছে। স্বেচ্ছায় ফেলে আসা জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে তার বিন্দুমাত্র হাহুতাশ নেই।

ঘাট থেকে জয়ার ফেরার জন্যে সুপার্থ অপেক্ষা করছিল। গণেশ দাঁড়িয়ে ছিল তার পাশে। ছাগল, মুরগির ঘরের সামনে উবু হয়ে বসে আফতাব বিড়ি টানছিল। জয়াকে উঠোনের একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে সুপার্থ বলল, মনে রেখো, এখানে আমার নাম বিভু। তুমি প্রীতি। ডেমরার গরিব মানুষদের পাড়ার বাইরে যেয়ো না। কাল দুপুর নাগাদ আমি আসব। তোমার সঙ্গে কথা বলে তৈরি করব তোমার কাজের ছক।

কানাই মুর্মুর উঠোন ছেড়ে সুপার্থ, গণেশ, আফতাব বেরিয়ে যেতে বাড়িটা নিঝুম হয়ে গেল। ছিরু, চাকান আগেই চলে গেছে। উঠোনে জয়াকে ছেড়ে উজানি পুকুরে চলে গিয়েছিল চান করতে। হ্যারিকেন, দুটো কুপি নিভে গেলেও অন্ধকার উঠোনে চাঁদের আলো ছড়িয়ে রয়েছে। গরিব মানুষের সবচেয়ে বড় সুবিধে হল, খরা বন্যার মত সূর্য আর চাঁদের আলো, তাদের জড়িয়ে থাকে। দাওয়ার ওপর হাঁড়ি, কলসি, হাতা, খুন্তি, রান্নার সরঞ্জাম গুছিয়ে রাখছে উজানির মা। হাতের কাছে জিনিসগুলো তাকে জুগিয়ে দিচ্ছে মেজদি। উঠোনের মাঝখান ছেড়ে দাওয়ার কাছে গিয়ে জয়া দাঁড়াতে তাকে নজর করে উজানির মা বলল, তুমি ঘুমোতে যাওনা ক্যানে।

মেজদি বলল, চলো, তোমার শোয়ার জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে আসি।

জয়া বলল, উজানি আসুক, তারপর যাব।

উজানি ফিরেছিল, তার মায়ের হেঁসেলের কাজ শেষ হওয়ার আগে, পশ্চিম আকাশের চাঁদ তখন পুবের আকাশে হেলে গেছে।

চোদ্দো

পুরুষের সমান অধিকারের দাবিতে পৃথিবী জুড়ে মেয়েরা যে নারীবাদী সংগঠন গড়ে তুলেছে, দুবছর আগে চিনের রাজধানী বেজিং-এ তার আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতের সতেরো জন প্রতিনিধির মধ্যে জয়া ছিল। জয়াকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ছিল তিনজন। ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা, চিন সমেত, এশিয়া থেকে সেই সম্মেলনে যার হাজির ছিল, তাদের মধ্যে কোথাও উজানি বা তার দুই দিদি কুরচি, মহুলির মত কোনো মেয়েকে সে খুঁজে পায়নি। কুড়ি থেকে পঁচিশ বছরের মেয়ে কম ছিল না। সম্মেলনে পেশ করা হিসেব অনুযায়ী, সংখ্যায় তারা ছিল একশো সাতাশ। নতুন সময়ের লক্ষণ খুঁজতে বেশি করে তাদের দিকে জয়া শুধু তাকিয়েছিল। মেলামেশা, কথা বলা, আড্ডার জন্যে বেশিটা সময় কাটিয়েছিল তাদের সঙ্গে। সম্মেলন চলাকালীন আর বিরতিতে তাদের পাশাপাশি ছিল। পঁয়ত্রিশ বছর আগে গাংনেগড়ের ডেমরা আর আশপাশের গাঁয়ের যেসব মেয়েদের সঙ্গে প্রায় এক বছর কাটিয়েছে, নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেছে এবং দেখিয়েছে, তেমন একজনকেও খুঁজে পায়নি। খুঁজে পায়নি টালিগঞ্জের সিরিটি শ্মশানপাড়ার বস্তিবাসী ষাট পেরোনো কালিদাসীকে, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অজ পাড়াগাঁ থেকে কলকাতায় ঝি-গিরি করতে আসা সুজাতাকে। কালিদাসী ছিল তার রাঁধুনি। পাঁচ বাড়িতে রান্নার কাজ করে সংসার টানত সে। অসুস্থ কালিদাসীকে এক সকালে বাঙ্গুর হাসপাতালে তার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে দেখতে গিয়ে এক পলক নজর করে টের পেয়েছিল, মরে কাঠ হয়ে গেছে সে। কয়েক ঘণ্টা আগে মারা গেলেও চাদরে মৃতদেহ ঢাকতে হাসপাতাল কর্মীদের কেউ সময় পায়নি। কালিদাসীর বারো বছরের মেয়েটা, কাছ থেকে সম্ভবত আগে কখনো মৃত্যু দেখেনি। মা মারা গেছে বুঝতে না পেরে, বিছানার পাশে গিয়ে মায়ের থুতনি ধরে 'মা' 'মা' করে ডেকে, কিছু অনুমান করে আকাশ-ফাটানো কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা খুঁজে পায়নি জয়া। কথা আটকে গিয়েছিল তার। দুদিন আগে সকাল-সন্ধে রান্না করে সংসারের সাতজনকে যে খাইয়ে গেছে, আটচল্লিশ ঘণ্টা বাদে, হাসপাতালের মলিন বিছানায় সে মরে পড়ে থাকতে পারে,

জয়া ভাবতে পারেনি। আগের দিন কালিদাসী কাজে ডুব মারতে জয়া অসন্তুষ্ট হলেও এটা যে এদের স্বভাব সে জানে। কালই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে কালিদাসী জমা পড়েছে, তার ধারণায় ছিল না। মৃত কালিদাসীর পাশের বিছানার মাঝবয়সী রুগিটি, নির্বিকারভাবে মুড়ি চিবোতে চিবোতে বলেছিল, দুঘণ্টা আগে মাসি মরে গেছে। আমাদের মত আঁটকুড়ি মেয়েমানুষরা এভাবেই মরে। মুখে জল দেওয়ার কেউ থাকে না। সবই অদৃষ্টের লেখন!

কথাটা বলে, কানাতোলা অ্যালুমিনিয়ামের থালা থেকে সে আবার মুড়ি খেতে শুরু করেছিল। কালিদাসী মারা যাওয়ার ছমাস পরে এক দুপুরে, পাড়া যখন নিস্তব্ধ, বাড়ি প্রায় ফাঁকা, সুজাতা কাউকে না বলে, নিজের টিনের সুটকেস নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছিল। সে যে পালাবে, জয়া আঁচ করেছিল। বাজারের কমবয়সী সবজিওয়ালা থেকে শুরু করে পাড়ার একগণ্ডা জোয়ান সাইকেল-রিকশাচালকের সঙ্গে সে এমন ঢলাঢলি শুরু করেছিল, যা ডালে বসা চড়াই-এর ফুরুৎ করার আগের অবস্থা। জয়াকে একা পেলে পড়শিদের দু'একজন নিচু গলায় বলছিল, আপনার কাজের মেয়েটাকে সামলান। বাড়িতে ডাকাতি হয়ে যেতে পারে।

সুজাতা না বলে চলে গেলেও বাড়ি থেকে, নিজের জিনিসপত্র বাদে বাড়তি একটা কুটো নিয়ে যায়নি। সে যে চিরদিনের মত চলে গেছে, বিশ্বাস করতে জয়ার সাত দিন লেগেছিল। চেনা সবজি-বিক্রেতা, সাইকেল-রিকশওলাদের আলাদা ধরে, নানাভাবে জিজ্ঞেস করে সুজাতার হদিস না পেয়ে, থানায় জানিয়েছিল। তারপর খবর করেছিল সুন্দরবনের সেই প্রত্যন্ত গাঁয়ে, সুজাতার বাড়িতে। সুজাতার বাবা বাইরে উদ্বেগ দেখালেও সুজাতার মা বলেছিল, 'হাড় জুড়োলো।' জয়ার সংসারে সুজাতাকে যে কাজে ঢুকিয়েছিল, সে-ও এক ঠিকে-ঝি, শ্রীদেবী, সে-ই জানিয়েছিল সুজাতার মা-বাবার প্রতিক্রিয়া। তারপর দু'বছরে সুজাতার কোনো খবর জয়া পায়নি। খোঁজও করেনি বেশিদিন। দেশের নানা জায়গায় মানবীবাদীদের মঞ্চে, বেজিং-এ তাদের সম্মেলনে, পঁয়ত্রিশ বছর আগের উজানির সঙ্গে, গাংনেগড়ের মেয়ে-বউদের সঙ্গে অতি সম্প্রতি হারিয়ে-যাওয়া কালিদাসী, সুজাতাকে দেখার জন্যে নিরবচ্ছিন্ন প্রতীক্ষা করে ব্যর্থ হয়ে বুঝতে পেরেছে মেয়েদের মধ্যে দুটো ভাগ আছে—মানবী আর অবমানবী। তাদের পৃথিবী দুটো আলাদা, জীবনের কাছে তাদের প্রত্যাশাও আলাদা। মানবীবাদী মঞ্চে মেয়েদের দাবি আদায়ের জন্যে যারা ঝড় তোলে, তাদের সুটকেসে কয়েকডজন হালফ্যাশনের পোশাকের সঙ্গে সর্বোৎকৃষ্ট ঠোঁটপালিশ, নখরঞ্জনী আছে। পাঁচ-সাত জোড়া জুতো আছে। তাদের 'পার্সে' টাকার গোছার সঙ্গে কয়েকটা ক্রেডিট কার্ড, দামি 'কনডোম' আছে। তাদের আশিভাগ, পেটে পিঠে এক হয়ে যাওয়া লেংটি পরা পুরুষদের চেয়ে হাজার গুণ বেশি ক্ষমতা ধরে। সব থেকেও তাদের যা নেই, তা হচ্ছে উজানি, কালিদাসী, সুজাতার মত অবমানবীদের সঙ্গে পরিচয়। উজানি, কালিদাসীদের পৃথিবী থেকে হাজার মাইল দূরে তাদের অবস্থান। তাদের মানবীবাদী

তত্ত্ব, আসলে লিঙ্গপ্রভুত্বকামীদের পাঠানো উপঢৌকন কিনা, এ প্রশ্নও জয়ার মনে জাগে। পুরুষতন্ত্র বলে যদি কিছু থাকে, এই মানবীবাদীরা তাকে প্রতিপালন করছে। সে-ও পমেটমমার্কা এই মানবীবাদীদের একজন। বেজিং সম্মেলনে প্রতিনিধি যারা এসেছিল, তারাও তাই। উজানি, কালিদাসী, সুজাতাদের তারা কেউ নয়।

অন্ধকার ঘরে বিনিদ্র জয়ার জিব পর্যন্ত তেষ্টায় শুকিয়ে গেছে। সে টের পাচ্ছে, কাল সকালের সমাপ্তি অধিবেশনের ভাষণে, সে শুধু বুক চাপড়ে কাঁদতে পারে, তার বলার কিছু নেই। সমাপ্তি ভাষণে সে বলতে পারে, উজানি, কালিদাসী, সুজাতাদের মত হাজার, লক্ষ যত মেয়ে আজো আধপেটা খেয়ে না-খেয়ে এক কাপড়ে পুরুষছেঁচা হয়ে বেঁচে রয়েছে, তাদের বাঁচানো। সম্পূর্ণ মানবী হিসেবে তাদের আত্মপরিচয় রচনা এই মুহূর্তের প্রধান কাজ। তাদের সঙ্গে নিয়েই নির্মাণ করতে হবে এই কর্মসূচি। বাকি সব ভুয়ো, সুবিধেভাগী মেয়েগোষ্ঠির 'কার্নিভাল' আনন্দমেলা। এ প্রতারণা আমার আর সহ্য হচ্ছে না। মানবীবাদী তত্ত্বের ভণ্ডামি আমার গলা টিপে ধরছে, আমাকে বাঁচান।

পঁয়ত্রিশ বছর আগে এই কথাগুলো, একটু আলাদাভাবে সুপার্থ শুনিয়েছিল তাকে। বলেছিল, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষ প্রজাতির মুক্তির জন্যে আমাদের লড়াই। পুরুষদের সংগঠন আর মেয়েদের সংগঠন মিলে একটাই মুক্তিযুদ্ধের বাহিনী। আপাতত মেয়েদের বাহিনী গড়তে হবে তোমাকে। মানুষের মুক্তি, মানবিক সমাজের মুক্তি না ঘটলে আলাদা করে মেয়ে-পুরুষের অধিকার কায়েম করা যাবে না। পঁয়ত্রিশ বছর আগে লিঙ্গবৈষম্য নিয়ে এখনকার মত হইচই ছিল না। মেয়েদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায়, তাদের উদ্যোগে আলাদা মঞ্চ তৈরি হয়নি। তবে মেয়েদের অধিকারের প্রশ্নটা সামনে এসে গিয়েছিল। সুপার্থর সঙ্গে পরিচয়ের কিছুদিন পরে প্রশ্নটা জয়াই তুলেছিল। অন্যরকম এক ভবিষ্যতের স্বপ্নে সেই মুহূর্তে মশগুল সুপার্থ যখন তার কী হওয়া উচিত, বিপ্লবী, না কবি, কবি, না বিপ্লবী অথবা একসঙ্গে দুটো-ই, এরকম আত্মকথায় বিভোর হয়ে উঠেছে, জয়া প্রশ্ন করেছিল, আমি কী হতে চাই, এ প্রশ্ন তুমি একবারও করোনি। আমার কি কিছু হতে ইচ্ছে করে না?

অপ্রস্তুত হয়ে তার দিকে সুপার্থ তাকাতে জয়া বলেছিল, মেয়েদের এ প্রশ্নটা করার প্রয়োজন বোধ করে না কোনো পুরুষ।

মা-ঠাকুমারা কি জিজ্ঞেস করে?

না, করে না। মান্ধাতা আমল থেকে তাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে 'মাইয়া মানুষরা মানুষ নয়।' আমার বিধবা পিসি বাড়ির কচিকাঁচা মেয়েদের সামনে প্রায়-ই কথাটা বলত। চুপচাপ তারা শুনত। বুঝতে পারতাম, কথাটা তাদের মনে চিরকালের মত জমা পড়ে যাচ্ছে। পিসির থেকে একধাপ এগিয়ে তারা ভাবছে, যারা মানুষ নয়, তাদের কিছু হওয়ার আছে নাকি?

আলোচনাটা, সুপার্থ টানতে না চাইলেও টের পেয়েছিল, আর পাঁচটা মেয়ের চেয়ে জয়া আলাদা। সে শুধু কারো স্ত্রী, কিছু বাচ্চাকাচ্চার মা হতে জন্মায়নি। জীবনের কাছে তার যেমন অনেক প্রত্যাশা আছে, তেমনই দায়বদ্ধতা আছে। দায়টা তার অজানা নয়। জয়া তার প্রেমিকা হলেও মেয়েলবঙ্গলতা নয়। ঘাড় শক্ত করে পাওনা মর্যাদা সে আদায় করে নিতে জানে।

পঁয়ত্রিশ বছর পরে প্রায় মাঝরাতে ঘুমতাড়ানো চিন্তার জট খুলতে গিয়ে জয়া টের পায়, সুপার্থ যতটা আত্মসম্মান-সচেতন ভেবেছিল তাকে, সে তা ছিল না। তখনো সে ভীষণ নরম-সরম ছিল। অভিমানে চোখে জল এসে যেত। নানা বিধিনিষেধের মধ্যে মধ্যবিত্ত পরিবারে বড় হয়ে ওঠা কুড়ি, একুশের সেই মেয়েটার ব্যক্তিত্ব পুরো গড়ে ওঠেনি। সুপার্থর প্রায় সব নির্দেশ, বেদবাক্য ধরে নিত। মনে ধন্দ জাগলেও কদাচিৎ মুখে তা বলেছে। উজানির বন্ধু হিসেবে তার বাড়িতে গিয়ে, গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে যেখানে জয়ার মেলামেশা করা স্বাভাবিক ছিল, সেখানে প্রথম দু-তিন দিন গর্তের পোকার মত কানাই মুর্মুর বাড়িতে স্বেচ্ছাবন্দি থাকতে বাধ্য হয়েছিল। প্রথম রাত কাটানোর পরের সকালে, সেখানে সুপার্থ এসে এই পরামর্শ দিয়েছিল, পাড়া-বেড়াতে, এমনকী দিনের বেলা বাড়ি ছেড়ে বেরোতে বারণ করে বলেছিল, গোপন সংগঠন গড়ার এটাই নিয়ম। ময়লা আটহাতি ধুতি, ফুটো গেঞ্জি, মাথায় তেলচিটে পুরনো গামছা জড়িয়ে কৃষিমজুরের বেশে সুপার্থ এলেও, দাড়িবোঝাই তার মুখ-চোখ-নাক-ক্লিষ্ট অথচ জ্বলজ্বলে চোখদুটো দেখে যে কেউ বলে দিতে পারত, গরিব আদিবাসী চাষি পরিবারের সন্তান সে নয়। গণেশ বাউরির মত ফরসা না হলেও তার মুখের গঠন ছিল অনেক বেশি তীক্ষ্ণ আর সপ্রতিভ। কাকের বাসায় কোকিলছানা ভেবে তাকে নিজের খামারে মজুরের কাজ দিয়েছিল জোতদার মুরারি ঘোষ। মুরারি জানত, সুপার্থর মতো দুচারজন প্রাণী, সমস্ত সমাজের আনাচেকানাচে পাওয়া যায়। বাউরি বংশের সন্তান, সুপুরুষ গণেশের জন্মপরিচয় নিয়ে এলাকায় বিস্তর গোপন কানাকানি রয়েছে, ডেমরায় আসার মাসখানেকের মধ্যে জয়া জেনে গিয়েছিল। গণেশের জন্মবৃত্তান্তে মুরারিও ছিল এক অনিবার্য চরিত্র। গণেশের তদ্বিরেই তার মতো সুপার্থকে বিরল প্রজাতির এক জীব ধরে নিয়ে, তাকে নিজের খামারগোলাতে রক্ত-জল করা মেহনতের কাজে মুরারি ঢুকিয়ে নিয়েছিল। সুপার্থর ওপর নজরদারি করতে লোক রেখেছিল। সুপার্থর নির্দেশে সারা দিন বাড়ির অবরোধে কাটিয়ে রাতে নিশাচর প্রাণীর মত জয়ার পুকুরে যাওয়া, দাওয়ায়, উঠোনে এসে দাঁড়ানো, গল্প করা নিয়ম হয়ে যাচ্ছিল। দু-তিন দিনের বেশি, সেই নিয়ম মেনে চলা জয়ার পক্ষে সম্ভব হয়নি। উজানি প্রায় জোর করে ঘরের বাইরে তাকে নিয়ে গিয়ে, স্কুলের বন্ধুকে পড়শিদের দেখিয়ে, সাত পাড়া ঘুরে বেড়িয়েছিল। উজানির কথাতে কেউ অবিশ্বাস করেনি। শহরের ফরসা মেয়েটাকে সাদরে আপ্যায়ন করেছিল গরিব আদিবাসী পাড়ার

কালো মেয়েরা, তাদের মা-বাবারা। কেউ এনে দিয়েছিল পেয়ারা, কেউ দিয়েছিল আধপাকা পেঁপে, শাড়ির আচলে মুড়ি বেঁধে দিয়েছিল কোনো সাঁওতাল মা। খোলা আকাশের নীচে ঘুরে বেড়ানো, মানুষের সঙ্গে মেলামেশাতে যে এত আরাম, জয়া সেই প্রথম টের পেয়েছিল। তার মনে হয়েছিল, এটাই স্বাভাবিক। স্কুলের বন্ধুর বিয়েতে মজা করতে এসে একজন শহুরে মেয়ে কেন ঘরে লুকিয়ে থাকবে? বরং বাড়তি উৎসাহ নিয়ে সে আদিবাসী পাড়ায় ঘুরবে, তাদের ঘরকন্না দেখবে, বন্ধুর মা-বাবা আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবে, যত আনন্দ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবে, তা না করলে বেড়াতে আসা কেন? কানাই মুর্মুর বাড়িতে তার আসার খবর পাড়ায় জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। তাকে দেখতে চাইছিল সকলে। দুদিন সে বাড়ি ছেড়ে না বেরোনোতে গাঁয়ের মানুষকে উজানি বলেছিল, হেঁটে আসার ধকলে আমার বন্ধুর পায়ে এত ব্যথা হয়েছে যে, বাড়ি ছেড়ে সে নড়তে পারছে না।

উজানির কথা, তাদের অন্যায্য মনে হয়নি। উজানির সঙ্গে যে বাড়িতে সে গেছে, সেখানে মেয়ে বউদের প্রথম প্রশ্ন ছিল, তার পায়ের ব্যথা কমেছে কিনা। বাড়ি থেকে বেরোনোর আরো একটা উপকার হাতেনাতে সে পেয়েছিল। কথাটা গোপন, কিছুটা লজ্জারও বটে। কাউকে বলেনি, এমনকি সুপার্থকেও নয়। রূঢ় বাস্তব সেই কথা শুধু নিজের ভেতরে রাখতে হয়। গরিবের চেয়ে গরিব কানাই মুর্মুর সংসারে সকাল, সন্ধে খাবার বলতে জুটছিল, এক গামলা গরম ফেনের মধ্যে ডুবে থাকা এক মুঠো ভাত, সঙ্গে এক চিমটি নুন। লংকা-পেঁয়াজের বালাই ছিল না। সংসারে সকলে, এমনকী শিশুরা পর্যন্ত হাপুসহুপুস করে তা খেয়ে নিচ্ছিল। সকাল-সন্ধের এই খাওয়ার মাঝখানে একমুঠো চালভাজা কিংবা মুড়ি, শিশুরা কখনো পেত, কখনো পেত না। ভাতের সঙ্গে মেটে আলু, থলকলমি-শাক, এক-আধদিন জুটলেও, সেসব বস্তুও সহজলভ্য ছিল না। আধপেটা খেয়ে, উপোস করে হাজার হাজার মানুষ যেখানে বেঁচে থাকে, সেখানে খাদ্যাখাদ্যের জ্ঞান যেমন লোপ পায়, তেমনি মাঠে-ঘাটে জন্মানো শাকপাতা, পুকুর, ডোবার গেঁড়িগুগলি পর্যন্ত, পুষ্ট হওয়ার আগেই লোপাট হয়ে যায়। পেটের লুকোনো খিদে চেপে রেখে জয়া বুঝে গিয়েছিল, কানাই মুর্মুর বাড়ি থেকে দিনে এক-দুবার না বেরোলে, বাড়তি খাবার, তা যাই হোক, জোটানো যাবে না। বেশিরভাগ সময়ে তার সঙ্গে থাকত উজানি। তার বিয়ের দিন যত এগিয়ে আসছিল, পাড়ায় তত বাড়ছিল তার খাতির। খাতির পেলেও সব বাড়িতে খাওয়া জুটছিল, এমন নয়। গাঁ-সুদ্ধু সকলে যেখানে আধপেটা খেয়ে রয়েছে, সব ঘরে অন্নের জন্যে নীরব হাহাকার, সেখানে গাঁয়ের সবচেয়ে লেখাপড়া-জানা, গাঁ ছেড়ে অন্য গাঁয়ে, অচেনা সংসারে পা বাড়ানো মেয়েটাব জন্যে অগাধ স্নেহ থাকলেও কিছু খেতে দেওয়ার সামর্থ্য প্রায় কারো থাকত না। তার মধ্যে কোনো সাঁওতাল কিশোরী, জোতদারের

বাগান থেকে চুরি করে আনা কাঁচা পেপে টুকরো করে, নুন মাখিয়ে উজানিকে খেতে দিলে জয়াও ভাগ পেত। আস্ত একটা পোড়া আলু, ডেমরায় প্রায় এক মাস বাদে নুনের টাকনা দিয়ে খেয়ে অমৃতের স্বাদ পেয়েছিল সে। আলু খাওয়ার জন্যে বুকের ভেতরটা কখনো-সখনো লোলুপ হয় উঠলে সে ধমকাত নিজেকে, মনকে শান্ত করতে বলত, আমি তো আরামেই থাকতে পারতাম, কৃষকদের মুক্তিসংগ্রামে জায়গা করে নিতে আমার এখানে আসা, আলুসেদ্ধ খাওয়ার জন্যে ভিখিরিপনা করা আমার সাজে না।

মনের ভেতরটা ধীরে ধীরে জুড়িয়ে গেলে আবার কয়েকদিন আগ্রহ নিয়ে একগামলা ফেনের ভেতর থেকে কয়েক কণা ভাত-খুঁটে খেয়ে, ঢকঢক করে নুন মেশানো ফেন গিলে নিত। গরিব কৃষকের ঘরে, তার ঘাড় ভেঙে দুবেলা ফেনভাত খেতেও তখন অপরাধবোধ জাগত, তা পীড়িত করত তাকে। কানাই মুর্মুর পরিবারে, তার মেয়ের বন্ধুর পরিচয়ে এসে, গাঁয়ের মধ্যে অথবা গাঁ ছেড়ে বাইরে গিয়ে, কামিনের কাজ করে দু-চার টাকা রোজগারের ধান্দা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তবু সে কাজ করার চিন্তা, করতে শুরু করেছিল। অপেক্ষা করছিল, স্বামীর ঘরে উজানির যাওয়ার জন্যে। উজানির বিয়ের দিনও এগিয়ে এসেছে। একটু একটু করে বিয়ের ভোজের জোগাড় করছে কানাই। বাজার খুঁজে তার আনা, সবচেয়ে শস্তার কয়েক ঝুড়ি আলু থেকে উজানির মা কিছু সরিয়ে রেখে রোজ একটা করে পুড়িয়ে বাড়ির মেয়েদের, আধখানা, কচিকাঁচা সমেত এক ছেলেকে গোটা আলু দিতে শুরু করেছিল। পরিবারে উৎসবের আবহাওয়া লেগে গিয়েছিল সেই থেকে। কানাই-এর ঘরে, প্রায় রোজ, সকালে অথবা একটু রাত করে সুপার্থ যাতায়াত করছিল। উজানির বন্ধু হিসেবে গাঁয়ের মানুষ মেনে নিয়েছে জয়াকে, তার সঙ্গে কথা বলে, তার গান শুনে মেয়েরা আনন্দ পাচ্ছে, নিজেদের ঘরের মানুষ ভাবছে, জেনে সুপার্থ খুশি হয়েছিল। জয়াকে বলেছিল, চালিয়ে যাও।

কবিতা লিখছ?

জয়া প্রশ্ন করতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল সুপার্থ। বলেছিল, লিখছি, খুব কম, বেশিরভাগ পছন্দ হচ্ছে না। কবিতার খাতাটাও শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু হাজার বছর ধরে মনের মধ্যে আগলে রাখা সেই অসাধারণ কবিতাটা, সেটা এখনো লেখা হল না। সে লেখাটা লিখে ফেললে, কবিতা লেখা আমি ছেড়ে দেব। আমি অপেক্ষা করে আছি, বেঁচে আছি সেই কবিতার জন্মের জন্যে। সেটা লেখা হয়ে গেলে আমার নিলামের বাজনা আমি বাজিয়ে দেব। বলব, আমিই সুখী, এ পৃথিবীতে, আর কেউ নয়।

কবিতার কথা উঠলে সুপার্থ গ্রহান্তরের মানুষ হয়ে যায়, জয়া জানত। সে বলল, নতুন কী লিখেছ, দু-এক লাইন শোনাও। জয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে, এক মুহূর্ত ভেবে বলেছিল,

ও যাবে আজ যাবেই যাবে দরবেশেরই পিছে পিছে
শহর থেকে দূরের পথে।
ও যাবে আজ যাবেই যাবে গ্রামের বুকে বাউল সেজে
ন্যাংটা ছেলের আগে আগে।...

চারটে লাইন বলে সুপার্থ চুপ করে যেতে জয়া জিজ্ঞেস করল, তারপর?

মনে পড়ছে না।

কয়েক সেকেন্ড স্তব্ধ হয়ে বলল, অন্য একটা কবিতার দুটো লাইন শোনাচ্ছি

অতর্কিতে মিনারের ভিত ওঠে টলে
চোখে চোখে প্রশ্ন ঘোরে, এ কোন নতুন শক্তি এল?

কানাই মুর্মুর বাড়ির পেছনে পুকুরের ধারে ঢ্যাঙা এক নিম গাছের তলায় বসেছিল দু'জন। কৃষ্ণপক্ষ শুরু হয়ে গেলেও চাঁদ ছিল আকাশে। সম্ভবত পঞ্চমীর চাঁদ আলো ছড়াচ্ছিল নির্জন পুকুরপাড়ে। জয়াকে সুপার্থ বলল, তোমার সিঁথির সিঁদুর একদম ফিকে হয়ে গেছে। ওটা ধরে রেখো। গাঁয়ের মানুষের, বিশেষ করে বিবাহিতা বয়স্কা মহিলাদের নজর কিন্তু টনটনে।

সিঁথিতে সিঁদুর কতটা আছে, না আছে, দেখতে হলে আয়না দরকার। কানাই-এর ঘরে আয়না নেই। উজানির একটা আছে সে সকাল-সন্ধে চুল বাঁধার সময়ে, নিজের টিনের প্যাঁটরা খুলে কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো, এক বিঘত লম্বা আয়নাটা বার করে সামনে রাখে। কাজ হয়ে গেলে প্যাঁটরাতে রেখে দেয়। তার কাছ থেকে আয়না চেয়ে সিঁথিতে সিঁদুর আছে কিনা, দেখার কথা জয়া একবারও ভাবেনি। সুপার্থ জিজ্ঞেস করল, গাঁয়ের বুড়িরা কেউ জানতে চায়নি, তোমার স্বামী কোথায়, সে কী করে?

করেছিল। ডেমরার পাশের গাঁয়ের এক মাসিমা, উজানি 'মাসিমা' বলে তাকে, বলেছিল, 'স্বামীকে আনলে পারতে, সেও দেখত উজানির বিয়ে।' আমি বলেছি, সে চাকরি করে, ছুটি নেই।

জয়ার কথা শুনে সুপার্থ খুশি হয়ে বলল, এবার কাজ শুরু করা দরকার। প্রথম কাজ, 'দৃষ্টান্ত স্থাপন'।

বিষয়টা পরিষ্কার করে জয়া বুঝতে চাইতে সুপার্থ বলল, বিন্দু ভাঙলেই শুরু হয়ে যাবে দৃষ্টান্ত স্থাপনের কাজ। বিন্দু ভাঙা মানে, 'গেরিলা স্কোয়াড' নিয়ে এলাকার একজন অত্যাচারী জোতদারকে 'খতম' করতে হবে। বিন্দু ভেঙে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করলে, বিন্দুভাঙার মহোৎসব লেগে যাবে। নিজের উদ্যোগে গরিব কৃষক তখন ঝাঁপিয়ে পড়বে বিন্দু ভাঙার কাজে। পাঁচ-সাতটা জোতদার, জমিদারের লাশ পড়ে গেলে, প্রাণের ভয়ে দেশ-গাঁ ছেড়ে তারা পালাবে। গাঁয়ে যারা থেকে যাবে, তারা মেনে নেবে আমাদের কর্মসূচি।

এক মুহূর্ত থেমে সুপার্থ বলল, মেয়েদের 'স্কোয়াড্‌টা' আগে সাজিয়ে নাও।

সুপার্থর কথার মাঝখানে জয়া বলল, আগে চাই রাজনৈতিক সচেতনতা, সেটা তৈরি না হলে, কাজটা ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়ার মত।

পুরো কথা তাকে বলতে না দিয়ে সুপার্থ বলল, চাপিয়ে দেওয়ার কথা আসছে কোথা থেকে? কীভাবে জানলে এই মেয়েগুলো সচেতন নয়? আত্মবাদী এসব চিন্তা! মাথায় রেখ, তোমার নিজের মধ্যবিত্তসুলভ আত্মরক্ষার চিন্তা ওদের কাছে যেন না পৌঁছোয়!

সুপার্থর গলা থেকে বিরক্তি ঝরে পড়ছিল। জয়ার পাশ থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল সে।

জয়া বলতে চাইছিল, আমার ওপর খতম, 'অ্যানিহিলেশন'-এর লাইন, তুমিও তো চাপিয়ে দিচ্ছ, কথাটা সে বলতে পারল না। ভালবাসায় ভরপুর নরম মনের এক তরুণী সেই রাতে জোর ধাক্কা খেয়েছিল। কান্নায় বুজে গিয়েছিল তার গলা। দিনের আলো থাকলে সুপার্থ দেখতে পেত, জয়ার দু'চোখ জলে ভরে গেছে। প্রায় নিঃশব্দে সে মেনে নিয়েছিল দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্যে বিন্দু ভাঙার, অর্থাৎ জোতদার খতমের কর্মসূচি। কাজে নেমে পড়েছিল পরের দিন থেকে। সত্যিকথা বলতে কি, পনেরো দিন আগে যে সঙ্কল্প নিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল, সেই রাতে কানাই-এর ঘরে পৌঁছোনোর পর থেকে, তার মাথাতে তা ক্রমাগত ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। মুহূর্তের জন্যে ভোলেনি, সুপার্থর পরামর্শে দুদিন নিজেকে কানাই-এর ঘরে আড়ালে রাখার পরে, উজানির ডাকে যখন প্রথমে তাদের গাঁ, এবং কয়েকদিন পরে বেদেডাঙা, গোপালপুর, আনারসোল এবং এরকম কিছু আদিবাসী পাড়ায় ঘুরতে গেছে, সব জায়গাতে তিন চারজন মেয়েকে নিয়ে গল্প-গুজব করতে বসে। তাদের মাথায় ঠেসে দিয়েছে সমাজরূপান্তরের তত্ত্ব। যতটা সম্ভব সহজ করে শুনিয়েছে, কীভাবে সমাজটা বদলানো যায়। ঘটনাটা একতরফা নয়। শ্রোতারা চুপ করে থাকেনি। তারা কথা বলেছে, হাজির করেছে নানা প্রশ্ন। ডেমরা গ্রামের ঘেঁষাঘেঁষি, এই গাঁগুলোতে যেসব মেয়েদের সঙ্গে সে কথা বলেছে, যাদের গান শুনেছে আর নিজে গেয়ে শুনিয়েছে, প্রায় সকলে তার সমবয়সী, কিছু বেশি বয়সের মেয়ে, এক দঙ্গল শিশু, দু-এক জায়গায় হাজির থাকত। তার কথকতা যারা বুঝতে পারত না, তারা হাঁ করে তাকিয়ে থাকত তার মুখের দিকে। 'এরোপ্লেন' দেখার মতো অবাক হয়ে তাকে দেখত।

'গেরিলা স্কোয়াড' তৈরির চিন্তা মাথায় না থাকলেও প্রথম দিন থেকেই কোন মেয়েকে দিয়ে সংগঠন হবে, জয়া নজর রাখতে শুরু করেছিল। প্রশ্নাকুল চোখ, উত্তেজিত মুখ, গণ্ডূষে শুষে নিতে চায় জ্ঞানের সরোবর, সংখ্যায় এরা কম হলেও এক-দুজন এই গোত্রের মেয়ের দেখা সব গাঁয়েই পাচ্ছিল। মনে রাখছিল তাদের নাম। চরম অভাবের মধ্যে বড় হলেও কৌতূহলী, চটপটে, বুদ্ধিমতী এই মেয়েরা সংগঠিত হলে অনেক কিছু উল্টেপাল্টে দিতে পারে। দৃষ্টান্ত স্থাপন, আর বিন্দু

ভাঙার কর্মসূচি, বোঝাতে উজানি, তার দিদি মঙ্গলি এবং আরো চারজন মেয়ে নিয়ে এক রাতে কানাই-এর বাড়ির পেছনে নিমগাছের নীচে আলোচনায় বসল জয়া। অমাবস্যার রাত ছিল সেটা। আগের দিনও হতে পারে। কোনো এক পরব ছিল পরের দিন। সাতগাঁয়ের ছেলেমেয়েরা, পরবের আগের রাতে, সবচেয়ে কাছের গ্রাম আনারসোলে নাচগানে মেতে ছিল। আসর শুরুর কিছু পরেই চার সখিকে নিয়ে নিজেদের বাড়ির পেছনে চলে এসেছিল উজানি। বন্ধুদের সঙ্গে সেভাবে কথা বলে রেখেছিল। তাদের জন্যে মঙ্গলিকে নিয়ে জয়া অপেক্ষা করছিল ঘাটের ধারে। উজানিকে এই ক'দিনে জয়া চ্যালা বানিয়ে ফেলেছিল। জয়ার সঙ্গে আঠার মত আটকে থাকত সে। বলতে শুরু করেছিল, তোকে ছেড়ে কয়েকদিন পরে স্বামীর ঘর করতে যেতে হবে। খুউব মন খারাপ লাগবে, তোকে ছেড়ে থাকতে। প্রীতিদিদি, তুই মনে রাখবি তো আমাকে?

উজানির প্রশ্নে জয়ার বুকের ভেতরটা আনচান করে উঠলেও রহস্য করে সে বলত, তোর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হবে না। তোর স্বামীর ঘরে আমি পৌঁছে যাব।

সত্যি?

হ্যাঁ।

উজানিকে আশ্বস্ত করার আগেই তাকে 'স্কোয়াড লিডার' ঠিক করে ফেলেছিল জয়া। বাড়ির কাজ থেকে উজানি আর তার দুই দিদি ফুরসত পেলে, তিনজনকে নিয়ে জয়া আড্ডা শুরু করত। ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই থেকে মাতঙ্গিনী হাজরা, কাকদ্বীপের অহল্যা, এমনকী ফরাসি দেশের জোয়ান অব আর্কের গল্প শুনিয়ে, উদ্দীপ্ত করে তুলত তাদের। উজানি বলত, হায়রে, যদি এনাদের নখের যুগ্যি হতে পারতাম!

উজানি জানত না, তাকে আদিবাসী এলাকার নেত্রী বলা যায়, তাকে কৃষ্ণাঙ্গিনী জোয়ান অব আর্ক গড়ার কারিগরের ভূমিকা, জয়া আগে থেকেই নিয়ে বসে আছে। উজানিকে জয়া তা কখনো বলেনি। শুধু কয়লার আগুনে গুঁজে দেওয়া লোহার শিকের মত তাতিয়ে লাল করে তুলছিল তাকে। দৃষ্টান্ত স্থাপনের কাজে সে-ই যে নেতৃত্ব দেবে, এ নিয়ে জয়ার সন্দেহ ছিল না। উজানির মধ্যে নেত্রী হওয়ার যাবতীয় গুণ, সে দেখতে পেয়েছিল। পরবের আগের রাতে ছয় সঙ্গিনীকে বিন্দু ভাঙার তাৎপর্য বোঝাতে জয়া ডেকে নিয়েছিল। ধামসা আর মাদলের আওয়াজ ভেসে আসছে পাশের গাঁ আনারসোল থেকে। নাচগান জমে উঠেছে, মাদলের বোল শুনে বোঝা যাচ্ছিল, নাচের আগে ছেলেমেয়েরা এক প্রস্থ হাঁড়িয়া খেয়ে নিয়েছে। নাচের মাঝখানে আর নাচের শেষেও খাবে। তারপর শুরু হবে নৈশভোজ, পাঁচতারা হোটেলে যাকে বলে, ক্যান্ডেললাইট ডিনার, অনেকটা সেরকম। মোমবাতির বদলে আলো ছড়াবে খুব বেশি হলে দুটো কেরোসিন কুপি।

ছেলেমেয়েদের হল্লা আর ফস্টিনস্টি চলবে বেশি কিছুক্ষণ। তার মধ্যে তেলের অভাবে কুপি দুটো যখন নিভে যায়, কেউ খেয়াল করে না। টের পায় না আলোর অভাব। বাড়ি ফিরতে মাঝরাত হয়ে গেলেও তাদের জন্যে দুশ্চিন্তায় অভিভাবকরা জেগে থাকে না। ভোঁসভোঁস করে তারা ঘুমোয়। ঘুমনোর আগে হয়তো এক মুহূর্ত ভাবে, বয়সকালে তারাও কম ফুর্তি করেনি। কী দিন গেছে তাদের! নিমগাছের নীচে প্রগাঢ় অন্ধকারে ছয় সঙ্গিনীকে আলোচনায় জয়া জড়িয়ে দিল। বলা যায়, তাদের মগজে জমিয়ে রাখা অব্যক্ত চিন্তাগুলোকে উসকে দিতে, যথাসম্ভব সহজ ভাষায় শ্রেণীশত্রু খতমের বিষয়টা পেড়ে দিয়ে শ্রোতা বনে গেল সে। মহুলি, যাকে সকলে, এমন কী জয়াও 'মেজদি' বলে, সে এমন কিছু কথা বলতে শুরু করল, যা এই জীবনে কখনো সে বলেনি, বলতে পারে, জানত না। প্রকৃতির নিভৃত কোনো উৎস থেকে, ঝরনার স্রোতের মত তার কথাগুলো গড়িয়ে পড়তে থাকল। রীতিমতো অবাক হয়ে জয়া শুনছিল মেজদির কথকতা। মেজদি বলছিল, আমরা বহুৎ সময় ধরে কষ্ট করে আসছি। মানুষকে খাইয়ে, পরিয়ে, বাঁচিয়ে রেখে, তার বদলে আমরা পাই শুধু অপমান। দিনের পর দিন উপোস করে থাকতে হয় আমাদের। খিদে আর অপমান থেকে আমাদের বাঁচতে হলে, যারা আমাদের এই দুর্দশার জন্যে দায়ী, তাদের হঠাতে হবে।

কি করে হটাবি?

মেজদির কথার মধ্যে উজানি প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিতে এক সেকেন্ড থতমত খেয়ে সে বলল, এই প্রীতিদিদি বলল, বিন্দু ভাঙতে হবে।

বিন্দু ভাঙার মানে তুই বুঝেছিস?

হ্যাঁ, মেরে ফেলতে হবে।

কাকে মারবি, দাদুকে? সত্যি বল তো, দাদুকে তোর মারতে ইচ্ছে করবে?

ডেমরায় জোতদার বলতে বোঝায়, বাসুদেব ঘোষকে। গাংনেগড়ের এক নম্বর জোতদার, মুরারি ঘোষের মামা, সত্তর পেরনো বাসুদেবকে আদিবাসী গাঁয়ের ছেলেমেয়েরাও 'দাদু' বলে ডাকে। বাসুদেবের ভাইপো, সুনীল ঘোষ আবার পাশের আনারসোল গ্রামের বিত্তবান জোতদার। রঘুনিগঞ্জের কয়লাখনিতে তার 'শেয়ার' আছে। দাদুর সেই ভাইপো সুনীলকে ডেমরার ছেলেমেয়েরা 'কাকু' বলে। মেজদিকে উজানি তখনো খুঁচিয়ে যাচ্ছিল, কাল সকালে দাদু যখন কুমড়োর মাচা দেখতে পুকুরপাড়ে আসবে, তখন তাকে মারতে পারবি, হাত উঠবে তোর?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মেজদি বলল, ওরা বড়োলোক, ওরা অত্যাচার করে, তাদের জন্যে আমাদের এত দুঃখকষ্ট, এটা তো ঠিক?

মেনে নিলাম।

তাহলে?

তাহলে, আর যাই হোক, শুধু দাদুকে মেরে ফেললে আমাদের কষ্ট শেষ হবে

না। দাদুর ছেলেরা আছে, ভাই-ভাইপো আছে, দাদুর অবর্তমানে কত দাদু যে গজিয়ে উঠবে, বলা মুশকিল। জমির মালিকানা তাদের হাতেই থেকে যাবে। আমাদের দুখ ঘুচবে না।

বিন্দু ভাঙা নিয়ে দুই বোন যে এমন বিতর্ক তুলতে পারে জয়ার ধারণা ছিল না। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে কারো মুখ দেখা না গেলেও সকলে কান খাড়া করে দুই বোনের বিতর্ক শুনছে, জয়া টের পেল। ধামসার ধ্বনি ভেসে আসছে পাশের অন্ধকার গ্রাম থেকে। আরো এক খেপ, নাচ গানের আসর শুরু হচ্ছে। জয়াকে ঈষৎ ঠেস দিয়ে উজানি বলল, দেখ, মেজদি, তোর দুখু, কষ্ট তোর-ই। কারো শেখানো বুলি বলবি না, মনের ভেতর থেকে সায় না পেলে কোনো কাজ করবি না। খুন করতে তুই কি মনের ভেতর থেকে সাড়া পাবি? খুন না হয় করলি, বিন্দু ভাঙা হল, তারপর? ঝড়ঝাপটা যা আসবে, সামলাতে পারবি? দুজায়গায় যাদের ঘর আছে, তারা এক বাড়ি ছেড়ে আর এক বাড়িতে চলে যাবে। তুই, আমি তা পারব না, আমাদের একটাই ঘর। ডেমরার এই ঘর ছেড়ে নড়ার উপায় আমাদের নেই। আনারসোলের সজিনা, বেদেপাড়ার চাঁদমণি, ইলাচিদেরও নেই। পুলিস এসে আমাদের তছনছ করে দিলে কে বাঁচাবে?

যাকে নেত্রী, গেরিলা স্কোয়াডের 'কম্যান্ডার' বানিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপনের দায়িত্ব দেওয়ার চিন্তা জয়া করছিল, সেই উজানির সরাসরি অভিমতে জয়া থতমত খেয়ে গেল। উজানির কথাতে যুক্তি আছে, চোখা যুক্তি, যা অগ্রাহ্য করা যায় না। বিন্দু ভাঙার কাজ যে ভেস্তে যেতে চলেছে, জয়া ভাল করে টের পাচ্ছিল। দেশের নানা জায়গায় এতো জোতদার, মহাজন, শ্রেণীশত্রু তাহলে কীভাবে খতম হচ্ছে? 'অ্যানিহিলেশন' বা খতমতত্ত্ব যে বিশ্ববিপ্লবের যুগে সর্বোচ্চ গণকর্মপন্থা হিসেবে নির্ধারিত হল, তারই বা ভিত্তি কী? উজানির ধারালো সওয়ালের সামনে জয়া কিছুটা বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। ভাবছিল, উজানির মতো সারা দেশের গরিব কৃষক যদি একই সুরে কথা বলে, একরকম যুক্তি দেখায়, তাহলে গ্রামাঞ্চলে একের পর এক জোতদার খতম, খতমের কর্মসূচি চলছে কী করে? কারা চালাচ্ছে? দিশাহারা জয়ার মনে হল তার রাজনীতির জ্ঞান অতীব কম, গ্রামের গরিব কৃষক পরিবারের মেয়েদের সংগঠিত করার মত যোগ্যতা তার নেই।

আনারসোল, বেদেপাড়ার চারজন মেয়ের কেউ, নিঃশব্দে এত আলোচনা শুনেও মুখ খুলল না। অন্ধকার গাছতলা ছেড়ে উঠার জন্যে তারা উসখুস করছিল। উজানি কিছু অনুমান করে তাদের বলল, মাদল শুনে মরদের জন্যে মন ছটফট করছে, বুঝতে পারছি। তোরা যা। মেলায় কাল দেখা হবে।

দ্বিতীয়বার তাদের বলতে হল না। অমাবস্যার অন্ধকারে নিকষ কালো বাতাসের সঙ্গে তারা মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। চারজোড়া পায়ের আওয়াজ যতক্ষণ শোনা যায়, বাতাসে ভাসতে শুনল জয়া।

রাতে, তালপাতার চ্যাটাই-এ জয়ার পাশে শুয়ে উজানি বলল, প্রীতিদিদি, আমার কথাগুলো শুনে তুই খুব কষ্ট পেয়েছিস জানি। কিন্তু না বলে আমার পথ ছিল না। কয়েকদিন পরে, আমার বিয়ে, তুই জানিস, বিয়েটা কেন আটকাতে চাইছিস? কিছু মনে নিস না, একটা কথা বলি, তোদের এইসব কাজ, 'দৃষ্টান্ত স্থাপন', 'বিন্দু ভাঙা', 'খতম', 'অ্যানিহিলেশন' আমাদের, মানে গরিব চাষাভুষোদের উপোস, অপমান থেকে মুক্ত করার বদলে ক্ষতি করে দেবে। জয়ার গা ঘেঁসে, অন্ধকারে কিছুটা সরে এসে উজানি ফের বলল, পুরুষদের কথা বলতে পারব না, কিন্তু জেনে রাখিস, আমরা মেয়েরা হঠাৎ করে শুধু শুধু কাউকে মেরে ফেলতে পারি না। সেরকম চিন্তা করলেও কষ্ট হয়।

জয়া বলতে গেল, শুধু শুধু কেন! সমাজের বিকাশে, পথ আটকে যে লোকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাকে থামিয়ে উজানি বলল, তুই সত্যি করে বল তো প্রীতিদিন, তুই কি পারিস কাউকে নিজের হাতে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে?

উজানির প্রশ্নে জয়া গুটিয়ে গিয়েছিল। দৃষ্টান্ত স্থাপনের নামে নির্বিচারে জোতদার, মহাজন খতমের কর্মসূচি তারপক্ষেও গিলে নেওয়া সম্ভব ছিল না। ফুটন্ত সিসের মত সংশয় মনে চেপে রেখে সে ছটফট করছিল।

উজানির প্রশ্নের উত্তর এড়াতে বলেছিল, ঘুম পেয়েছে, আজ আর কথা নয়। তুই-ও ঘুমো।

পনেরো

দৃষ্টান্ত স্থাপনে, অন্তত একটা বিন্দু ভাঙার ঘটনা ঘটাতে জয়াকে সুপার্থ যেমন তাড়া দিচ্ছিল, তেমনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সে নিজে আরো বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তার প্রথম লক্ষ্য ছিল, নিজের মনিব মুরারি ঘোষকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া। মুরারিকে অ্যানিহিলেট অর্থাৎ খতম করতে পারলে সে খবর শুধু গাংনেগড় নয়, গোটা জেলায় দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়বে। প্রাণের ভয়ে নিজের নিজের এলাকা ছেড়ে পালাবে অত্যাচারী সামন্তপ্রভুরা। তাদের কানে এর মধ্যে পৌঁছে গেছে দেশের নানা অঞ্চলে জোতদার মহাজন খতমের বৃত্তান্ত। কাঁপুনি লেগে গেছে তাদের হাড়ে। গাংনেগড়ে সে ঢেউ এসে পৌঁছোলে কীভাবে তারা মোকাবিলা করবে, গোপনে এ নিয়ে শলাপরামর্শ শুরু করে দিয়েছিল। কানাঘুষোয় খবরটা শুনে গণেশ বাউরি জানিয়ে দিয়েছিল সুপার্থ, আফতাব, কানাই আর অন্য

সহকর্মীদের। বিন্দু ভাঙার জন্যে সুপার্থ প্রায় খেপে উঠলেও মেয়েদের 'স্কোয়াড' নিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যে সহজ হবে না, জয়া টের পেয়েছিল। মনের ভেতর থেকে যে নিজেও সায় পাচ্ছিল না। খতম মানে তো খুন, ব্যক্তিহত্যা। একজন বিপ্লবী কীভাবে মানুষ খুন করবে? বিপ্লবীও তো মানুষ, গভীরভাবে মানবিক! কৃষকদের দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার আগে ঘোচাতে হবে। আর কিছু না হোক, শুরুতে বাচ্চাদের নিয়ে খেলার আসর, 'স্পোর্টস' করা যায়, হুমলোকুমলোর বিল থেকে ভিজে এঁটেল মাটি, এনে তাদের মূর্তি বানানো, চুনাপাথর গুঁড়ো আর লাল মাটি গুলে, মাটির বাড়ির দেওয়ালে ছবি আঁকতে শেখানো যায়, তাদের মা, বোনদের স্লেট, পেনসিল দিয়ে সাক্ষর করার কর্মসূচি চালু করা কঠিন কাজ নয়, ভূমিসংস্কারের আন্দোলন, খেতমজুরদের মজুরি বাড়ানোর আন্দোলন, পানীয় জলের জন্যে গাঁয়ে টিউকল বসানো, স্বাস্থ্যকেন্দ্র করা, কৃষকদের সংগঠিত করতে কত কাজ যে জয়া ভেবে রেখেছিল, তার হিসেব নেই। গরিব চাষিদের পাশে থেকে এ কাজগুলো করতে পারলে, হুহু করে গাঁয়ে সংগঠন বাড়বে, জনকল্যাণের কাজের মধ্যে দিয়ে মানুষের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সুযোগ পাবে, শহর থেকে আসা মধ্যবিত্ত সংগঠক। তার বদলে বিন্দু ভাঙা, শুধু জোতদার খতমের কর্মসূচি রূপায়ণ ছাড়া সুপার্থ আর কোনো কাজের কথা বলছে না। বিন্দু ভাঙলেই নাকি প্রথমে গেরিলা বাহিনী, তারপর সশস্ত্র মুক্তিসেনাবাহিনী গড়ে উঠবে, পাঁচ বছরে পাল্টে যাবে দেশের হাল, নতুন ভারত আত্মপ্রকাশ করবে। সংগঠন সম্পর্কে তার ধারণাকে সুপার্থ মধ্যবিত্ত পাতিবুর্জোয়ার গা-বাঁচানো মতবাদ বলে চিহ্নিত করে নস্যাৎ করে দিয়েছে। সুপার্থর ব্যাখ্যার বিরোধিতা করতে জয়া সাহস পায়নি। উজানির বিয়ের তিন দিন আগে গাঁয়ের রাস্তায় হঠাৎ বাসুদেব ঘোষের মুখোমুখি হয়ে গেল জয়া। মুরারি ঘোষের মামা, সত্তর পেরনো বাসুদেব এসেছিল, কানাই মুর্মুর ভিটের পেছনে তার বাগানের চাষাবাদ দেখতে। বাগানের পুব দিক ঘেঁষে উঁচু মাচার সাতটা কুমড়ো ক্রমশ হাঁড়ির মত বড় হচ্ছিল। হপ্তায় একদিন কুমড়ো মাচার তদারকিতে আসত বাসুদেব। এলাকার জাঁদরেল জোতদার সে। মহাজনী ব্যবসাও করে। গলায় তুলসীর মালা, কপালে চন্দনের তিলক। মুখ দেখলে মনে হয় ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না। উজানির সঙ্গে জয়াকে সেই এক সকালে দেখে বাসুদেব কয়েক সেকেন্ড জুলুজুল করে তাকিয়ে থেকে উজানিকে জিজ্ঞেস করল কীরে নাতনি, এই সাদা কন্যেটিকে কোথা থেকে নিয়ে এলি?

উজানি জবাব দেওয়ার আগেই জয়াকে বাসুদেব জিজ্ঞেস করল, কী গো মেয়ে, তোমার নাম কী?

জয়া কিছু বলার আগে উজানি বলল, ও প্রীতিদিদি, আমার স্কুলে, এক ক্লাসে পড়ে, মগরাতে থাকে।

স্বামীকে আনলে না কেন?

তিনি চাকরি করেন।

জয়ার কথা অবিশ্বাস করল না বাসুদেব। তার মুখ দেখে জয়ার তাই মনে হল। সে আরো খুশি হল উজানির সপ্রতিভতা দেখে। কেমন অনায়াসে সহপাঠিনী হিসেবে সিঁথিতে সিঁদুর আঁকা, মাত্র কয়েকদিনের চেনা একটা মেয়েকে পরিচয় করিয়ে দিল বাসুদেবের সঙ্গে। সাধারণ মানুষও কম সৃজনশীল নয়, জেনে অভিভূত হল সে। বিদ্যুৎ চমকের মত তার মনে পড়ল, সুপার্থর কথা। বিন্দু ভাঙার প্রশ্নে জয়াকে সে জানিয়েছিল, গাঁয়ের গরিব চাষিরাও রাজনীতি সম্পর্কে কম সচেতন নয়। তাদের মনে মধ্যবিত্তসুলভ আত্মরক্ষার চিন্তা ঢুকিয়ে দিতে বারণ করেছিল সুপার্থ।

সেই সকালে জয়া অনুভব করল, সুপার্থর কথাতে সত্য আছে, সুপার্থের পরামর্শের ওপর নির্ভর করা যায়। শিশিরে ভেজা সকালের জলাজমি থেকে ভেসে আসা পৃথিবীর গর্ভগৃহের জলজ গন্ধের সঙ্গে মিশে গেল সুপার্থর ওপর নির্ভর করার অনুভূতি। লম্বা শ্বাস টানল সে। ডেমরা গ্রামের বাতাসে মেশা এই অচেনা গন্ধের সঙ্গে একুশ বছরের জীবনে তার প্রথম পরিচয় হল। বাসুদেব চলে গিয়েছিল তার সবজি খেতের ভেতরে। খেতে ঢোকার আগে চাপা গলায় উজানিকে বলেছিল, ভারি বেগতিক দিন আসছে রে নাতনি, সাবধানে থাকিস। গাঁয়ে উটকো লোক ঢুকলে নজর রাখিস।

জয়া বুঝতে পারল না, লোকটা তাকে সন্দেহ করেছে কিনা। প্রশ্নটা জয়া করতে ফুঁ দিয়ে উজানি উড়িয়ে দিল। বলল, আমাদের দাদু অত ঘোড়েল লোক নয়।

উজানিকে অবিশ্বাস করার কারণ না থাকলেও দৃষ্টান্ত স্থাপনের যে কর্মসূচি সুপার্থ দিয়ে গেছে, তা কার্যকর করতে হাতের কাছে এমন সুযোগ রয়েছে দেখে জয়া খুশি হল। বিন্দু ভাঙার ছকটা মাথার মধ্যে জেগে উঠলেও উজানিকে বলল না। বাসুদেব ঘোষ নামে বিন্দুটা ভাঙতে কাটোয়ায় স্বামীর ঘরে উজানি চলে যাওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করতে চায়। বিন্দু ভাঙার কাজে উজানি হাত লাগাবে না। তাকে বাদ দিয়ে এ কাজে এগোলে সে হয়তো বাসুদেবকে আগে থেকে সতর্ক করে দেবে। খতমের পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে গিয়ে পাঁচ কানে পৌঁছে যাবে। ডেমরা থেকে সে শুধু উৎখাত হবে না, তার প্রাণ বাঁচানো মুশকিল হবে। দোটানায় পড়ে গিয়েছিল সে। খতম-এর রাজনীতি মেনে নিতে মনের মধ্যে অস্বস্তি থাকলেও সুপার্থর নির্দেশ উড়িয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। ডেমরা ছেড়ে উজানি চলে যাওয়ার কয়েক দিনের মধ্যে মেয়েদের স্কোয়াড নিয়ে ডেমরার এই আলপথে বাসুদেবের লাশ নামিয়ে দেওয়া যায়। মেজদি, মঙ্গলিকে স্কোয়াডের নেত্রী হিসেবে বেছে নিয়ে মেয়েরা এ কাজ করতে পারে। নেত্রী হতে মেজদি রাজি না হলে, আনারসোল গাঁ-এর সরসতিয়াকে নেত্রী করা যায়। সরসতিয়া কম জঙ্গী নয়, গেল কয়েকদিনে জয়া জেনে গেছে। তার চেয়ে বেশি করে জেনেছে মেজদিকে। প্রায় রোজ গভীর

রাতে মেজদি ঘর ছেড়ে দাওয়ায়, তার বন্ধু. প্রেমিক, মংলু মাঝির ছেলে জিয়নের কাছে চলে যায়, প্রিয় মরদের সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে রাত কাবার হওয়ার আগে ঘরে ঢুকে পড়ে, জয়া জেনে গেছে। কানাই মুর্মু থেকে পরিবারের সকলে ঘটনাটা জানে, এটা জয়ার অজানা নয়। আদিবাসী পাড়ায় অবিবাহিত ছেলে মেয়ের এই মেলামেশা শুধু নির্দোষ, তাই নয়, প্রাক-বিবাহ এই সম্পর্ক গড়ে তুলতে অভিভাবকরা উৎসাহ দেয়। কথাটা উজানি শুনিয়েছিল জয়াকে। উজানি বলেছিল, বৃষ্টিবাদলের রাতে জিয়নকে মেজদি ঘরে ঢুকিয়ে নেয়।

মা-বাবা জানে?

কেন জানবে না? গাঁ-সুদ্ধু লোক জানে। সব ঘরে এরকম হয়। জয়ার মুখে কথা সরেনি। সে টের পেয়েছিল জিয়নের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া মেজদির চেয়ে, মেয়ে স্কোয়াডের নেত্রী পদে আনারসোলের সরসতিয়া বেশি উপযুক্ত। তার পছন্দের কোনো মরদ নেই এই মুহূর্তে। আগে ছিল। দুজন নাগরের একজন গাঁয়ের বাইরে মুনিষ খাটতে গিয়ে ফেরেনি। অন্যজন, সরসতিয়াকে ছেড়ে বছরখানেক আগে বেদেপাড়ার এক সাঁওতালকন্যাকে বিয়ে করেছে। তারপর থেকে এখনো পর্যন্ত পছন্দমাফিক কোনো পুরুষ জোগাড় করে উঠতে পারেনি সরসতিয়া। রীতিমতো জঙ্গি মেয়ে সে। ডেমরায় এসে জয়া টের পাচ্ছে যে-মেয়ে সামাজিক জীবনে যত বেশি নির্যাতিতা, সে তত বেশি তেজি, লড়াকু।

পানহলুদ বিনিময় করে, শুয়োর কেটে, হাঁড়িয়ার ফোয়ারা ছুটিয়ে সাড়ম্বরে উজানির বিয়ে হয়ে যেতে জয়া একটু অসুবিধেতে পড়ল। বন্ধুর বিয়েতে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে তার বাড়িতে এসে, বিয়ে চুকলে আর কতদিন সেখানে সে থাকতে পারে? উজানির বিয়ের রাতে কথাটা সুপার্থকে জানাতে সে বলেছিল, বিষয়টা নিয়ে আমিও ভেবেছি। দু-তিন দিনের মধ্যে নতুন জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে তোমাকে।

ঠিকানা পাল্টানোর জন্যে জয়া যখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, তখন সে জানত না, নতুন সমাজ গড়ার কাজের গভীরে আছে অদৃশ্যচারী এক মানবিক পৃথিবী। মতাদর্শ, বিশ্বাস, নিষ্ঠার চেয়ে সেই পৃথিবীর অন্তঃকরণ অনেক বড়। উজানির মা, যাকে জয়া 'মা' বলতে শুরু করেছিল, সে ডাকের অনেকটা ছিল আনুষ্ঠানিকতা, সে যে নিঃশব্দে স্নেহময়ী জননী হয়ে উঠেছে, জয়া জানত না। জয়া অন্য গাঁয়ে চলে যেতে চায় শুনে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে মা বলেছিল, আমার এক মেয়ে স্বামীর ঘরে চলে যাচ্ছে, তুই-ও ছেড়ে যাবি আমাকে?

মর্মন্তুদ হাহাকারের মত প্রশ্নটা জয়ার বুকের মধ্যে ভেঙে পড়তে সে বলেছিল, গাঁয়ের মানুষজন প্রশ্ন করলে, তাদের কীভাবে তুমি ঠেকাবে?

মা বলেছিল, তুই চুপ মেরে থাক, যা বলার আমি বলব। বলব প্রীতি ভিক্ষে-মেয়ে। আমি আটকে রেখেছি তাকে।

ডেমরায় থেকে যাওয়ার ইচ্ছে জয়ার কি ছিল না? ছিল, একটু বেশিই ছিল। তিন হপ্তা আগে যার এখানে বিয়ে হয়েছে, বিয়ের পরে স্বামীর এক ঘণ্টা সাহচর্য যে নববধূ পায়নি, পাশের গাঁয়ে আত্মগোপন করে থাকা সেই স্বামীর সঙ্গে প্রায় রোজ দেখা হচ্ছে, তাকে জড়িয়ে তৈরি হচ্ছে প্রত্যাশার পাহাড়, তার চোখের আড়ালে অনিশ্চিত কোনো ঠিকানায় পা বাড়াতে জয়ার মনে দ্বিধা থাকতেই পারে। কানাই মুর্মুর বাড়িতে আরো কিছু দিন থাকতে চাইছিল সে। সুপার্থকে বলেছিল, 'বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য' নামে পার্টির দলিলটা আরো ভাল করে বোঝা দরকার।

কে বোঝাবে?

সুপার্থ জিজ্ঞেস করতে জয়া বলেছিল, তুমি।

আমার সময় কোথায়? সারাদিন বাগালি করি, 'গেরিলা স্কোয়াড'কে রাজনীতি শোনাই, রাতে ধানের গোলার ভেতরে ভ্যাপসা গরমে ভোঁসভোঁস করে ঘুমোই। গোলার ভেতরে চব্বিশ ঘন্টা জুড়ে এমন অন্ধকার, যে রাত ফুরোলেও বুঝতে পারি না। সকালে ঘুম ভাঙলে বাইরে বেরিয়ে দেখি, রোদ উঠে গেছে। বেলা পর্যন্ত ঘুমোনোর জন্যে খিস্তি করে আমার গুষ্টির তুষ্টি করছে মুরাল্লি। রাগে পিত্তি জ্বলতে থাকলেও মুখ বুজে থাকতে হয়। এর মধ্যে আবার রাতে পার্টি দলিল ব্যাখ্যা করে তোমাকে বোঝাতে বসলে তারপর শেষ রাতে গোলায় ফিরে ঘুমোলে, দুপুরের আগে সে ঘুম ভাঙবে না। চাকরিটা চলে যাবে।

এক মুহূর্তে থেমে মুচকি হেসে সুপার্থ বলেছিল, দেখা যাক কী করা যায়।

সুপার্থর বলার ভঙ্গি থেকে জয়া টের পেয়েছিল, মুখে যাই বলুক, সে আসবে। জয়া জানত, সে যেমন নববধূ, সুপার্থও নতুন বর, রক্তমাংসের মানুষ, জীবনের কাছে তারো কিছু চাহিদা আছে। সুপার্থর সহযোদ্ধা হিসেবে সে যেমন সুপার্থর স্ত্রী, তেমনি সুপার্থ তার সহযোদ্ধা এবং স্বামী। সম্পর্কটা একপেশে নয়। দুভাবেই একে অন্যের সঙ্গে তারা জড়িত। সুপার্থ আসবে জেনেই জয়া বলেছিল, আমাদের কর্তব্যের দলিলের সঙ্গে তোমার কিছু নতুন কবিতা এনো।

'কবিতা' শব্দটা সে উচ্চারণ করতে মাথায় গামছা জড়ানো, মুখভর্তি দাড়িগোঁফ সুপার্থর চোখদুটো চকচক করে উঠেছিল। সে বলেছিল, বড়ো কষ্টে আছি, অনেক দিন ভাল কবিতা লিখতে পারছি না। কথাটা মনে হলেই মরে যেতে ইচ্ছে করে। কবিতা ছাড়া আমি বাঁচব না, এ সত্য আরো স্পষ্ট হয়। তবে একটা ব্যাপারে সত্যি আনন্দ পাচ্ছি, তা হচ্ছে নতুনভাবে এই জীবনযাপন, যে সব ঘটনার ভেতর দিয়ে চলেছি, যাদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পাচ্ছি, তার সব গিয়ে ঢুকছে আমার অনুভূতির গভীরে, যেখানে পদ্যের জন্ম হয়, সেখানে দুর্বোধ্য, মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যে টের পাচ্ছি, আমার জীবন আর কবিতা মুখোমুখি হয়েছে, একে অন্যের কোমর জড়িয়ে মোড় ঘুরছে।

কথা রেখেছিল সুপার্থ। আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে, রাত এগারোটা নাগাদ গাংনেগড়ের ঘাস পাতা, কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত যখন নড়ছে না, সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে, কানাই মুর্মুর দাওয়ার নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় জয়াকে 'প্রীতি' বলে ডেকেছিল সুপার্থ। জয়া জেগে থাকলেও সাড়া করেনি। সে জানত দাওয়ায় চ্যাটাই পেতে বউ নিয়ে কানাই শুয়েছে। মাটিতে গা এলিয়ে দেওয়ার পরে, দু'মিনিট না যেতে কানাই নাক ডাকতে শুরু করে। গভীর ঘুমে ডুবে যায়। কানাই-এর বউ, যাকে বাড়ির ছেলেমেয়েদের মত জয় 'মা' বলে ডাকে, সেও কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। মায়ের ঘুম পাতলা, বার দুই-তিন কেউ ডাকলে জেগে যায়। সুপার্থর ডাকে এখনই মায়ের ঘুম ভেঙে যাবে। তা-ই ঘটেছিল। চাপা গলায় সুপার্থর সঙ্গে মা কিছু কথা বলে, জ্বলন্ত এক কুপি নিয়ে দরজার ডান কোণে রাখতে সুপার্থ ঘরে ঢুকল। তার হাতে কিছু কাগজ, দু'একটা চটি বই। ঘুমের ভান করে চ্যাটাই-এর ওপরে জয়া পড়েছিল। সেখান থেকে উঠতে পারছিল না। কুপির আলোতে দলিল মেলে, জয়াকে তার ব্যাখ্যা শোনাতে আসনপিঁড়ি হয়ে সুপার্থ বসার পরেও জয়া চোখ খুলল না। ঘরের এক পাশে কুপির ম্যাড়মেড়ে আলো ছড়িয়ে থাকলেও আর এক দিকে অন্ধকার, ঘরভরা গাজন, হালকা শিসধ্বনি। তার মধ্যে তিন বাচ্চা নিয়ে বড়দি, কানাই মুর্মুর ছোট দুই ছেলেমেয়ে অকাতরে ঘুমোলেও মেজদি, যার নাম মহুলি, সে ঘুমোয়নি। আধ ঘণ্টা আগে ঘরে ঢুকে তার পাশে শুয়েছে জিয়ন। মহুলির প্রেমিক সে। উজানির বিয়ের আগে পর্যন্ত, রাতে এলে মহুলিকে নিয়ে ঘরের বাইরে দাওয়ায় ভোর রাত পর্যন্ত কাটিয়ে সকালের আগে সে চলে যেত। বউ নিয়ে কানাই তখন রাতে ঘরে ঘুমোতো। স্বামীর ঘর করতে উজানি চলে যাওয়ার পর থেকে রাতে ঘরের মধ্যে মহুলিকে নিয়ে ঘুমনোর অধিকার পেয়েছে জিয়ন। ঘরে ভিড় কমাতে বউ নিয়ে দাওয়ায় শুতে শুরু করেছে কানাই। চার-পাঁচ রাত ধরে জিয়ন ঘরে ঢুকলে জয়ার চোখ থেকে ঘুম চলে যায়। শরীর থেকে গনগনে তাপ বেরনোর সঙ্গে সে শুনতে পায় স্নায়ু, শিরা, ধমনীতে উন্মত্ত রক্তপ্রবাহের আওয়াজ। ঘুমন্ত তিন ছেলে, মেয়ে নিয়ে বড়দি আর তার ছোটো দু-ভাই বোন, আওয়াজ শুনতে না পেলেও অন্ধকারে তালপাকানো দু-জন সমর্থ মেয়ে-পুরুষের গভীর নিশ্বাসের হিসহিস ধ্বনি, হয়তো স্বপ্নের মত তাদের কানে যায়। তাদের কেউ জেগে উঠলেও এই বহুচেনা আওয়াজ নিয়ে মাথা ঘামায় না, ফের ঘুমিয়ে পড়ে। কুপির আলোয় বই খুলে বসে থাকা সুপার্থকে অন্ধকার থেকে নজর করে জয়া ভাবছিল, সুপার্থ কিছু কি শুনছে না? ঘরের আতপ্ত বাতাসে কোনো গন্ধ কি পৌঁছোচ্ছে না তার নাকে? সুপার্থর রক্তেও তো এখন তুমুল উচ্ছ্বাস জাগা উচিত। শিসের আওয়াজের তীব্রতা কমে গিয়ে একজোড়া দেহের অন্তরাল থেকে ভোঁতা গোঙানির শব্দ যখন শোনা যাচ্ছে, সুপার্থ তাকাল জয়ার দিকে। অন্ধকারে জয়ার দুচোখের মণি হয়তো ঝিলিক দিচ্ছিল।

সুপার্থ টের পেল জয়া জেগেছে। হাতছানি দিয়ে সে ডাকতে চ্যাটাই ছেড়ে উঠে জয়া গেল তার পাশে। প্রায় গা ঘেঁষে বসল। কানাই-এর নাক ডাকার জোরালো শব্দের সঙ্গে শোনা যাচ্ছে শিয়ালের ডাক। ঘরের ভেতরে গোঙানি নানা মাত্রায় ওঠানামা করছে। মেজদি, জিয়নের কাণ্ডকারখানা যে সুপার্থর নজর এড়ায়নি, তার হালচাল দেখে জয়া টের পেল, সুপার্থ তাকাচ্ছে না ঘরভরা অন্ধকারের দিকে। জয়ার শরীরের ভেতরটা থরথর করে কাঁপছিল। তার ঢেউ কি সুপার্থর শরীরে লাগছে না? সুপার্থ কেন আর একটু সরে তার গা ঘেঁষে বসে, তার দুঠোঁটের ওপর নিজের ঠোঁট দুটো ছোঁয়াচ্ছে না, চেপে ধরছে না তার ঠোঁট জোড়া? জয়ার শরীরের ভেতরটা যখন বিগলিতপ্রায়, সামনে রাখা খোলা বই-এর পাতায় ডান হাতের চেটোটা রেখে সুপার্থ বলল, 'বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য' নিয়ে আলোচনার আগে এই বইটা 'চিনা সমাজের শ্রেণী বিশ্লেষণ' একবার পড়ে নেওয়া দরকার। আজ রাতে যতটা সম্ভব আমরা পড়ে ফেলব, বাকিটা পড়ব কাল রাতে। পরশু রাতে শুরু করব মূল আলোচনা।

পকেট থেকে একটা চটি বই বার করে কুপির পাশে সে রাখল। সুপার্থর সব কথা জয়ার কানে যাচ্ছিল না। তার মাথার ভেতরে ঝিঁঝি ডাকছিল, অনুভব করছিল, কানে তালা লেগে গেছে। তার পাশে বসে থাকা মানুষটা কে, বিপ্লবী, কবি, না একটা বাজপড়া তালগাছ, বুঝতে পারছিল না। বিপ্লব ছেড়ে, গাংনেগড় ছেড়ে পরের দিন সকালেই তার চলে যেতে ইচ্ছে করেছিল। চেনাজানা জায়গা ছেড়ে, পরিচিত মানুষের চোখের আড়ালে সে চলে যেতে চায়। 'চিনা সমাজের শ্রেণী বিশ্লেষণ' বইটা পড়ার সঙ্গে সুপার্থ যে সব মন্তব্য করছে, জয়ার মাথায় তা ঢুকছিল না। মাটির পুতুলের মত সে বসেছিল। সুপার্থ যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, মাঝরাত কাবার করে, 'কাল আসছি' বলে, সেভাবে চলে গেল।

পরের দু-রাতে প্রায় একই সময়ে সুপার্থ এল। শ্রেণী বিশ্লেষণ শেষ করে, কর্তব্য ব্যাখ্যা করে চলে যাওয়ার সময়ে বলল, সম্ভবত দু-দিন এখানে থাকছি না। সত্যমাস্টারকে আনতে শ্রীরামপুর যাচ্ছি। মেঘনার দ্বারবাসিনীতে নুটু মণ্ডলের বাড়িতে সত্যমাস্টারের জন্যে 'শেলটার'-এর ব্যবস্থা করেছে গণেশদা। মাস্টারের সঙ্গে আর কেউ এলে তার আশ্রয়ও গণেশদা জোগাড় করবে। খুব চাপ পড়ছে মানুষটার ওপরে। বাড়িতে প্রচণ্ড অভাব। আয় বলতে বিড়ি বাঁধার মজুরি। তাও বাঁধার সময় পায় কই? জমি নেই যে চাষ করবে। রেয়নের কলে এক সময়ে মজদুর ছিল। ইউনিয়ন করতে গিয়ে চাকরি যাওয়ার পর থেকে গত পাঁচ বছর ধরে বিড়ি বাঁধছে, বিড়ি শ্রমিক। পাঁচটা বাচা নিয়ে সংসারে হাঁড়ির হাল। মাসে যদি বিশ-পঁচিশ টাকা গণেশদাকে দেওয়া যেত। লম্বা শ্বাস ফেলে সুপার্থ বলল, মেয়েদের নিয়ে তুমি যেমন বৈঠক, আলোচনা চালাচ্ছ, চালিয়ে যাও। চুপ করে কয়েক সেকেন্ড বসে থেকে সুপার্থ বলল, আজ সকালে একটা কবিতা লিখতে

শুরু করেছিলাম। প্রথম চার লাইন লেখার পরে খড়ের গাদা ভাঙার জন্যে ডাক পড়ল। বাকিটা মাথায় থেকে গেছে। পরে লিখব। চারটে লাইন যা লিখেছি, তোমাকে শুনিয়ে যাই। নিচু গলায় সে পড়তে থাকল,

অলস লোকের ভিড় আমাদের চারপাশে শুধু
অতর্কিত সাধনায় শেষ যার কোনোদিন নেই
মরা হরিণের শিশু কেবলই সড়ক ছুঁয়ে যায়
দেশে দেশে হতশ্বাস অথচ বালক ভাবে কাছে!

চতুর্থ লাইন শেষ করে সুপার্থ বলল, গণেশদার সাত-আট বছরের ছেলেটা ভাবে, খুব তাড়াতাড়ি তাদের সংসারে ভাত, ডাল, তরকারি উপচে পড়বে। সংসারে অভাব থাকবে না।

জিয়নের জন্যে বিছানায় একা শুয়ে কিছুক্ষণ ছটফট করে মেজদি ঘুমিয়ে পড়েছিল। সামনের মাসে তার বিয়ের দিন ঠিক হয়ে যাওয়ায়, বেশিদিন আর মেজদিকে একা বিছানায় ছটফট করতে হবে না।

ষোলো

শেষ পর্যন্ত বিন্দু ভাঙল সুপার্থ। বিনা প্রস্তুতিতে, অতর্কিতে, বলা যায়, ঝোঁকের মাথায় মাঝদুপুরে হাঁসগড়ার মাঠে গণেশ বাউড়িকে নিয়ে সুপার্থ নামিয়ে দিল মুরারি ঘোষের লাশ। দলের নির্দেশ অনুযায়ী দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। ডেমরা থেকে সাত মাইল দূরে হাঁসগড়া মাঠে দুপুর বারোটায় মুরারি ঘোষের খতম হওয়ার খবরটা সেই সন্ধেতে মুখে মুখে রেডিয়োতে পরের দিন সকালে সংবাদপত্রে, শহরাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লেও প্রতিবেশী ডেমরা, আনারসোল, আশপাশের গাঁয়ের মানুষ জেনেছিল দু-দিন পরে। হাঁসগড়ার চারপাশের গ্রামে তখন চিরুনি তল্লাশি শুরু হয়েছে। খতমে যারা হাত লাগিয়েছিল, সেই তিনজন, সুপার্থ, গণেশ, সত্যমাস্টারকে পুলিস অ্যারেস্ট করলেও, কোথায় তাদের রেখেছে, জানা যায়নি। খতমে ব্যবহৃত দুটো বড়ো চাঁচকাটারি, আর পাঁচ ইঞ্চি ফলা আলিগড়ে তৈরি একটা ছুরি, পুলিস উদ্ধার করেছে। সুপার্থর সঙ্গে দেখা হওয়ার চারদিন পরে এক দুপুরে জয়ার কাছে এখবর নিয়ে এসেছিল ছিরু সোরেন। ছিরুর পাশে ছিল তার বউ ময়না। আদিবাসী মেয়েটাকে দেখে জয়ার মনে হয়েছিল, অবন ঠাকুরের আঁকা কালিদাসের শকুন্তলা, মুগ্ধ হয়েছিল সে। এরকম সুডৌল, শ্রীময়ী মুখের সাঁওতাল

মেয়ে আগে না দেখলেও তা ভাল করে দেখার সময় তার ছিল না। জেলপালানো সুপার্থ ফের পুলিসের হাতে ধরা পড়েছে শুনে তার বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল। মুরারি ঘোষকে হঠাৎ সুপার্থরা খতম করতে গেল কেন? এরকম পরিকল্পনা মাথায় আছে, শেষবার দেখা হওয়ার রাতে সুপার্থ জানায়নি। পরের দিন সকালে শ্রীরামপুর স্কুলের শিক্ষক, সত্যমাস্টারকে আনতে চলে গিয়েছিল সে। তারপর কী এমন ঘটল যে মুরারিকে খতম করতে হল? দিনদুপুরে কার্যকারণহীন ঘটনার ধোঁয়াশায় জড়িয়ে পড়া জয়াকে জিনিসপত্র গুছিয়ে নেওয়ার তাগাদা দিচ্ছিল ছিরু। কানাই মুর্মুর ঘর থেকে জয়াকে দূবের কোনো আশ্রয়ে পৌঁছে দিতে ছিরু ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। চাকান টুডু খবর পাঠিয়েছিল যে কোনোদিন ডেমরা ঘিরে পুলিস চিরুনি তল্লাশি চালাবে। সাঁওতালপাড়ায়, তাদের একজনের পরিবারে জয়াকে পেলে তারা ছাড়বে না। কোমরে দড়ি না বাঁধলেও ঘাড় ধরে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরবে। তারপর বিবৃতি আদায় করতে শুরু করবে অকথ্য নির্যাতন। কলকাতার জেল হাজতে বন্দি, নন্দিতার হাত-পা বেঁধে মেঝেতে ফেলে, তার যোনিপথে ঢুকিয়ে দিয়েছিল ফুটন্ত জল থেকে সাঁড়াশিতে তোলা আগুনের গোলার মত তপ্ত মুরগির ডিম। নন্দিতা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

নির্যাতনের এরকম অনেক ঘটনা জয়ার জানা আছে। তার এক সন্তানসম্ভবা বন্ধু, মাধবীর গর্ভপাত হয়ে গিয়েছিল, পুলিসের অত্যাচারে, তাদেরই হেফাজতে। দেশের কোনো রাজনৈতিক দল, মানবাধিকারবাদী মহাশয় ব্যক্তিরা এসব নিয়ে এখন উচ্চবাচ্য করে না। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, বোবা ভদ্রলোকের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে, এরকম হয়। তবে বণাঙ্গনে নিহত সৈনিককে নিয়ে, তার শেষকৃত্যের ঝামেলাটুকু ছাড়া আর কিছু না থাকলেও, আহত আর ধৃত সৈনিকদের মানবিক মর্যাদা দিতে কিছু রক্ষাকবচ আছে। তা নিয়ে বিতর্কও আছে। তা রাষ্ট্রের তৈরি। রাষ্ট্র মানে বিজয়ীদের পরিকল্পিত এমন এক নির্যাতন-ব্যবস্থা, যা বাহ্যত পিতৃপ্রতিম মনে হলেও প্রকৃতিতে জহ্লাদ। ইতিহাস লেখে রাষ্ট্রশাসক, বিজয়ীবাহিনী। বিজেতারা তখনই 'কোর্টমার্শাল' করে প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। সভ্য মানুষ অন্য কথা বলে। শত্রুসৈন্য নিধনের জন্যে সামরিক আদালতে একতরফা বিচারে তাদের কোতল করা যায় না। জয়া এত ভাবছিল না। আশ্রয় বদলাতে তখনই তৈরি হয়ে নিল। জিনিসপত্র বলতে, শরীরে জড়ানো শাড়িটা ছাড়া বাড়তি একটা শাড়ি, চিরুনি, মায়ের দেওয়া কাঠের সিঁদুর কৌটো, থলিতে পুরে ডেমরা ছেড়ে যাওয়ার জন্যে পাঁচ মিনিটে তৈরি হয়ে নিয়েছিল। গ্রামের সীমানা ছেড়ে বলাগড়ের দিকে আলপথের কোথাও, চাকান টুডু যেখানে অপেক্ষা করবে, সেখানে জয়াকে পৌঁছে দিয়ে ছিরু, ময়না ফিরে আসবে গাংনেগড়ে, তাদের ঘরে। সেখান থেকে বলাগড়ের কাছে নিরাপদ আশ্রয়ে জয়াকে পৌঁছে দেবে চাকান। সেখানে এক মুসলমান পরিবারে জয়ার জন্যে আশ্রয় ঠিক করে রেখেছে আব্বাস। প্রীতির

বদলে সেখানে তার নতুন নাম হবে, জারিনা। জয়া থেকে প্রীতি থেকে জারিনা। তারপর? জয়া জেনে গেছে আরো অনেক নামের বকলমা তাকে নিতে হবে।

জয়াকে কিছুটা পথ এগিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে থাকলেও কানাই মুর্মুর বাড়ি থেকে কেউ বেরোয়নি। উজানির মা কাঁদছিল। প্রথম শরতের ঝাঁঝালো রোদ মাথায় নিয়ে লোকালয় ছেড়ে, লাঙল-টানা ধানজমির আশেপাশের পায়ে-হাঁটা পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল তিনজন। সামনে ছিরু, পেছনে ময়না। পুলিশের হাতে সুপার্থ ধরা পড়াতে ময়নাও যে বেশ ভেঙে পড়েছে, তার দু-একটা কথা থেকে জয়া টের পাচ্ছিল। পাঁচ জনের মুখ থেকে শোনা খতমের বৃত্তান্ত, নিজের মত আদল দিয়ে জয়াকে বলে যাচ্ছিল ছিরু।

কমরেড বিভু (সুপার্থর 'টেক' নাম) যে এমন কাণ্ড ঘটাবে ছিরু জানত না। চাকানকেও কিছু বলেনি। মুরারিকে খতমের সিদ্ধান্ত, পাঁচজনে বসে নিলে চাগানের তা অজানা থাকত না। সব জরুরি বৈঠকে, আঞ্চলিক কমিটির সদস্য হিসেবে সে থাকে। সেরকম কোনো বৈঠক হয়নি। দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্যে, বিন্দু ভাঙার কর্মসূচি রূপায়ণ করতে সুপার্থ খেপে উঠেছিল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একজন জোতদারকে কাটতে চাইছিল। সকাল এগারোটা নাগাদ সত্যমাস্টারকে নিয়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে ফেরার পথে, দূরে আলপথের ওপরে হঠাৎ ছাতা মাথায় মুরারিকে একা যেতে দেখে, বিন্দু ভাঙার চিন্তাটা তার মাথায় ঝিলিক মারে। অল্প দূরে গণেশ বাউরির ঘর। দুপুরে গণেশের ঘরে খেয়ে, দ্বারবাসিনী গাঁয়ে নুটু মণ্ডলের কাছে সত্যমাস্টারকে বিভুদার পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল। পরিস্থিতির বদল হতে ঠিক হয়, দ্বারবাসিনীতে মাস্টারকে নিয়ে যাবে গণেশদা। বেদেডাঙায় বিকেলের মধ্যে মনিবের বাড়িতে যে ভাবেই হোক, বিভুদাকে হাজির দিতে হবে। মনিবের কাজ থেকে বিভুদা দু'দিন দু-রাতের ছুটি আদায় করার পরে এত কথা নিজেই জানিয়েছিল আমাদের। গণেশদা, আব্বাস, চাকান ছিল সেখানে। তারাও শুনেছিল। মাঝদুপুরে মুরারি ঘোষকে কেটে ফেলার মতলব বিভুদার মাথায় কেন এল, গণেশদাই বা কীভাবে সেখানে জুটে গেল, কে জানে? তার ওপর মুরারিকে কাটল কোথায়? তার বাড়ির কাছে, তার পাড়ায়, হাঁসগড়ার মাঠে। মুরারিকে কোপানোর ঘটনা, পড়বি তো পড়, পড়ল তার ভাইপো, পলাশের চোখে। মোটরবাইক নিয়ে গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল সে। মাঠের মাঝখানে কিছু অঘটন দেখে দাঁড়িয়ে যায়, ভাল করে নজর করে দেখে, তার কাকাকে কাটারি আর ছুরি দিয়ে যারা কোপাচ্ছে, তাদের একজন, তাদেরই পরিবারের মুনিষ বিভু আর একজন, পাশের গাঁয়ের গণেশ। তৃতীয় লোকটাকে চিনতে না পারলেও মোটরবাইকে বসে সারা তল্লাট মাথায় করে সে চ্যাঁচাতে থাকে, আমার কাকাকে ডাকাতরা মেরে ফেলল। বাঁচাও, বাঁচাও।

বাইকে চেপে হাঁসগড়া মাঠের চারপাশে ঘুরে ঘুরে এমন চ্যাঁচাতে থাকল, যে

তা শুনে, দূরে জি. টি. রোডের ওপরে চলন্ত একটা পুলিসভ্যান পর্যন্ত থেমে গেল। আশপাশের গাঁ থেকে লাঠিসোঁটা নিয়ে তখন অনেক মানুষ বেরিয়ে পড়েছে। রে রে করে তারা ছুটে আসছিল হাঁসগড়া মাঠের দিকে। জি. টি. রোড ছেড়ে পুলিসের ভ্যানগাড়িটা গাঁয়ের রাস্তায় ঢুকে পড়তে বিপদের গন্ধ পেয়েছিল গণেশ। হাঁসগড়া মাঠ ছেড়ে তাড়াতাড়ি পালাতে চেয়েছিল তিনজন। গাংনেগড়ের দিকে দৌড়েছিল। গাংনেগড়ে একবার পৌঁছোতে পারলে, পুলিসের পক্ষে তাদের ধরা সম্ভব নয়, তারা জানত। ডেমরা নদী পেরিয়ে বেদেডাঙা পেছনে ফেলে গাংনেগড় পৌঁছোনো সহজ ছিল না। এলাকার যেসব গাঁয়ে আমাদের লোকবল কম, সেখানে এখনো আমরা ঢুকতে পারিনি। সংগঠন তৈরি হয়নি। বিপদ এল সেখান থেকে। সেখানকার গরিব মানুষ তাড়া করেছিল তাদের। ভিড়ের ভেতর কেউ কি গণেশকে চিনত না? চিনত, অনেকেই চিনত। বিভুদা আর মাস্টারকে ছেড়ে গণেশদা আলাদা পথে দৌড়ে পালালে হয়তো পুলিশের খপ্পরে পড়ত না। গাঁয়ের মানুষের চোরঠ্যাঙানি থেকে রেহাই পেত। গণেশদা তা চায়নি। দুই কমরেডকে কাছছাড়া না করে তাদের পাশে থেকেছে। তবে মাঝখানে ডেমরা নদী পার হওয়ার আগে, ছাগলগেছে গাঁয়ের কাছে বিভুদা আলাদা হয়ে গিয়েছিল। প্রায়ই পেটের ব্যামোয় ভোগে সে। দু-বেলা পেট ভরে খেতে পায় না। খিদের চোটে যা পায়, তাই খায়। থেকে থেকে পেটখারাপ হয়। ছাগলগেছেতে এক ঝোপের মধ্যে পেট খালি করতে সে ঢুকে পড়ে। সেখান থেকে তাকে টেনে বার করে বেধড়ক পেটাতে শুরু করে এলাকার মানুষ। পুলিসও হাত লাগায়। বেহুঁশ বিভুদাকে মরা কুকুরের মত ঠ্যাং ধরে টেনে ছেঁচড়ে নিয়ে গিয়ে কালো ভ্যানগাড়িতে পুলিস তুলে দেয়।

ঘাড় হেঁট করে জয়া হাঁটছিল। রোদের আঁচে তার মাথা ঘুরছিল। পাশে তাকিয়ে দেখল ময়নার চোখে জল। ময়না কাঁদছে কেন? সুপার্থর কথা ভেবে কি ময়না কাঁদছে? সুপার্থ ছাড়া কার জন্যে লুকিয়ে চোখের জল ফেলতে পারে ময়না? সুপার্থর সঙ্গে ময়নার ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে টের পেয়েও জয়া কিছু বলেনি। তার মনে হল, সে অন্ধ হয়ে গেছে। কিছু দেখতে পাচ্ছে না। উঁচুনিচু নাবাল জমিতে যে কোনো সময়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে পারে।

ছিরুর সব কথা কানে না গেলেও সে যে থামেনি, তার উচ্চারিত ধ্বনিপুঞ্জ থেকে জয়া টের পাচ্ছিল। ছিরু বলছিল, নতুন যে কমরেড আসছিল, মাস্টার না কী যেন নাম, গণেশের সঙ্গে যেতে ভরসা না পেয়ে, যে ঝোপে বিভুদা ঢুকেছিল তার আশপাশে ঘোরাঘুরি করছিল। তাকে ধরার পরেই ঝোপের মধ্যে বিভুদাকে গাঁয়ের মানুষ দেখতে পায়। ডেমরা গাঁয়ের কাছাকাছি গণেশদাকে ঘিরে ফেলে কেউ। ডেমরার মানুষ তা জানতে পারে দু-দিন পরে। জয়ার মনে হচ্ছিল আদি-অন্তহীন সাহারা মরুভূমির ভেতর দিয়ে সে হেঁটে চলেছে। পথের শেষ নেই।

বিন্দু ভাঙতে মুরারি ঘোষকে সুপার্থ বেছে নেবে সে ভাবতে পারেনি। সত্যমাস্টারকে নিয়ে আসার পথে দূরে মাঠের মধ্যে মুরারিকে দেখতে পেয়ে তখনই কি তার মাথায় দৃষ্টান্ত স্থাপনের ইচ্ছে জেগেছিল? হতে পারে। দৃষ্টান্ত স্থাপন, বিন্দু ভাঙা, গেরিলা স্কোয়াডের ভ্রূণ থেকে সমুত্থিত মুক্তিবাহিনী, সুশৃঙ্খল এই ঘটনাপরম্পরা তার মাথায় কবিতার লাইনের মত উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল? হতে পারে। কবিতা, বিপ্লব, মৃত্যু যে তার কাছে একাকার হয়ে যাচ্ছে, সুপার্থর মুখোমুখি শেষ তিন রাত, কয়েক ঘণ্টা দলের দলিলের ব্যাখ্যা শুনতে বসে, জয়া অনুভব করছিল। কিন্তু ময়নার চোখে জল কেন, সে কেন কাঁদছে? ময়নার চোখের জল দেখাও ছিল কল্পনাতীত। সুপার্থকে কি নিজের অজান্তে সে ভালবেসে ফেলেছিল? সুপার্থ কি জানত? জানত। ময়নাকে প্রশ্রয় দিয়েছিল সে। তাকে শ্যামাঙ্গিনী কবিতা ভাবতে শুরু করেছিল। সুপার্থ যে কয়েকদিন আগে তাকে বিয়ে করেছে, সিঁদুরের রেখা টেনে দিয়েছে তার সিঁথিতে, ছিরুর কাছ থেকে ময়না নিশ্চয় শুনেছে। সুপার্থর সঙ্গে জয়ার বিয়ের বিবরণ সেই রাতেই ছিরু নিশ্চয় সাতকাহন করে শুনিয়েছিল বউকে। সুপার্থর ধরা পড়ার খবর পেয়ে অন্ধকার ঘরে, বিছানায় স্বামীর পাশে শুয়ে, মুখ আড়ালে রেখে ময়না কেঁদেছিল?

ডেমরা ছেড়ে বলাগড়ের দিকে কয়েক মাইল এসে জয়া টের পেল, শরীর আর চলছে না। পাঁচ মিনিট অন্তত বসা দরকার। কথাটা সে বলতে ময়না সায় দিল। ফাঁকা মাঠের মধ্যে নিষ্পত্র এক বাবলাগাছের ছায়ায়, ঠিক ছায়া নয়, ছায়ার কঙ্কালের নীচে জয়া বসল। সামান্য দূরে বসল ময়না। ছিরু তখনো কথা বলছিল। ছিরু বলছে, কাল ঝুঁজরো রাতে গণেশদার বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখানে আর এক খবর শোনাল গণেশদার ইস্ত্রি। শ্রীরামপুর থেকে মাস্টারকে নিয়ে আসার পথে বিভুদা, গণেশদা দুজনেই দেখেছিল, ছাতা মাথায় দিয়ে নাবাল জমিতে চাষ-আবাদ দেখভাল করছে মুরারি ঘোষ। মুরারিকে দেখেই বিভুদা, গণেশদার মাথায় আগুন চড়ে যায়। শত্তুরকে হাতের কাছে পেয়ে তখনই তাকে নিকেশ করে দেওয়া ঠিক করে তিনজন। দু-তিন মিনিট ধরে গুজগুজ করে তারা কথা বলে, গণেশের বাড়িতে ফেরে। গণেশদার বউ রেঁধে রেখেছিল, টমেটো, আলু দিয়ে মৌরলা মাছের তরকারি। হাঁড়িতে বাড়তি তিনজনের মত ভাত করেছিল। তিন থালা ভাত নিয়ে মৌরলা মাছের তরকারি নিয়ে ঠান্ডা মাথায় তিনজন খেতে বসে যায়। সাঁটিয়ে খায়। তাড়া ছিল না, হন্তদন্ত ভাব ছিল না, ধীরেসুস্থে খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ে তিনজন। বিভুদা বিড়ি ধরিয়ে মাস্টারের সঙ্গে যখন চাঁচকাটারি, ছুরির ধার, আঙুল ছুঁয়ে দেখছে, গণেশদা তখন বউয়ের কোল থেকে তিন মাসের মেয়েকে নিজের বুকে টেনে নিয়ে বউকে খেতে বসিয়ে দিয়েছে। গণেশদা বোধহয় টের পেয়েছিল, তখনই না খেলে বউদি আর খাওয়ার সময় পাবে না। বউদির খাওয়া শেষ হতে মুখে গামছা, টুকরো কানি বেঁধে, চাঁচকাটারি, ছুরি নিয়ে বেরিয়ে যায়

তিনজন। তারপরের কাণ্ডকারখানা, তুমি শুনেছ।

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে ছিরু বলল, পুলিসের হাতে জমা হয়ে যাওয়ার পরে গণেশদার সংসার অন্ধকার। কাল রাত থাকতে তাদের ঘরে গিয়ে দেখি, সেখানে একদানা চাল নেই। চার ছেলেমেয়ে নিয়ে তাদের কতদিন উপোস করে কাটাতে হবে, কে জানে! বাউড়ি পাড়ায় সকলের এক দশা। কে খাওয়াবে গণেশদার বউ ছেলে-মেয়েকে?

জয়া বুঝতে পারছিল বিন্দুভাঙার প্রবল তাগিদে ছন্নছাড়ার মত কাজ করে ফেলেছে সুপার্থ। গাংনেগড় আর আশপাশের গ্রামগুলোতে পুলিস, আধা সামরিক সশস্ত্র বাহিনী এবার ঝাঁপিয়ে পড়বে। এলোপাথাড়ি ধরপাকড় করে এলাকার মানুষকে সন্ত্রস্ত করে তুলবে, তছনছ করে দেবে সদ্য তৈরি তাদের সংগঠন। গলায় জড়ানো গামছার খুঁটে কয়েক মুঠো মুড়ি বেঁধে এনেছিল ছিরু। বাবলাগাছের ছায়ায় সামান্য সময় বসার সুযোগ পেয়ে, গামছার বাঁধন খুলে, জয়াকে তার শাড়ির আঁচল মেলে ধরতে বলে, আঁচলে দু-মুঠো মুড়ি দিল সে। খিদেতে চুঁইচুঁই করছিল জয়ার পেট। ডেমরাতে আসার পর থেকে দিনে-রাতে ছায়ার মত এই খিদে তাকে জড়িয়ে থাকে। উজানির বিয়ের পর থেকে কোনদিন, একবেলা পেট ভরে খেয়েছে, মনে করতে পারে না। পেট ভরে খাওয়া, কাকে বলে, সে ভুলতে বসেছে। মুড়িসমেত গামছা মেলে বসেছে ছিরু। সেখান থেকে স্বামী-স্ত্রী মুঠো ভরে মুড়ি তুলে খাচ্ছে। পেট ভরে বছরে খুব বেশি পাঁচ-সাত দিন যারা খেতে পায়, বাকি দিনগুলো পেটে কিল মেরে থাকতে হয়, তাদের মুখে আধপেটা খাওয়ার পরিতৃপ্তি, অনায়াসে ঢেঁকুর তুলে খাওয়ার দীপ্তি ছড়িয়ে দেয়। ছিরু, ময়নার মুখে জেগে উঠেছে সেই দীপ্তি। ভরপেট খাওয়ার অভ্যেস না থাকায়, আধপেটা খেলেও পরিপূর্ণ তৃপ্তি পায়। মুড়ি খেয়ে গলা শুকিয়ে গেলেও ছিরুকে কথাটা জয়া বলল না। মাঠের ভেতর দিয়ে হাঁটার মধ্যে কোনো দীঘি কাছাকাছি চোখে পড়ে কিনা খেয়াল রাখল। চাগানের সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত তেষ্টা চেপে রাখতে হবে। বিকেলের আগে চাগানের সঙ্গে দেখা হবে না, সেটা সক্কালে কানাই মুর্মুর দাওয়াতে দাঁড়িয়ে ছিরুর সঙ্গে কথা বলার সময়েই সে আঁচ করে নিয়েছিল। মাইল খানেক আরো হাঁটতে আলের পাশে ঝাঁকড়া একটা শালগাছের ওপরের কোনো ডাল থেকে চাকান ডেকে উঠল, হেই ছিরু, দাঁড়া, আমি হেথায়।

কাঠবেড়ালির মত তরতর করে গাছ থেকে নেমে, জয়ার সামনে এসে, হাসিমুখে চাকান বলল, সেই কোন দুপুর থেকে গাছের মগডালে চড়ে আছি, আর ভাবছি, এই বুঝি তুমরা এসে গেলে! তা কুথায় কী?

জয়া জানে, এখান থেকে ময়নাকে নিয়ে ছিরু ফিরে যাবে। ডেমরা পর্যন্ত যাবে না। তার আগে মাঝপথে, কোনো একটা গ্রামে, শ্বশুরবাড়িতে ময়নাকে নিয়ে আজ রাতটা কাটিয়ে কাল সকালে নিজের গাঁ, বেদেডাঙায় ছিরু ফিরবে। নামহীন

এই ভূখণ্ড থেকে তার যাত্রাসঙ্গী হবে চাকান। আবার পথচলা, কত পথ হাঁটতে হবে, কখন পৌঁছোবে, গাঁয়ের নাম কী, কিছুই সে জানে না। আব্বাসের চেনা কোনো ডেরা, যেখানে তার জন্যে আব্বাস-অপেক্ষা করছে, সেখানে চাকান তুলবে তাকে। তার পরিচয় পাল্টে যাবে। প্রীতি থেকে সে হবে জারিনাবিবি। আদবকায়দা না জেনে জারিনাবিবি সাজতে গিয়ে কী দুর্ঘটনা ডেকে আনবে, ভেবে ধুকপুক করছিল তার বুক। সে যে ভয় পেয়েছিল এমন নয়, সাহসও হারায়নি। তার সবরকম বোধ ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল। শুকনো পাতার মত তার চেতনা থেকে জাগতিক বৃত্তিগুলো খসে গিয়েছিল। ডেমরা থেকে কতটা পথ হেঁটে এসেছে, সে আন্দাজ করতে পারল না। আব্বাসের আশ্রয়ে পৌঁছে, তারপর কী করবে, কোন দায়িত্ব তার ওপর বর্তাবে, সে জানে না। জেল পালানো সুপার্থকে জেরায় ছিন্নভিন্ন করে পুলিস চাইবে যাবতীয় খবর পেতে। গণেশকেও রেহাই দেবে না। বরং জাতপাতের বিচারে, বাউরি সম্প্রদায়ের গণেশকে অত্যধিক বাড় খাওয়া ছোটোলোক ভেবে নিয়ে তালছেঁচা করবে। সেখানে থামবে না। গাংনেগড় আর সংলগ্ন এলাকা, পুলিস চষে ফেলবে। নানা সূত্র থেকে খবর জোগাড় করে হয়তো কানাই মুর্মুর মত সমর্থকদের ঝেঁটিয়ে তুলে নিয়ে যাবে পুলিস। হন্যে হয়ে তাকেও খুঁজবে। পুলিসের নজর এড়িয়ে এখন থেকে একা, সংগঠন গড়তে হবে তাকে। ওপরতলার নেতারা পুলিসি হেফাজতের বাইরে থাকলেও মাথার ওপর বিশাল ছাতার মত সুপার্থকে এখন অনেকদিন পাওয়া যাবে না। বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও সুপার্থর ওপর সে কতটা নির্ভর করতে শুরু করেছিল, এখন টের পাচ্ছে। সুপার্থ বিন্দু ভেঙে দৃষ্টান্ত স্থাপন করল ঠিকই, মুরারি ঘোষ ইহলোক ছাড়া হয়েছে, অতঃপর ঢেউ-এর পর ঢেউ ভেঙে পড়ার মত বিন্দু ভাঙার ঘটনা ঘটতে থাকবে কিনা সন্দেহ! সন্দেহটা জয়ার। তার মাথার মধ্যে আগে থেকে এ সন্দেহ ছিল। সুপার্থর কোনো সন্দেহ ছিল না। হৃদয় ছেঁচে তুলে আনা কবিতার শব্দের মত ঘটনার পর ঘটনা জুড়ে সে একটা সৌধ বানিয়ে তুলতে চেয়েছে, যার নাম বিপ্লব। সৌধ তৈরির সরঞ্জাম জোগাড়ের দায় জয়ার ওপর চাপিয়ে সুপার্থ জেলে চলে গেছে। জেল ভেঙে আরো একবার পালানোর ছক অচিরে সে ভাবতে শুরু করবে। জেলে আটকে থাকার পাত্র সে নয়। বন্দিদশাতেও বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে, বিশেষ করে দলের সঙ্গে, আরো বিশেষ করে জয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করবে। মাধ্যমিক পরীক্ষাতে দু'বার ফেল করলেও প্রখর তার বুদ্ধি। ডাণ্ডাবেড়িতে বাঁধা থাকলেও তার যোগাযোগের চেষ্টা অসফল হবে না।

বিকেল ফুরনোর আগে জয়াকে নিয়ে বলাগড়ের দিকে চাকান রওনা হতে চাইলেও ময়নার কথা ফুরোচ্ছিল না। দু-হাতে জয়ার একটা হাত ধরে সে ক্রমাগত কেঁদে যাচ্ছিল, ভাঙা গলায় যত কথা বলছিল, তার বেশিটা সুপার্থকে নিয়ে। জয়া শুনছিল, ছিরুর ঘরের সামনে আমড়াগাছের তলায় বসে মাঝে মাঝে মোটা একটা

খাতায় সুপার্থ কী সব লিখত। কী লিখছে, ময়না জানতে চাইলে, 'বিভুদাদা' হাসত। খাতাটা ময়নার ঘরে থেকে গেলেও খাতা থেকে পড়ে যাওয়া আলগা একটা পাতা 'প্রীতিদিদি'র জন্যে ময়না নিয়ে এসেছে। সাদা পাতা নয়। পাতার একদিকে পুরোটা জুড়ে সুপার্থর লেখা একটা কবিতা দেখে জয়ার বুকের রক্ত চলকে উঠল। কাগজটার সঙ্গে শাড়ির আঁচলে বাঁধা দুটো আধপাকা আমড়া ময়না দিল জয়াকে। ময়নাকে বুকে জড়িয়ে অনেক কষ্টে চোখের জল সামলাল সে। বলল, খাতাটা যত্ন করে রাখিস ময়না। ঠিক সময়ে আমি চেয়ে নেব।

খাতাটা তোরঙ্গে ময়না ঢুকিয়ে রেখেছে জেনে জয়া স্বস্তি পেল। গাছতলা ছেড়ে ময়নাকে নিয়ে যে পথে এসেছিল, সেদিকে ফিরে যাচ্ছে ছিরু। ক্রমশ ছোট হয়ে গিয়ে দু-জন মানুষ যখন দিগন্তে প্রায় মিশে যেতে চলেছে, চাকানকে নিয়ে জয়া রওনা হল নতুন ঠিকানাতে। জারিনা নাম নিয়ে যে পরিবারে সে আপাতত থাকবে, সেখানের মত করে নিজেকে গোড়াতে বানিয়ে নেওয়া দরকার। সব কিছুর আগে সিঁথি থেকে সিঁদুরের রেখা মুছে ফেলা জরুরি। চাকানের খবর, সামনে, পোয়োটাক পথ পেরিয়ে একটা পুকুর পাওয়া যাবে। ঘাট না থাকলেও পুকুরে নামার ঢাল আছে। আজ দুপুরে চাকান সেখানে চান করেছে। পরিষ্কার জল, গভীর পুকুর। জয়া চাইলে সেখানে চান করতে পারে। সিঁদুর তোলার মত জরুরি কাজ করে ফেলার সঙ্গে চানের সুযোগ রয়েছে জেনে জয়া খুশি হল। দিনের আলো ফুরিয়ে যাওয়ার আগে পুকুরের ধারে সে পৌঁছোতে চাইছিল। পুকুরে ডুব দিয়ে, সিঁথিতে হাতের বুড়ো আঙুল ঘষে সিঁদুর তোলার আগে ময়নার কাছ থেকে সদ্য পাওয়া সুপার্থর কবিতাটা সে পড়ে নিতে চায়। হয়তো আজ রাতে কবিতাটা পড়ার সুযোগ ঘটবে না। যেখানে যাচ্ছে, সেখানে আলো জ্বলে না, ঘরে কেরোসিন নেই, গভীর অন্ধকার। কোনোভাবে একটা কুপি জ্বললে, তা ঘিরে জটলা করবে পরিবারের লোকজন। সেখানে কবিতা পড়া, অস্বাভাবিক ঠেকতে পারে। দিনের আলো নিভে আসার আগে চাকানের চেনা সেই পুকুরের ধারে জয়া পৌঁছে গেল। পুবদিকে মুখ করে দাঁড়াল। হাতে ধরা খোলা কাগজের ওপর পেছন থেকে পশ্চিম আকাশের আলো পড়েছে। পুকুরে এখনি জয়া নামবে আঁচ করে সেখান থেকে চাকান সরে গেছে। জয়া জল থেকে উঠে না আসা পর্যন্ত পুকুরের উল্টো দিকে মুখ করে, সে বসে থাকবে। জয়া পড়ছিল সুপার্থর কবিতা। গাংনেগড়ে বসে সুপার্থ কবিতাটা লিখেছে জয়া আঁচ করতে পারল। সুপার্থর বিপ্লবী হওয়ার আগের কবিতার সঙ্গে পরের কবিতার অনেক তফাত ঘটে গেছে। কোন পর্বের কবিতা কেমন, তাদের ভালমন্দ, জয়া এখনো ঠিকমতো বুঝতে পারছে না। সুপার্থর পুরনো কবিতাগুলোর জন্যে শুধু তার মন কেমন করে। সুপার্থর নতুন লেখা কবিতাটা একবার শেষ করে সে দ্বিতীয়বার পড়ল।

হয়তো এমনি হবে একদা ভুলের লোভ চতুর ছায়ায়
রক্তহীন পরিচয়ে অন্ধকার খুঁজে নিয়ে সমস্ত শরীরে
আবার আসবে কাছে, আবার ভয়ের গন্ধ ঝরে গিয়ে দ্রুত
মজুরের শ্রম চেয়ে শ্রেণীহীন দেশ খুঁজে অবাধ বাসনা
আমাদের ভয় ভুল সব কিছু হত্যা করে আবার মানুষ
নিজের আপন ভেবে আলিঙ্গনে মগ্ন হয়ে গূঢ় সান্ত্বনার
খোঁজ পাওয়া সুচতুর বিলাসীর ওষ্ঠের নিকটে
একাকী রক্তিম মুখে গল্প শুনে সব ভয় ত্যাগ করে যাওয়া।'

'সব ভয় ত্যাগ করে' দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্যে সুপার্থ যে মরীয়া হয়ে উঠেছিল, কবিতাটা পড়ে জয়া বুঝতে পারল। বিন্দু ভাঙতে মনে মনে তৈরি হচ্ছিল সুপার্থ। পরিকল্পনা পাকা করার আগেই হাতের মুঠোয় মুরারিকে পেয়ে তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ক্রমান্বয়ে তত্ত্ব আলোচনা করে সে অধৈর্য হয়ে পড়ছিল। জয়ার মনে হল, তার উচিত ছিল সুপার্থর আগে বিন্দু ভাঙার কাজটা সেরে ফেলা। তাহলে পুলিসের হাতে সুপার্থ ধরা পড়ত না। গাংনেগড়ে আরো ছমাস সে থাকলে সংগঠনের ভোল বদলে যেত। সত্যিকার বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠত সেখানে। ডেমরা ছেড়ে তাকে আপাতত পাততাড়ি গোটাতে হলেও আবার ফিরে আসার রাস্তা খোলা থাকত। কিন্তু সে কি পারত মুরারি ঘোষের জীবন নিতে? প্রকাশ্য দিনের আলোতে মুরারির প্রাণ হনন করতে? মানুষ খুন করতে পারা কি তার পক্ষে সম্ভব? একজন মানুষের পক্ষে কি আর একজন মানুষকে মেরে ফেলা সম্ভব? গভীর থেকে প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পেতে চাইছিল সে। পুকুরের ওপরের স্তরে, গরম জলের নীচে, নাতিউষ্ণ শীতলতায় জুড়িয়ে যাচ্ছিল তার শরীর। সিঁথিতে ক্রমাগত বুড়ো আঙুল ঘসছিল সে। সিঁদুরের চিহ্নহীন সিঁথি সাদা করতে হবে। সঙ্গে আয়না নেই যে চান সেরে উঠে সিঁথিটা দেখে নেবে। সিঁদুর নিয়ে সধবা মেয়ের স্পর্শকাতর, প্রাচীন সংস্কার তাকে কামড়ালেও মন থেকে তা ঝেড়ে ফেলতে চাইছিল সে। শস্যহীন ফাঁকা জমির আলের ধারে বিশাল এই পুকুরে নিশ্চয় গরমের দিনে দূরের গ্রাম থেকে মেয়েরা কলসি কাঁখে জল নিতে আসে। কলসিতে জল ভরে ঘরে ফেরে। কোমরডুব জল ছেড়ে বুক পর্যন্ত জলে গিয়ে জয়া দাঁড়িয়ে পড়েছে। পুকুরটা গভীর। সাঁতার না জানার জন্যে আরো এগোতে ভরসা পেল না। এবার গুনে গুনে পাঁচ ডুব দিয়ে জলের ভেতরে রেখে এল পাঁচটা প্রার্থনা। এটাও পুরনো সংস্কার। বিধবা পিসির মুখে শুনছে পাঁচবার পুকুরে ডুব দিয়ে, প্রতিবারে একটা করে প্রার্থনা জলের নীচে স্থাপন করে এলে, মনস্কামনা পূর্ণ হয়। মান্ধাতা আমলের এই সংস্কারে তার বিশ্বাস না থাকলেও ছেলেবেলার অভ্যেসেই যেন প্রার্থনাগুলো তার মনের মধ্যে গুণগুণ করে উঠল। বড় কোনো প্রার্থনা নয়, ছাপোষা গৃহস্থের প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে জড়িত এই চাহিদাগুলোর

সঙ্গে সুপার্থর মঙ্গলকামনা ছিল না, কে বলতে পারে?

পুকুরধার নিস্তব্ধ। চাকান কোথায় গিয়ে বসেছে জয়া জানে না। জনপ্রাণী নেই কোথাও। পুকুর থেকে উঠে ভিজে শাড়ি, জামা ঢুকিয়ে রাখল থলিতে। খোঁপা খুলে চিরুনি দিয়ে লম্বা চুল আঁচড়ে ফের হাতখোঁপা বেঁধে নিল। সিঁথির সিঁদুর তুলে সে পুরো জারিনাবিবি হয়েছে কিনা, একমাত্র চাকান বলতে পারে। বেশি সময় অপেক্ষা করতে হল না। চাকান এসে গেল। প্রথমেই জয়া জিজ্ঞেস করল, তার সিঁথিতে কোথাও সিঁদুর লেগে আছে কিনা! চাকান ভাল করে নজর করে সিঁদুর দেখতে পেল না। তারপর জানাল, জয়ার সিঁথিতে আগেও সিঁদুর দেখেনি সে। জয়ার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দু-একবার কথা বললেও তার সিঁথি দেখার চিন্তা চাকানের মাথায় কখনো আসেনি। চাকানের কথায় জয়া অবাক হল না। কানাই মুর্মুর ঘরে কয়েকদিন থেকে আদিবাসী সমাজের কিছুটা, তারা অতি সরল, অতি নিরীহ, জয়া জেনে গেছে। চাকানও তাই। তার কথাতে ভেজাল নেই। সুপার্থর সঙ্গে বিয়ের রাতে, ঘোর অন্ধকারের মধ্যে সে একবার হয়তো জয়ার সিঁথিতে সিঁদুর দেওয়ার সময় দেখেছিল, তারপর সেদিকে আর তাকায়নি। সামনের দিনগুলোতেও চাকান নজর করবে না, তার সিঁথি সাদা, না লোহিতবর্ণ! সিঁথিতে কণামাত্র সিঁদুর নেই জেনে জয়া নিশ্চিন্ত হল। মুসলমান পরিবারে সিঁথিতে সিঁদুর এঁকে জারিনাবিবি থাকতে পারে না, এ চিন্তা তার মাথায় কীভাবে এল, কে জোগালো খুঁটিনাটি বিষয়ের দিকে এই নজর, জয়া বুঝতে না পারলেও মাথার মধ্যে হঠাৎ জেগে ওঠা এই বাস্তবতাবোধে সে খুশি হয়েছিল। সিঁথিতে সিঁদুর লাগানো আর মুছে ফেলার এই খেলা আরো অনেকবার করতে হবে, অনুমান করতে পারছিল।

অনুমান মেলেনি। ষোলোআনা গরমিল হয়েছিল, তা-ও বলা যায় না। সিঁদুর লাগানো, মোছার ঘটনা, ফেলে আসা পঁয়ত্রিশ বছরে আরো দু-বার ঘটেছে। শেষবার সিঁদুর মোছার আগেই তার ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়ায় সিঁথি সাদা হয়ে গিয়েছিল। এ নিয়ে তখন প্রশ্ন করার কেউ ছিল না। রাতের মত দু-চোখ ছেড়ে ঘুম চলে গেছে টের পেয়ে জয়া আর ঘুমোনর চেষ্টা করছে না। জানলার নীচে দুটো বেড়াল হিংস্র আওয়াজ তুলে একে অন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে ডেকে চলেছে। কচি বাঘের গর্জনের মত সেই ডাক। নিস্তব্ধ অন্ধকারে একঘেঁয়ে, কর্কশ সেই চিৎকার, এতটাই পীড়াদায়ক, জয়ার মনে হচ্ছিল, তার কানের পর্দা ফুটো হয়ে যাবে। দ্বন্দ্বরত দুটো বেড়ালই যে হুলো এবং কী নিয়ে মাঝরাতে তাদের বিবাদ, জয়া জানে। জলের বোতল থেকে এক আঁজলা জল, খোলা জানলার বাইরে ছিটিয়ে দিলে প্রাণীদুটো সরে যেতে পারে, আঁচ করেও বিছানা ছেড়ে জয়ার উঠতে ইচ্ছে করছে না। পুরুষতন্ত্রের ভেতরকার বিরোধ যে মানবীমুক্তির প্রখর অভিপ্রায়কে অনেকাংশে ঠেকিয়ে রেখেছে, মধ্যরাতে এটা তার আবিষ্কার নয়,

অনেক বছর ধরে বিষয়টা সে জানে। তার ভাঁড়ারে এ নিয়ে প্রচুর তথ্য আছে। তবে মানবীবাদী আন্দোলন যে পুরুষবিরোধী নয়, এ উপলব্ধি সে আগেই করেছে। কাল সকালের সমাপ্তি ভাষণে যে যা বলতে চায়, তা হল, ফেলে আসা পঁয়ত্রিশ বছরে একটা মেয়ের অর্জিত অভিজ্ঞতার সারসংকলন, পুরোটা নয়, বরাদ্দ সময়ের খাপে যতটা ধরে, ততটুকু। স্ত্রী-পুরুষ নির্মাণে, শরীর আর মনের প্রকৃতি চিহ্নিত স্বাতন্ত্র্য, বজায় রেখেও চেতনার অক্ষে সমান মাপে পা ফেলে দু'পক্ষ চলতে পারে, এটাই তার সমাপ্তি ভাষণের বিষয়। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে সে রপ্ত করেছে এই চলনভঙ্গি, জেনে গেছে স্ত্রী পুরুষ, আলাদা পদার্থ নয়, একটি জীবনীশক্তির দুই বিপরীত অংশের সমন্বয়, দুই জুড়ে এক, আবার এক ভেঙে দুই। দুটো আধুলি যা, একটা টাকাও তাই, একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। 'হেড' 'টেল', দুটো মিলেই জয় পরাজয়, সম্পূর্ণ একটা মুদ্রা। প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা মানুষের প্রজন্মকে এভাবেই ব্যাখ্যা করেছে। সমাজবিজ্ঞানীরা সে ব্যাখ্যা মেনে নিয়ে আরো সমৃদ্ধ করতে চাইছে।

শুকনো জলাজমির বুকের ভেতর দিয়ে সিঁথির মত পায়ে-চলা পথ ধরে কিছুটা এগিয়ে চাকান এমন কিছু খবর শুনিয়েছিল, জয়া যা জানত না। মগরা থেকে সত্যমাস্টারকে নিয়ে সুপার্থ, গাংনেগড় যাওয়ার পথে, কিছু সময়, বেনাদহের হাট পর্যন্ত তাদের সঙ্গী হয়েছিল চাকান। বেনাদহের হাটে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল দ্বারবাসিনী গাঁয়ের নুটু মন্ডল আর বেদেডাঙার গণেশ বাউরি। নুটুকে আলাদা ডেকে সুপার্থ কিছু বলতে সে তখন-ই হাট থেকে বাড়ি যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েছিল। হাটের একপাশে, গাছতলায়, সত্যমাস্টার গণেশ, চাকানকে নিয়ে কয়েক মিনিট শলাপরামর্শ করে, গাংনেগড়ের দিকে রওনা হয়েছিল চারজন। মাঝখানে কোনো এক জায়গা থেকে চাকান চলে যাবে, তার গাঁয়ের দিকে। গাছতলায় বসে গম্ভীর শলাপরামর্শের মধ্যে চাকান যে খবর লজ্জায় কাছের মানুষগুলোকে শোনাতে পারেনি, গাংনেগড রওনা হওয়ার পরে বলেছিল, তা শুনে, প্রায় জোর করে তাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিল সুপার্থ। খবরটা না শোনালে সুপার্থ, সত্যমাস্টারের সঙ্গে সে থেকে যেত। সেও যেত গণেশ বাউড়ির বাড়িতে, মুরারি ঘোষকে খতমের কাজে হাত লাগাতে পারত। চাকান বলছিল, সে সঙ্গে থাকলে সুপার্থ, গণেশকে ধরতে পারত না পুলিস। হাঁসগড়ার মাঠ থেকে পালানোর অনেকগুলো গোপন রাস্তা তার জানা আছে। জয়া কথা না বললেও শুনতে চাইছিল, চাকান কী এমন খবর শুনিয়েছিল, যার দরুন তাকে ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিল সুপার্থ। সে প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে চাকান যত অন্য কথা বলছিল, আসল খবর শোনার জন্যে তত বাড়ছিল জয়ার আগ্রহ। আগ্রহ খালাস করতে চাকান সেই খবরটা, যা সুপার্থকে সে শুনিয়েছিল, জয়া জানতে চাইল। লজ্জিতভাবে চাকান বলেছিল, খতমের আগের দিন রাতে তার একটা 'ছেল্যা' হয়েছে। 'ছেল্যা' হওয়ার জন্যে বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হওয়াতে চাকান আফসোস করছিল। বেনাদহের হাট ছেড়ে মাইলখানেক

আসার পরে সুপার্থর হাওয়াই চটির 'স্ট্র্যাপ' ছিঁড়ে যাওয়ার ঘটনা শুনে জয়ার মনে পড়ল, সে আসার সময়ে একই ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনার এমন সমাপতন বড় একটা দেখা যায় না। নানা কসরত করে ছেঁড়া 'স্ট্র্যাপ' চটিতে লাগাতে না পেরে, সত্যমাস্টারের গলার পইতে খুলে দড়ির মত পাকিয়ে মাঝখান থেকে দু-ভাগ হয়ে ছিঁড়ে যাওয়া স্ট্র্যাপের দু-মুখ এক করে ব্যান্ডেজের মত জোড়া দিয়ে বেঁধে, কাজ চালানোর ব্যবস্থা করেছিল সুপার্থ। পইতের দশা দেখে কয়েক সেকেন্ড হতভম্ব হয়ে থেকে সত্যমাস্টার বলেছিল, সুপার্থ, আমার জাত মেরে তুই বাঁচিয়ে দিলি আমাকে।

ময়নার উপহার, দুটো আমড়ার একটা, চাকানকে দিয়ে, অন্যটা জয়া, কুটুরকুটুর করে নিজে খাচ্ছিল। নিদারুণ টক হলেও জিভ, তালুতে যুগলবন্দি আওয়াজ তুলছিল না। তার দেওয়া আমড়াতে তখনই তিন-চার বার কামড় বসিয়ে নির্বিকারভাবে পেয়ারার মত চাকান-কে খেয়ে নিতে দেখে জয়া অবাক হয়েছিল। ছিরু আর ময়নার সঙ্গে যতটা কম কথা বলে, পাঁচ ঘন্টা পথ হেঁটেছিল, বিকেলে চাকান সঙ্গী হতে জয়ার পক্ষে আর চুপ করে থাকা সম্ভব হল না। অনর্গল কথা বলছিল চাকান, বাদনা পরবের গান শোনাচ্ছিল, মাঠের মাঝখানে হঠাৎ দাঁড়িয়ে কোমরে ঢেউ তোলা নাচ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করছিল, বাসুদেব ঘোষের কাছে বন্ধক রাখা তার বাপকেলে ভিটেটা থাকবে তো? পাওনা টাকা শোধ করার পরে, বাসুদেবের গ্যাঁড়াকল থেকে তার কি রেহাই মিলবে? চাকান খোলাখুলি বলেছিল, ভিটেমাটি চাটি হওয়া থেকে বাঁচতে সুপার্থর দলে ঢুকেছে সে। সেই নিরহংকার স্বীকৃতি শুনে জয়ার মন ভরে গিয়েছিল। জয়া আশ্বস্ত করেছিল তাকে। সমাজ বদলের লড়াই সফল হলে চাষি মজুরকে যে আর দাবিয়ে রাখা যাবে না, তারাই দেশ চালাবে, এসব বোঝাচ্ছিল চাকানকে। মন দিয়ে তার কথা শুনে আহ্লাদে হাঁড়িয়া খাওয়ার ইচ্ছে জেগেছিল চাকানের। তখনই সে শুনিয়েছিল তার ঝোলার মধ্যে হাঁড়িয়ার বোতল আর শালপাতার ঠোঙা আছে। জয়া চাইলে ঠোঙায় হাঁড়িয়া ভরে তার সঙ্গে খেতে পারে। জয়া ঠেকিয়েছিল চাকানকে। বয়স্ক এক শিশুকে কয়েক মিনিটে বশ করে, হাঁড়িয়ার বোতল খোলা তখনকার মত আটকে দিয়েছিল। চাকানকে জয়া জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার বন্ধকী বাড়ি মিনিমাগনা ফেরত পেতে বাসুদেব ঘোষকে তুমি কি খুন করতে পারো?

প্রশ্ন শুনে চাকান দাঁড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, হেই দিদি, কুন ফাঁপরে তুমি ফেল্যা আমাকে?

চাকানের মুখের চেহারা দেখে, খতমের চিন্তাটা যে তার কাছে যথেষ্ট গুরুপাক, জয়ার বুঝতে অসুবিধে হয়নি।

জয়া আর প্রশ্ন করল না চাকানকে। মগরা আর বলাগড়ের মাঝামাঝি, বেহুলা গাঁয়ে নাসির শেখের ঘরে তাদের পৌঁছোতে রাত আটটা বেজেছিল। গাঁয়ের মুখে

রাস্তার ওপর তাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল আব্বাস। টর্চ জ্বেলে, পথে তাদের দাঁড় করিয়ে, জয়ার সিঁথির ওপর টর্চের আলো ফেলে সেখানে সিঁদুর রয়েছে কিনা, ভাল করে দেখে, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আব্বাস বলেছিল, জানতাম, প্রীতিদিদি ভুল করবে না। সিঁথিতে সিঁদুর লাগিয়ে, মোচলমান পরিচয় দিয়ে মোচলমানের ঘরে আসবে না। আমার ধারণা মিলে গেল। ভুলটা হয়েছিল আমারই। ডেমরা ছেড়ে আসার আগে সিঁদুর মুছে ফেলার কথাটা প্রীতিদিদিকে বলে দেওয়া উচিত ছিল। বলব ভেবেও শেষ পর্যন্ত বলা যায়নি। ভুলে গিয়েছিলাম। বিভুদাকে পুলিস ধরে নিয়ে গেছে শুনে তখন অন্ধকার দেখছিলাম চারপাশে।

সতেরো

নাসির শেখের সংসারে, প্রাথমিক নানা বিভ্রাট কাটিয়ে জারিনা সেজে থাকার নিয়মগুলো জয়া শিখে নিচ্ছিল। গাঁয়ের নাম বেহুলা হলেও গ্রামবাসীদের বেশিরভাগ মুসলমান। আব্বাসের দিদির বিয়ে হয়েছিল বেহুলাতে। ডেমরা থেকে জয়াকে নতুন আশ্রয়ে সরিয়ে দিতে কাল রাতেই বেহুলাতে দিদির ঘরে চলে এসেছিল আব্বাস। দিদির শ্বশুবাড়ির পাড়াতে তার ভাসুর নাসিরের ঘর। আব্বাসের সঙ্গে তার দুলাভাই-এর চেয়ে তার দাদা নাসিরের খাতির বেশি। নাসির ধর্মভীরু, সুফি মতাবলম্বী সাধক, মৈনুদ্দিন চিসতিকে গুরু মানে। রাজনীতি নিয়ে কথা না বললেও আব্বাসের কাজকর্মে মদত দেয়। আব্বাস জানত, নাসিরের ঘরে প্রীতিদিদির জায়গা পেতে অসুবিধে হবে না। আব্বাসের মুখে প্রীতির কথা শুনে নাসির বলেছিল, তেমন দরকার হলে তোমাদের দিদি আমার ঘরে থাকতে পারে।

সুপার্থ, গণেশ ধরা পড়তে গাংনেগড়ের হাওয়ায় বিপদের গন্ধ পেয়ে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জয়াকে অন্য ঠিকানায় সরিয়ে দেওয়া ঠিক হয়, কাল বিকেলে। আশ্রয় খুঁজে বার করার দায়িত্ব চাপে আব্বাসের ওপর, জয়ার আশ্রয় খুঁজতে কাল গভীর রাতে বেহুলায় পৌঁছে গিয়েছিল আব্বাস। তার ওপর যে কাজের ভার দল থেকে দেওয়া হয়েছিল, সে তা করেছে। জারিনার নিরাপদে থাকার বন্দোবস্ত করে রেখেছে। নাসিরের সংসারের অবস্থা, জয়া যা ভেবে নিয়েছিল, তা নয়। গরিব হলেও দু-বেলা ভাতের সঙ্গে তেঁতুল ঝোল, পিঁয়াজ থাকে। বেহুলার মত গরিব গাঁয়ে নাসিরের পরিবার কিছুটা স্বচ্ছল। প্রীতিদিদি অন্তত দুবেলা খেতে পাবে, এই ছিল আব্বাসের ধারণা। আব্বাস ভুল ধারণা করেনি। উদারপন্থী নাসিরের সংসারে জয়া খাপ খাইয়ে নিচ্ছিল নিজেকে। মাথায় ঘোমটা টেনে,

মুসলমান মেয়েদের চালচলন অনুকরণ করে, যতটা সম্ভব গড়েপিটে, নিখুঁতভাবে নিজেকে জারিনা বানাতে চাইছিল। তার আসল পরিচয়, অর্থাৎ ধর্মে সে হিন্দু শুধু নাসির জানত, আব্বাস বলে রেখেছিল তাকে। আভাস ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছিল জয়া সমাজসেবী, একটু অন্য ধরনের সমাজসেবী। শান্তভাবে সব শুনে নাসির বলেছিল, ইন্‌সাল্লাহ রহমান-এ রহিম, আল্লা মঙ্গলময়, তাঁর ইচ্ছে শেষ কথা। দুঃখী মানুষের যারা সেবা করে, তাদের পাশে তিনি থাকেন। জয়াকে আল্লার বাঁদি ভেবে নিতে সুফিপন্থী নাসিরের অসুবিধে হয়নি। নাসির নিজে গরিব চাষি হলেও তার চার জোয়ান ছেলে তার সম্পদ। তারা গতরে খেটে সাত বিঘে ধানজমি, দুজোড়া বলদ কিনেছে। পাঁচ মেয়ের তিন জনের বিয়ে হয়ে গিয়েছে, বাকি দুজনের বিয়ের সময় হয়েছে। তাদের প্রতিপালিত একটা দুধেল গোরু, এক গণ্ডা ছাগল, ডজনখানেক হাঁস-মুরগি, বছরভর সংসারে কিছু সংগতি জোগায়। ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দেয় নাসির। বেহুলার আর পাঁচটা মুসলমান পরিবারের চেয়ে নাসিরের পরিবার যে আলাদা, প্রথম দেখে জয়া বুঝতে পেরেছিল। কয়েকদিনে জেনে গিয়েছিল, গাঁয়ের মানুষের চোখেও তারা মান্যগন্য পরিবার। গাঁয়ের দু-তিন ঘর মোল্লা মৌলবিদের বাদ দিয়ে বাকি সকলে তাদের পছন্দ করে। গাঁয়ের সবচেয়ে প্রবীণ মৌলবির সন্দেহ, নাসির ছদ্মমুসলমান, বিধর্মী, মুসলমান সেজে রয়েছে, কাফের আহমেদিয়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে নাসিরের সম্পর্ক আছে। মুসলমানদের জাত মারার জন্যে আহমেদিয়াদের কাছ থেকে নাসির টাকা খায়। নাসিরকে একবার গ্রামছাড়া করার ছক করেছিল মৌলবি, সৈয়দ এমদাদউদ্দিন। গাঁয়ের বেশিরভাগ মানুষের সায় না থাকায় পেরে ওঠেনি। তবে দমেও যায়নি। নাসিবকে গাঁ থেকে তাড়াতে তারা এখনো লেগে আছে। নাসিরের বাড়িতে জয়া আসাব দুদিন পরে তাকে এসব বিবরণ শুনিয়েছিল, নাসিরের অবিবাহিত দু মেয়ের একজন, জমিনা পর ছোট বোন, গোলো বলেছিল, গাঁয়ে প্রত্যেক মেয়ের, নিজের বোরখা আছে। নিয়ম মেনে দিনের মধ্যে পাঁচবার ওজু করে নামাজ পড়তে হয় তাদের। ঘটনা শুনে জয়ার উপ্রকার হয়েছিল। খুব সাবধানে এখানে এগোতে হবে, সে বুঝে গিয়েছিল। মেয়েদের সামাজিক ভূমিকা নিয়ে ডেমরাতে যেভাবে মুখ খুলেছিল, বেহুলাতে তা চলবে না। মেপে কথা বলতে হবে। ইচ্ছেমতো পাড়া বেড়ানো চলবে না। বাড়ি থেকে জয়া না বেরোলেও তাব আসার খবর গাঁয়ের মানুষ জেনে গিয়েছিল। জারিনাবিবি যে কলকাতার পার্কসার্কাসবাসী, নাসিরের চাচা, মামুদ হোসেনের লেখাপড়া জানা নাতনি, মুখে মুখে এখবর রটে গিয়েছিল। পার্কসার্কাসে নাসিরের এক চাচা বাস করে, বেহুলার বয়স্ক মানুষরা তা জানলেও, চাচার নাম মামুদ হোসেন, তার জারিনা বেগম নামে শিক্ষিতা এক নাতনি আছে, এতো খবর তাদের জানার কথা নয়। দু-একজন শুনে থাকলেও বেশিরভাগ জানত না। শিক্ষিতা শহুরে মেয়ে, জারিনাকে দেখতে নাসিরের ভিটের পথে মানুষের

যাতায়াত বেড়ে গেল, গাঁয়ের বউ মেয়েরা, প্রথমে একজন, দুজন, তিনজন করে, পরে ঝাঁক বেঁধে সকাল সন্ধে দেখতে আসতে থাকল জারিনাকে। জয়া ভয় পাচ্ছিল, সে ধরা পড়ে যাবে, সে জারিনা নয়, গাঁয়ের মেয়েরা টের পেলে বেহুলাতে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। নাসিরের ভাইঝি পরিচয় অটুট রাখতে, তবু প্রাণান্তকর চেষ্টা চালাচ্ছিল সে, নাসিরচাচাকে সব বিপদ থেকে আড়াল করতে চাইছিল। সমুদ্রের ঢেউ যেমন একের পর এক তীরে আছড়ে পড়ে, বালিয়াড়িতে সফেদ দাগ রেখে সরে যায়, সেভাবে ঘটনা চলছিল নিজের নিয়মে। জয়াকে বেহুলাতে রেখে যাওয়ার চারদিন পরে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল আব্বাস, হপ্তা ঘুরতে এসেছিল চাকান, তার দু-দিন পরে ছিরু। আলাদা সাক্ষাৎকারে দেওয়া তিনজনের গাংনেগড় সম্পর্কিত বিবরণ জুড়ে সম্পূর্ণতা দিতে জয়ার অসুবিধে হয়নি। মাঝদুপুরে হাঁসগড়া মাঠের মধ্যে দিয়ে ছাতা মাথায় মুরারি ঘোষকে একা যেতে দেখে সুপার্থর মনে হয়েছিল, বিন্দু ভেঙে দৃষ্টান্ত স্থাপনের এমন মোক্ষম সুযোগ আর মিলবে না। তার রোখ চেপে গিয়েছিল। গণেশের চোখে চোখ রেখে ভ্লাদিমির উলিয়ানভ ইলিচ, যাকে দুনিয়ার মানুষ, রুশ বিপ্লবের নেতা 'লেনিন' নামে চেনে, তার মত সুপার্থ বলেছিল, 'নাউ অর নেভার', 'এখনই, অথবা কখনো নয়', মুরারিকে ছাড়া যাবে না, বিন্দু ভাঙার এটাই চরম মুহূর্ত, সেরা সুযোগ।

গণেশের দুচোখের মণি ধক করে জ্বলে উঠেছিল। মুরারি ঘোষের সংসারে দাসী, তার বিধবা মায়ের জীবনের যে অকথিত অন্ধকার থেকে তার জন্ম, সেখানে ন্যায্যত তার কোনো বাবা থাকার কথা নয়। তার জন্মের আগেই মুরারির চাকরানির পদ থেকে সন্তানসম্ভবা বিধবা মা কেন ছাঁটাই হয়ে শ্বশুরকুলের ভিটের বদলে, বাউড়িপাড়ায় শ্যাম বাউড়ির ঝুপড়িতে, তার ধর্মপত্নী হিসেবে নিক্ষিপ্ত হল, গাঁয়ের বুড়োরা তা জেনেও মুখ খুলতে সাহস পায় না। গল্পের মত তা শুনে, কমবয়সীরা মজা পায় এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ভুলে যায়। রূপবান গণেশকে দেখে বাউড়িপাড়ার যে সব মেয়েদের বুকের ভেতরটা এখনো 'কেমন কেমন' করে, তারাও আড়ালে তার জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে হাসাহাসি করে। তাকে নিয়ে মনের মধ্যে গোপন অভিলাষ জেগে উঠলেও তার ঘরণী হওয়ার কথা ভাবতে পারে না। নিজের জন্মপরিচয় নিয়ে গণেশ বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হলেও মুরারি আর তার মত মানুষদের ওপর বিষঘৃণায়, হয়তো সেটাই শ্রেণীঘৃণা, তাদের শাস্তি দেওয়ার সুযোগ খুঁজছিল সে। শ্রেণীযুদ্ধের সঙ্গে তার মনে সেই মুহূর্তে জেগে উঠেছিল আবাল্যের প্রতিহিংসা। সুপার্থর সংকেত পেতে তখনই তারা মুরারিকে খতমের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। গাংনেগড়ে সদ্য পা-রাখা সত্যমাস্টারের সায় না দিয়ে উপায় ছিল না। খতমের প্রস্তাব সুপার্থ দেওয়ার আগেই ফাঁকা মাঠে মাঝ দুপুরে ছাতামাথায় মুরারিকে তার খেতের দিকে যেতে দেখে সুপার্থর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গণেশ বলেছিল, অই দ্যাকো, মুরারি যাচ্ছে।

গণেশের চোখে যে ঝিলিক ছিল, বুঝতে সুপার্থর অসুবিধে হয়নি। গণেশের বাড়িতে এসে তিনজন মৌরলা মাছের তরকারি দিয়ে ভাত খেয়ে, মুখে গামছা বেঁধে, চাঁচকাটারি, ছুরি নিয়ে ঘিরে ফেলল মুরারিকে। মাঠের মাঝখানে নামিয়ে দিল তার লাশ। বিন্দু ভাঙার বিজয়বার্তা আশপাশের গাঁয়ের মানুষকে জানাতে তারা স্লোগান দিতে শুরু করতে বিপদ ঘটল। ঘটনাচক্রে, মুরারির ভাইপো পলাশ তখন গঞ্জে যাবার জন্য মোটরবাইক নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। কাকাকে বাঁচাতে মোটরবাইক চেপে হাঁসগড়া মাঠের চারপাশে ঘুরে তারস্বরে চ্যাচাতে থাকল, বাঁচাও, বাঁচাও। ডাকাত, ডাকাত। আমার কাকাকে ডাকাতরা টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলেছে। বাঁচাও, বাঁচাও। তার চিৎকারে আশপাশের গাঁ থেকে যেসব মানুষ বেরিয়ে এল, তাদের মধ্যে মুরারির পা-চাটা দালাল ছিল কয়েকজন। বাইকে চেপে পলাশকে চ্যাচাতে দেখে তারা ধাওয়া করল গেরিলা স্কোয়াডকে। হাঁসগড়া মাঠের শেষে, ডেমরা নদী পেরিয়ে, গোপালপুর লকগেটের কাছে পৌঁছে, দূরে পুলিসবাহিনীকে দেখে ফের ডেমরার দিকে গণেশ পালায়। উল্টোদিকে নদীর ধারে ঝোপে ঢুকে গিয়েছিল সুপার্থ। নদীর দু'তীর-বরাবর, গোল করে তাদের ঘিরে ফেলেছিল সাত গাঁয়ের মানুষ। ভিড়ের বেশিরভাগ গরিব মানুষ হলেও আগে থেকে ঘটনার আভাস না পেয়ে কী ঘটছে, বুঝতে পারেনি। ডাকাত ধরার হুজুগে মেতে উঠেছিল। ঘেরাও হওয়ার পরে, আর কেউ না হোক, আলের উঁচু জমিতে দাঁড়িয়ে, নিজেদের পরিচয় বলে, অন্তত সুপার্থ একটি ভাষণ দিতে পারত। সুপার্থ মুখ খোলেনি, আত্মপরিচয় জানিয়ে, প্রাণ বাঁচাতে যা করা দরকার, করেনি।

জয়ার কাছে ঘটনার এই অংশ সবচেয়ে বেশি দুর্বোধ্য ঠেকছিল। ছিরু, আব্বাস, চাকানকে বারবার প্রশ্ন করে যে উত্তর সে শুনতে চাইছিল এবং নিজেও খুঁজছিল, তা হল, গাঁয়ের গরিব মানুষ কেন তাদের জন্যে ঘরসংসার ছেড়ে যারা লড়তে এসেছিল, লড়াই-এর শুরুতে তাদের ডাকাত ভেবে তুলে দিল পুলিসের হাতে? পুলিসের হাতে দেওয়ার আগে অকথ্য পিটিয়ে আধমরা করে দিল? কোনো একটা পক্ষ ভুল করেছিল। তারা, কারা? দু-পক্ষেরই ভুল হতে পরে। বিনা প্রস্তুতিতে, ঝোঁকের মাথায় মুরারি ঘোষকে খতম করতে যাওয়া ঠিক হয়নি। কতটা প্রস্তুতি নিয়ে এরকম কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়, সুপার্থ আর তার সঙ্গীরা যে জানত না, তা এখন পরিষ্কার। এলাকার মানুষের, অন্তত নব্বই ভাগের সমর্থন ছাড়া এ কাজ করা সম্ভব নয়। তার জন্যে দু-চার দিন নয়, এমনকী দু-চার মাসও নয়, আরো লম্বা সময় ধরে একটা এলাকায় মাটি কামড়ে পড়ে থেকে সেখানকার মানুষকে লড়াই করার মানসিকতায় পৌঁছে দিতে হয়। সবরকমভাবে উন্নত করতে হয় তাদের চেতনা। বড় তাড়াতাড়ি, পথ আর সময় সংক্ষেপ করতে, দশ বছরের মধ্যে সমাজ বদলানোর কাজ শেষ করতে শুধু সুপার্থ নয়, গোটা দল ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সুপার্থ এবং তার মত অনেককে জেলখানায় বসে এই ব্যর্থতার মাশুল দিতে হচ্ছে।

আব্বাসের মুখ থেকে জয়া শুনেছিল. সুপার্থ আর তার দুই সঙ্গীকে প্রথমে মগরা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনজনকে প্রচণ্ড মারে। সবচেয়ে বেশি মার খায় পালের গোদা সুপার্থ। জেলপালানো আসামী সুপার্থকে জেলার পুলিসসুপার পর্যন্ত দেখতে এসে একটানা দুঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। তাদের কোনো প্রশ্নের জবাব সুপার্থ দেয়নি। সে শুধু বলে গেছে, আমার কাজ আমি করেছি, আপনাদের কাজ আপনারা করেছেন। এর বেশি স্বীকারোক্তি আমার দেওয়ার নেই। মরে গেলেও দিতে পারব না।

সুপার্থকে তখন নিংড়োনো শুরু হয়। তার কাছ থেকে খবর বার করতে নির্যাতনের সব রকম পদ্ধতি, ব্যবহার করেছে পুলিস। মানুষকে রাস্তার পাগলা কুকুর ঠাওরালে যেভাবে শায়েস্তা করা হয় সুপার্থর ক্ষেত্রে তাই করা হয়েছিল। মগরা থানায় দু-দিন তাদের রেখে তৃতীয় দিনে নিয়ে যাওয়া হয় চুঁচুড়া সদর থানায়। সেখানে একদিন রেখে, পরের দিন সকালে চুঁচুড়া আদালতের আদেশে হুগলি জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাদের। জেলে পাঠানোর আগে থানা হাজতে আরো এক দফা সুপার্থর ওপর দিয়ে নির্যাতনের ঝড় বয়ে যায়। নিজের ঘরে টেবিলে রাখা এক বিপ্লবী নেতার ছবি রেখে, সুপার্থকে তা দেখিয়ে, তার মুখ থেকে নেতাকে 'শুয়োরের বাচ্চা' বলাতে চেষ্টা করেছিল বড়বাবু। একবার নয়, বারবার। যতবার বলেছিল, বল এই নেতা শুয়োরের বাচ্চা, সুপার্থ বলেছিল, বলব না।

বল এই নেতা জারজ সন্তান।

বলব না।

যতবার, সে বলতে অস্বীকার করছিল, তাকে পিটিয়ে শরীরের হাড়মাংস আলাদা করে দিতে চাইছিল বড়বাবু। হুগলি জেলে সুপার্থ যখন পৌঁছোল, তার দুটো হাত ভাঙা, পাটের দড়ি বেঁধে গলায় ঝোলানো, খালি গা, শরীরে পোশাকে বলতে স্রেফ একটা আন্ডারউইয়ার। লাল দাগে সারা শরীর বোঝাই। পুরনো কিছু কালসিটে ছিল বুকে, পিঠে, উরুর নীচে। সেগুলো সি আর পি-র বুটের দাগ। সুপার্থকে অ্যারেস্ট করার পরে, তাকে মাটিতে ফেলে, তার সারা শরীর সশস্ত্র বাহিনীর পুলিস মাড়িয়েছিল। গণেশ আর সত্যমাস্টারের একটা করে হাত, দড়ি দিয়ে গলা থেকে ঝুলছিল। তাদের দশা দেখে জেলে আটক বন্ধু বন্দিদের একজন, মাঝবয়সী মানুষ, হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিল। রাতের রুটি তরকারি খেতে পারেনি আর একজন। বিকেলের আলো ছিল তখনো। জেলে নতুন আমদানি তিনজনকে প্রথমে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ওপর ওপর ব্যান্ডেজ, তাপ্পি লাগিয়ে 'কনডেমনড সেলে' যখন পুরে দেওয়া হল, তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। সেলের ভেতরে, ঘন অন্ধকারে কয়েক সহস্র মশার আগ্রাসনে রাতটা ভূতের মতো সুপার্থ কাটিয়েছিল।

হাঁসগড়ার মাঠ থেকে সুপার্থর ধরা পড়ার পরে, ঘটনাগুলো একদিনে নয়,

একজনের মুখ থেকে নয়, কয়েক খেপে চাকান, আব্বাস, হিরুর কাছ থেকে জয়া শুনেছিল। কান্নার প্রতিধ্বনির মত পুনরুক্তি, কথা হারানো যন্ত্রণার স্তব্ধতা আর তিনজন মানুষের মুখ থেকে নিঃসৃত নানা ভঙ্গির বাচন, ভিন্ন মাত্রার আখ্যানের ভেতরে যে অকথিত প্রশ্নের উত্তর, জয়া তা শুনতে চাইছিল। প্রশ্নটা সেই এক-ই, গরিব মানুষের স্বার্থে, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে, জীবনকে মূল্য ধরে দিয়ে যারা লড়াই করতে নেমেছিল, তাদের কেন পিটিয়ে খাল খিঁচে দিল গরিব মানুষ, কেন তুলে দিল চিরশত্রু পুলিসের হাতে? গ্রামের গরিব মানুষরা কি বেকুব, না ধূর্ত, অথবা জড়ভাব? প্রশ্নটা উল্টোভাবেও জয়া ভাবছিল, বিপ্লবীরা কি কাণ্ডজ্ঞানহীন, হঠকারী অথবা উন্মাদ? প্রশ্নের জবাব, সেই মুহূর্তে পাওয়ার সুযোগ ছিল না। নানা কিস্তিতে, ছিরু, আব্বাস, চাকানের বিবরণ শোনার সময়ে নিঃশব্দ কান্নায় তার বুকের ভেতরটা মুচড়ে যাচ্ছিল। সে ভাবছিল, সুপার্থর সঙ্গে সেদিন সে থাকলে, মুরারি ঘোষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ঘটনা ঘটত না। সুপার্থকে সে ঠেকাতে পারত। ডেমরার মেয়েদের মাথাতে মধ্যবিত্ত আত্মরক্ষার চিন্তা ঢোকাতে যে সুপার্থ বারণ করেছিল তাকে, সে যে মধ্যবিত্ত দুঃসাহসিকতাবাদ প্রচাব করছে, স্পষ্টভাষায় এ কথাটা শুনিয়ে দিত। সুপার্থকে ভালবেসে, তার কবিতাকে ভালবেসে, বিপ্লবের জন্যে তার আতুরতাকে ভালবেসে, সন্ধের আলো অন্ধকার ছড়ানো, নাসির শেখের বাড়ির দাওয়ায়, চাকান টুডুর মুখোমুখি বসে জয়া অনুভব করল, তার ভালবাসায় খাদ ছিল। দুঃসাহসিকতাবাদের বিরুদ্ধে বুকের মধ্যে সত্যের যে অনুরণন চলছিল, তা সজোরে জানানো দূরে থাকুক, মিনমিন করেও সে বলতে পারেনি। বিন্দু ভাঙা তত্ত্বের যথার্থতা নিয়ে মনে সন্দেহ থাকলেও তা চেপে গেছে। মেনে নিয়েছে সুপার্থর ব্যাখ্যা। কেন মেনে নিল, চিন্তার অস্বচ্ছতার কাছে কেন আত্মসমর্পণ করল? ভালবাসার দোহাই দিয়ে, প্রেমিকের ভেজাল ওষুধের ব্যবসা যেমন মেনে নেওয়া যায় না, তেমনি নতুন সমাজ গড়ার সঙ্কল্পের নিষ্ঠুর অমানবিকীকরণ মেনে নেওয়াও অসম্ভব। প্রেম মূল্যবান, প্রেমিক হয়তো তার চেয়ে বেশি মূল্যবান, সবচেয়ে মূল্যবান, সত্যকে আঁকড়ে থাকা। অঙ্কের সত্য নয়, হৃদয়ের স্বতোৎসার সত্য, যার নাম প্রকৃত ভালবাসা। ভালবাসার দোহাই পেড়ে সত্যের সঙ্গে রফা করে নিজেকে ঠকিয়েছে সে, সুপার্থর ক্ষতি করে দিয়েছে। ভালবাসার সবচেয়ে বড় শত্রু, অন্ধ ভালবাসা। পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের মধ্যে এই অন্ধতা বেশি থাকার জন্যে তাদের ন্যাকা বলা হয়। ছেলেবেলা থেকে ন্যাকামি, তার অসহ্য ঠেকলেও সে নিজে কখন ন্যাকা বনে গেছে, বুঝতে পারেনি।

বিন্দু ভাঙার কর্মসূচিতে সন্দেহ জাগলেও সুপার্থর জন্যে জয়ার মনটা হুহু করছিল। জেলে গিয়ে সুপার্থর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব না হলেও তার খবর পেতে জয়া ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। চেষ্টা করলে সুপার্থর সঙ্গে যোগাযোগ করা অসম্ভব নয়। ছিরু, আব্বাস, চাকান যে খবর জোগাড় করে আনছে, তা বিশ্বাসযোগ্য হলেও সুপার্থর

কাছ থেকে সরাসরি আসেনি। পাঁচ মুখ হয়ে তাদের কাছে এসেছে। তারা শোনাচ্ছে জয়াকে। সে খবরে সত্যতা থাকলেও কতটা দুধ, কতটা জল, বেহুলায় থেকে জয়ার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। সুপার্থর সঙ্গে সে নিজে যোগাযোগ করতে চায়। দলের সঙ্গে নিশ্চয় এর মধ্যে তার যোগাযোগ হয়েছে। সেই সূত্রে কিছু খবর পাওয়া গেলেও অনেকটা অজানা থেকে যাবে। দলের বিচারে তাকে যতটা জানানোর দরকার পড়বে, তাই জানাবে। সুপার্থর পুরো খবর সে কখনো জানতে পারবে না। জানার দুটো রাস্তা আছে। সুপার্থর সঙ্গে তার বাবা আর দিদিকে দেখা করতে জেলে পাঠালে, জীবন্ত একটা যোগাযোগ গড়ে তোলা যায়। তারা নিশ্চয় এর মধ্যে হুগলি জেলে গিয়ে সুপার্থর সঙ্গে দেখা করেছে। সাক্ষাৎকারের সময় কড়া পাহারা থাকলেও, জয়া শুনেছে, তাদের চোখ এড়িয়ে চিঠি লেনদেন করা যায়। চায়ের প্যাকেটে গুঁড়ো চা ঢেকে, পানের খিলিতে মোড়কের কাজে লাগিয়ে, সন্দেশের বাক্সের মধ্যে, এমনকি সন্দেশের ভেতরে চিরকুট গুঁজে, তাকে ও আবার আগের মত পরিপাটি চেহারা দিয়ে, বন্দির কাছে পৌঁছে দেওয়ার ঘটনা একদা রাজনীতি করা, জেলখাটা মামাদের মুখ থেকে জয়া যেমন, শুনেছিল আজো তা চালু রয়েছে। জেলের ওয়ার্ডার, জমাদাররাও পাঁচ-দশ টাকা পেলে, আনন্দের সঙ্গে এ কাজে সাহায্য করে। তাদের একটাই শর্ত, ঘটনাটা যেন পাঁচকান না হয়। গোন্দলপাড়ায় সুপার্থর বাড়িতে গিয়ে তার বাবা তেজেশ সরকারের সঙ্গে একবার দেখা করলে, কাপালিকের মত চেহারা, স্নেহশীল সেই মানুষটা যে পরম আদরে তার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে, এ নিয়ে জয়ার সন্দেহ নেই। জয়াকে দেখার পর থেকে তাকে মা, কন্যা, এমনকী জগজ্জননীর সমতুল্য ভেবে নিয়েছে কালীভক্ত এই মানুষটি। তেজেশকে দিয়ে জেলের মধ্যে সুপার্থর সঙ্গে চিঠি লেনদেনে যেমন অসুবিধে নেই, তেমনি গজঘণ্টায় সুপার্থর যে দিদি আছে তাকেও কাজে লাগানো যায়। দলের সঙ্গে জেলে আটক, সুপার্থর এই ক'দিনে নিশ্চয় যোগাযোগ ঘটে গেছে। ছিরু, আব্বাস, চাকান খেপে খেপে সুপার্থর যত খবর তাকে শুনিয়েছে, সবটাই জেনেছে দলীয় সূত্র থেকে। তাদের জানার বাইরে আরো খবর অবশ্যই রয়েছে, যা জয়া পেতে চায়। বেহুলা থেকে সাহেববাগানের বাড়িতে যাওয়া কতটা নিরাপদ, জয়া ভেবে পাচ্ছিল না। প্রথমে ডেমরায় কানাই মুর্মুর বাড়িতে গিয়ে খোঁজখবর করে, তারপর সাহেববাগানে যাওয়া ভাল। কলেজের কিছু বন্ধু আছে সাহেববাগানের আশপাশের পাড়াতে, তাদের কারো বাড়িতে গিয়ে উঠলে, সে কি ভয় পাবে? সমীরকাকু অ্যারেস্ট না হলে, তার বাড়িতে চলে যেত। জয়া অস্থির বোধ করছিল। দু-এক দিনের মধ্যে সুপার্থর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছিল। ভোরবেলা সুপার্থর বাড়ি গিয়ে হাজির হলে কেমন হয়? সুপার্থর মা-বাবা নিশ্চয় তাকে দেখে বিপন্ন বোধ করবে না। দেওয়ালে তাদের পিঠ এমনভাবে ঠেকে গেছে, যে হারানোর কিছু নেই। বড় ছেলে উন্মাদ কমল, দমদম জেলের পাগলাগারদে আটক রয়েছে। ছোটো ছেলে, সুপার্থ জেলে। তার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগের সঙ্গে

রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের মামলা দায়ের করা অবশ্যম্ভাবী, এ নিয়ে জয়ার সন্দেহ নেই। বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, এমন কী মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। প্রাণে বাঁচলে জেল থেকে কবে, ছাড়া পাবে, আদৌ পাবে কিনা, এ নিয়ে জয়ার সন্দেহ রয়েছে। আদালত মৃত্যুদণ্ড না দিলেও যাবজ্জীবন সশ্রম কারাবাস অনিবার্য যাবজ্জীবন কারাবাসের সময়কাল নিয়ে নানা ব্যাখা থাকলেও আইন-আদালতে অবিশ্বাসী সুপার্থ আর তার বন্ধুরা যে নিজেদের মুক্তির ব্যবস্থা নিয়ে নিজেরাই ভাবতে শুরু করেছে, অনুমান করতে জয়ার অসুবিধে হল না। গোঁদলপাড়ায় সুপার্থর বাড়িতে গেলে কিছু খবর, সে পেতে পারে।

বেহুলা ছেড়ে পরের দিন সকালে ডেমরায় কানাই মুর্মুর বাড়িতে যাওয়ার চিন্তা মাথায় নিয়ে নাসিরের দু মেয়ে জমিনা আর গোলোকে সন্ধের পরে, জয়া যখন পুরনো দিনের বীরাঙ্গনাদের জীবনকাহিনী শোনাচ্ছে, তখনই ছিরুকে নিয়ে নাসির ঘরে ফিরল। দাওয়ায় যে কুপি জ্বলছিল, সেটা ফুঁ দিয়ে নাসির নিভিয়ে দিতে গোটা বাড়ি অন্ধকার হয়ে গেল। অন্ধকারে থাকতে চাইছিল নাসির। বাইরের লোকের নজরে রাখতে চাইছিল নিজেকে এবং পরিবারের সকলকে। গোপন কিছু শোনাতে নাসির এগিয়ে এল জয়ার দিকে। নাসিরের পাশে ছিরু। জয়াকে ফিসফিস করে নাসির বলল, আমাদের গাঁয়ের মৌলবিসাহেব আজ সকালে থানায় গিয়ে এমন কিছু খবর দিয়েছে, যা ডিমব্যাপারি কওসর শুনেছে। থানার বড়োবাবুকে ডিম দিতে গিয়েছিল কওসর। ফি-হপ্তায় সে একডজন ডিম দেয় বড়োবাবুকে।

লোকে ভাবে সে পুলিসের গুপ্তচর। সবটা মিথ্যে নয়। তবে পুলিসের হাঁড়ির কিছু খবর সে আমাকেও দেয়। কাকপক্ষী তা জানতে পারে না। বড়োবাবুর ঘরে ঢোকার আগে, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কওসর শুনেছে, বড়োবাবুকে মৌলবি বলেছে, আমাদের গাঁয়ের নাসির শেখের বাড়িতে জারিনা নামে যে মেয়েটা এসে উঠেছে, তার আসল নাম জারিনা নয়। মেয়েটা মুসলমানও নয়। আমার ধারণা তার বদ মতলব আছে।

কওসরকে তখন ঘরে ঢুকতে দেখে মৌলবি চুপ করে যেতে, বড়োবাবু কওসরকে নজর করে বলেছিল, ডিম রেখে এখন যা। কওসর পালিয়ে আসে। খবর শুনে, জয়ার মাথায় বাজ না পড়লেও আধঘণ্টার মধ্যে নাসিরের বাড়ি ছেড়ে নিজের থলিটা নিয়ে খিড়কির পথ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। কৃষ্ণপক্ষের রাত। সামনে দিকচিহ্নহীন অন্ধকার মাঠ। ডেমরা ঠিক কতদূর, মাইলের হিসেব ছিরু বলতে না পারলেও সেখানে পৌঁছোতে রাত প্রায় কাবার হয়ে যাবে, অবলীলায় জানিয়ে দিল। মাঠ-ঘাট, জলা-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ডেমরা যাওয়ার রাস্তা তার নখদর্পণে। অন্ধকার যতই ঘন হোক, পথ চিনতে ভুল হবে না। গাঁয়ের পেছনের পথ দিয়ে জয়া, ছিরুকে বেহুলার বাইরে, প্রায় এক মাইল এগিয়ে দিয়ে নাসির বলল, ইনসাল্লাহ রসুলের দোয়ায় তোমাদের গায়ে কুটোটা লাগবে না। নিশ্চিন্তে

ডেমরায় পৌঁছে যাবে। ছাড়াছাড়ি হওয়ার আগে নাসিরকে জয়া বলল, আপনাকে বোধহয় বিপদের মধ্যে রেখে গেলাম।

নাসির বলল, পীর সেলিম চিসতির দোয়ায় সব ঝামেলা আমি সামলে নেব। তোমার যেন কোনো বিপদ না হয়!

আঠারো

রাতের শেষে ডেমরা পৌঁছে, কানাই মুর্মুর বাড়িতে সকাল নটা থেকে প্রায় সন্ধে পর্যন্ত জয়া ঘুমিয়েছিল। পরের সকালে বেনাদহের হাট পর্যন্ত তাকে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিল কানাই মুর্মুর বউ, জয়ার পাতানো মা। হারানো মেয়ে ফিরে পাওয়ার আনন্দ, জয়াকে দেখে ছড়িয়ে পড়েছিল মায়ের মুখে। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল তার আদিবাসী মা। পরের দিন, সকাল হওয়ার আগেই জয়াকে নিয়ে, হাটে যাওয়ার জন্যে মা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। আগের সকালে, চোখের সামনে সূর্য উঠতে দেখে জয়া যতটা আনন্দ পেয়েছিল, পরের দিন ভোরে পুব আকাশে পরিব্যাপ্ত আলো, নানা রঙের গভীর থেকে ওঠা সূর্যের কিরণ দেখে ততোধিক ভরে গিয়েছিল তার বুক। উজানির সঙ্গে যে পথ দিয়ে এক সাল আগে সে ডেমরায় এসেছিল, প্রায় এক, অথচ কিছুটা আলাদা পথে বেনাদহের হাটে তাকে নিয়ে চলল মা উজানির তার মা-ও বটে। বেলা বাড়ার সঙ্গে চড়ছিল আকাশের রোদ। লু হাওয়া বইছিল। মেঠো পথ ছেড়ে আলের ওপর উঠে লম্বা প্রান্তর পাড়ি দিয়ে মা বলল, সামনে নতুন গাঁ। ওখানে মদন কিসকুর ঘরে দু-দণ্ড বসে, জিরিয়ে নিয়ে তারপর বেরোব রে বিটি। এক নাগাড়ে হাঁটতে এখন কষ্ট হয়, হাঁপ ধরে।

মদন কিসকু কে, জয়া জানতে চাইলে প্রৌঢ়ার তুবড়ে যাওয়া, হাড় বেরোনো মুখে এক চিলতে রহস্যের হাসি ফুটে উঠল। বলল, সে এক মরদ। অনেক পুরনো দিনের কথা সে সব। ওর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা পাকা হয়েছিল, তারপর ভেঙে গেল।

কেন?

মা মনে করতে চাইল মদনের সঙ্গে তার বিয়ে ভেস্তে যাওয়ার কারণটা। স্মৃতি হাতড়ে খুঁজে না পেয়ে ফোঁস করে লম্বা একটা শ্বাস ফেলে বলল, কী যেন ঘটে গেল। জয়া আর প্রশ্ন করল না। দশ মিনিটে নতুন গাঁয়ে মদনের বাড়িতে জয়াকে নিয়ে মা পৌঁছে গেল। ফাঁকা বাড়ি। উঠোনের এক কোনে ছায়ায় বসে সাত-আট

বছরের এক বাচ্চা নিয়ে জরাজীর্ণ এক বুড়ো, অ্যালুমিনিয়ামের বাটি ভরে কিছু খাচ্ছিল। কানাই মুর্মুর বউ, তার সঙ্গে অচেনা ফরসা এক মেয়ে জয়াকে দেখে সে তড়বড় করে উঠে দাঁড়াল। জলে বোঝাই বাটির পাশ ছেড়ে শিশুটি নড়ল না। বাটিতে হাত ডুবিয়ে ভিজে মুড়ি তুলে মুখে ঢোকাল। উজানির মা আর জয়াকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে মদন বসাল। জয়াকে দেখিয়ে উজানির মা জানাল, উজানির স্কুলের বন্ধু, এই মেয়ে, আমার আর একটা বিটি। উজানির বিয়েতে এসেছিল। এখন ঘরে ফিরছে। মদন বলল, তুমার বিটি যখন, তখন আমারো বিটি।

দুটো খালি অ্যালুনিয়মের বাটি, একটা হাঁড়ি, ছোটো একটি ধামায় মুড়ি বোঝাই করে নিয়ে এল মদন। অ্যালুমিনিয়মের বাটিতে হাঁড়ি থেকে মদন যা ঢালল, ভক করে গন্ধ আসতে জয়া চিনল, হাঁড়িয়া। হাঁড়িয়ায় মুড়ি ভিজিয়ে নাতিকে নিয়ে মদন খাচ্ছিল। মদনের বউ মারা গেছে। ছেলে আর বউ গেছে পাশের গাঁয়ে মুনিষ খাটতে। নাতিকে আগলাচ্ছে অকালে বুড়িয়ে যাওয়া মদন। তোবড়ানো অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে হাঁড়িয়া ঢেলে মুড়ির ধামাটা জয়ার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, খাও গো বিটি খাও।

জয়া যে উজানির স্কুলের বন্ধু, তার বিয়েতে এসেছিল, মদনকে আগেই জানিয়ে দিয়েছে মা। জয়াকে তবু প্রথম দেখছে এমন ভঙ্গিতে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে মদন চোখ ঘুরিয়ে নিল। সম্ভবত মনে করতে পারল জয়ার পরিচয়। বয়স্ক দুই স্ত্রী, পুরুষ নিচু গলায় গল্প করছে। পুরনো দিনের স্মৃতিচারণায় তারা যে মশগুল, তাদের দারিদ্রক্লিষ্ট মুখের উদ্ভাসন দেখে জয়া টের পায়। ষাট পেরনো দুই স্ত্রী-পুরুষ যৌবনকালের স্মৃতিচারণায় বুঁদ হয়ে যখন ঘনঘন হাঁড়িয়ার বাটিতে চুমুক দিয়ে মুড়ি সমতে জলের মত নিরীহ অথচ জ্বলন্ত তরল গলাধঃকরণ করছে, জয়া তখন বাটি নিয়ে ঠোঁটের কাছাকাছি এনে নামিয়ে রাখছে। গাংনেগড়ে আসার পর থেকে হাঁড়িয়া খাওয়ার ডাক আগেও কয়েকবার পেয়েছে সে। বিশেষ করে উজানির বিয়েতে যখন হাঁড়িয়ার ফোয়ারা ছুটেছে, নবদম্পতি পর্যন্ত কয়েক পাত্র খেয়ে নাচের আসর মাত করে দিচ্ছে, তখনো জয়া এক চুমুক খায়নি। অথচ সেই সকালে প্রৌঢ় প্রেমিকযুগলের ইতি টেনে দেওয়া অবসিত প্রেমের স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িয়াপাত্র ঠেলে সরিয়ে রাখতে পারল না। খিদেও পেয়েছিল তার। হাঁড়িয়াতে মুড়ি ভিজছে। ধামাতেও কয়েক মুঠো মুড়ি ছিল। কানাই মুর্মুর ঘরে চট করে এক মুঠো মুড়ি, কাল সকালে খালি পাঁচটা টিনের কৌটো ঝেড়েও মেলেনি। পেট ভরে খেয়েছিল নাসির শেখের ঘরে, আটচল্লিশ ঘন্টা আগে। আগের দিন দু বেলায় যা খেয়েছে, তা আধপেটার চেয়ে কম। খিদেতে তার নাড়ি পাক খাচ্ছিল। শ্বাস বন্ধ করে এক চুমুক হঁড়িয়া খেয়ে টের পেল কীভাবে খাদ্যনালী দিয়ে পাকস্থলীতে খাবার পৌছে যায়। চোখে না দেখেও নির্জের পাচন যন্ত্রটা চিনতে পারল। বিস্বাদ হয়ে গেল মুখ। পেটে যা ঢুকল তখনই বেরিয়ে আসার জন্যে বমির দমক ঠেলে উঠছে টের পেয়ে ধামা থেকে এক মুঠো মুড়ি তুলে মুখে ঢোকাল। খালি পেটে হাঁড়িয়া ঢুকে এমন

লম্ফঝম্ফ করবে তার ধারণা ছিল না। মদনের হাঁড়িয়ার বাটিতে হাত ডুবিয়ে হাঁড়িয়াসিক্ত, নেতানো মুড়ি তুলে দিব্যি খেয়ে চলেছে তার নাতি। বয়স, খুব বেশি হলে চার কি পাঁচ। মদন, উজানির মা তাকিয়ে দেখছে না শিশুটিকে। কি বা দেখার আছে, এমন মুখের ভাব দুজনের। জয়া ভাবছিল, শিশুটির মত সে-ও ভিজে মুড়ি তুলে খেলে খুব কি অশোভন দেখাবে? ধামায় অবশিষ্ট দু-এক মুঠো মুড়ি খেয়ে শেষ করে দিলে ক্ষতি কি? খাওয়ার জন্যেই মুড়ি দেওয়া হয়েছে তাকে। লজ্জা-ভয় ত্যাগ করে সে আরো একমুঠো মুড়ি খেল। দুই পুরনো প্রেমিকের কেউ তাকাল না। তাদের বাজিয়ে দেখার জন্যে জয়া কাঁসার বাটি তুলে ফের ছোট করে এক চুমুক হাঁড়িয়া সন্তর্পণে পেটে চালান করল। নরম মাটিতে লাঙলের সুতীক্ষ্ণ ফাল টানার মত তরল আগুন ধীরে ধীরে পেটে পৌঁছোনোর পরে এবার কিন্তু তলপেটে মোচড় লাগল না। সাঁওতাল বুড়ো বুড়ি চল্লিশ বছর আগের নাচের আসরের গল্প ফেঁদেছে। আসরের মধ্যে হঠাৎ লাফ দিয়ে এক বুনো ভাম ঢুকে পড়তে দেখে মেয়েরা কেমন ভয় পেয়েছিল, মদনের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল উজানির মা, তখন তার ষোলো বছর, কানাই মুর্মুর বৌ হয়নি, মদনের কুড়ি, আহা, কী চমৎকার ছিল সেই দিনগুলো। পথ ভুল করে আসরে ঢুকে পড়ে সেই তেজি জন্তুটা বেঘোরে মারা পড়ল। তরুণ সাঁওতাল শিকারিদের রাতের ভোজ বনে গেল মৃত ভামের নাদুসনুদুস শরীর।

উজানির মা বলল, পথ ভুল করলে, এমনই হয়। হ হ। মদন সায় দিয়েও পরে মুহূর্তে বিড়বিড় করল, কী জানি! ক্রমশ নেশা চেপে ধরছে দুজনকে, তাদের গল্পের ঘোর ছুঁয়ে ফেলেছিল জয়াকে। ত্রিশ, চল্লিশ বছর পরে সে-ও কি এই দুই প্রৌঢ়ের মত স্মৃতিতে আবিষ্ট হয়ে থাকবে? সুপার্থ কি তখন থাকবে তার পাশে? সুসজ্জিত, নতুন সেই পৃথিবী থেকে চিরকালের মত কেটে যাবে আজকের এই তিমির? কয়েক চুমুক হাঁড়িয়ার সঙ্গে হাড়িয়াতে ভেজানো কিছু মুড়ি পেটে ঢুকে মস্তিষ্কের চারপাশে এমন বিকীরণ ঘটাবে জয়া ভাবেনি। স্বপ্ন দেখার, এমন সহজ, শস্তা উপায় আছে এবং জেগে থেকে তা দেখা যায়, জেনে সে অভিভূত হল। সবচেয়ে তাকে মুগ্ধ করেছে পুরনো প্রেমিকের কাছে উজানির মায়ের এই ছুটে আসা, স্মৃতির ঝাঁপি খুলে বসে নিরন্তর দুই গাঁওবুড়োবুড়ির কামগন্ধহীন স্মৃতিচারণা। কোনো জড়তা নেই, সঙ্কোচ নেই। গাঁয়ের লোক খবর পেয়ে দেখতে আসছে জয়াকে, উজানির মায়ের সঙ্গে ঘরসংসার নিয়ে কথা বলছে, হাসছে, বেদনাতুর হচ্ছে, মানবিক প্রতিক্রিয়ার কোনো খামতি নেই, বুড়োবুড়ির প্রেম নিয়ে পরিহাস নেই, প্রকৃতির মত সর্বংসহা, গাঁয়ের গরিব মানুষের এই মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে জয়ার আগে কোনো ধারণা ছিল না।

উনিশ

মাঝ-দুপুরে উজানির মায়ের সঙ্গে বেনাদহের হাটে জয়া যখন পৌঁছল, তার আগে আব্বাস, চাকান সেখানে এসে গিয়েছিল। খেন্দুলার নাশির শেখর ঘর থেকে জয়াকে তুলে কানাই মুর্মুর বাড়িতে দিয়ে আব্বাসের কাছে গিয়েছিল ছিরু। জয়াকে ধরতে পুলিস নেমে পড়েছে, যে কোনো সময়ে তারা এসে পড়তে পারে, শুনে আব্বাস মুখে কিছু না বললেও ছিরুকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে কাজের ধাপগুলো ছকে নিয়েছিল। গাংনেগড় থেকে কিছুদিন শহর এলাকায় গা-ঢাকা দিয়ে থাকলে জয়ার বেশি নিরাপদ, আঁচ করে তাকে নিয়ে বেনাদহের হাটে আব্বাস চলে আসতে বলেছিল উজানির মাকে। মা না পারলে, মেয়েদের কেউ যেন হাট পর্যন্ত জয়ার সঙ্গী হয়, এই ছিল আব্বাসের নির্দেশ। ঘরের মেয়েদের বদলে মা নিজেই জয়ার সঙ্গী হয়েছিল। বেনাদহের হাটের পথে আব্বাস আগেই রওনা দিয়েছিল। পথে বেদেডাঙায় ঢুকে ডেকে নিয়েছিল চাকানকে। মুরারি ঘোষ খুন হতে এলাকা জুড়ে যে শব্দহীন চাঞ্চল্যের ঘেরাটোপ তৈরি হয়েছিল, বাইরে থেকে তার আভাস পাওয়া না গেলেও বেমক্কা ধরপাকড় শুরু করেছিল পুলিস। বেশির ভাগ নিরীহ মানুষকে ধরে হাজতে পুরছিল। ছিরু, আব্বাস, চাকান আগেই ঘর ছেড়ে প্রতিবেশী পাঁচ গাঁয়ে রাত কাটাতে শুরু করেছিল। কানাই মুর্মু চলে গিয়েছিল ডেমরার পাশের গাঁ বড়কুলিতে। সারাদিন নিজের ঘর গেরস্থালির কাজ করে সন্ধের পরে বড়কুলি চলে যেত। মুরারি ঘোষ খতম হওয়ার পরে কানাই-এর বাড়িতে দু-বার প্রথমে ভোররাতে, পরে মাঝরাতে পুলিস যখন হানা দেয় মেয়েরা ছাড়া ঘরে কেউ ছিল না। দ্বিতীয়বার চড়াও হওয়ার রাতে কানাই-এর দুই মেয়ে কুরচি আর মহুলিকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও তখনকার মত সেই ইচ্ছে সংবরণ করে চলে যাওয়ার আগে পুলিশ বলেছিল, কানাই মুর্মু আর শহর থেকে এসে, এই পরিবারে আশ্রয় নেওয়া, জয়া ওরফে প্রীতি নামে মেয়েটা পালিয়ে রেহাই পাবে না। তারা যেখানেই লুকিয়ে থাকুক, তাদের খোঁজে পুলিস তাড়াতাড়ি ফের চড়াও হবে। তাদের না পেলে পরিবারের বড়ো দুই মেয়েকে তুলে নিয়ে গিয়ে হাজতে ঢোকাবে। আব্বাস, ছিরু, চাকানের ঘরেও একাধিকবার হানা দিয়ে কাউকে ধরতে পরেনি। না পেরে, একই কথা বলেছিল। পোষা হাঁস-মুরগির সঙ্গে ঘরের মেয়েদের তুলে নিয়ে যাবে। চাকান—ছিরু, আব্বাস, এলাকা যত কর্মীর টের পাচ্ছিল, ঘটনা গড়াতে শুরু করেছে, তাদেরও থেমে থাকার উপায় নেই। ঘটনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাদের আলাদা, গোপন পথে চলবে হবে। লুকোচুরির সেই পথে তারাও নিজেদের মত ঘর গোছাতে গিয়ে অনুভব করছিল সুপার্থর অভাব। হুমলোকুমলোর বিলের ধারে তিরধনুক চালানো অনুশীলন করা থেকে, যুদ্ধের জন্যে ধাপে ধাপে তৈরি হওয়া এবং জয়ের ঝাণ্ডা কাঁধে নিয়ে ময়দান থেকে ফেরার রূপরেখা, সুপার্থ

উজ্জ্বল রঙে এঁকে তুলছিল, তাকে পুলিস ধরে নিয়ে যেতে সেই ছবি কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে গেলেও একেবারে মুছে যায়নি। সবচেয়ে বড় কথা, পুলিসি নির্যাতন দুহাত ভেঙে জেলে ঢুকেও সুপার্থ আগের মতো উদ্দীপনায় ফুটছে। মুক্তির দশকের অনিবার্যতায় তার মুখ দিয়ে ফুলঝুরির মতো কবিতা ঝরছে। গোপন সূত্রে খবর পাঠিয়েছে, দলের নির্দেশ মত যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব জেল ভেঙে সে বেরিয়ে আসছে। গাংনেগড়ে ফিরতে তার বেশি সময় লাগবে না। কোনো রাষ্ট্রীয় আইনের সাধ্য নেই তাকে আটকে রাখতে পারে। জেল ভাঙার কাজ হাসিল করতে জেলের ভেতরে সশস্ত্র বাহিনী তৈরি করছে সে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, বিপ্লব জয়যুক্ত হয়ে যেমন তাদের বন্দিত্ব থেকে মুক্তি দেবে, তেমনি বন্দিদশা থেকে তদের মুক্তির লড়াই ত্বরান্বিত করবে বিপ্লবকে। অবিচ্ছিন্ন এই দুই পর্বকে সংযুক্ত করতে তাদের গোপন কর্মসূচি দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

দলের কর্মসূচি মেনে, জেলের ভেতরে সঙ্গীদের দিয়ে সুপার্থ কতটা এগিয়েছে, জানার আগ্রহ জয়ার যেমন ছিল, তেমনি ছিরু, আব্বাস, চাকানও তাকিয়েছিল সুপার্থর দিকে। জেলে সুপার্থর সঙ্গে যোগাযোগ করতে তাদের আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছিল। যোগাযোগের কাজ, জয়া স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিতে গাংনেগড়ের কর্মীরা খুশি হয়েছিল। কার্যোদ্ধার করতে নানা পথে এগোনোর চিন্তা জয়া করে রাখায়, তার পাশে থাকতে আব্বাস, চাকানের অসুবিধে হয়নি। ছিরুও তাই চাইছিল। জয়ার পাশে থেকে দায়িত্ব পালন করতে চাইছিল। সুপার্থর বদলে নেতা মেনে নিয়েছিল জয়াকে। বেনাদহের হাটে আব্বাস, চাকানের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে জয়া স্বস্তি পেল। ডেমরায় মাকে ফেরৎ পাঠিয়ে চাকান, আব্বাস, ছিরুর সঙ্গে আলাদা করে বসে কিছু কাজের কথা সে বলে নিতে চায়। মায়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার আগে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে জয়া জানিয়েছিল, দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। শহরের কাজ শেষ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে ডেমরায় ফিরবে। শহরে কয়েক দিন কাটাতে তার অসুবিধে হবে না। আত্মীয়, বন্ধু সেখানে যারা রয়েছে, তাদের অনেকে আশ্রয় দেবে।

বেনাদহ হাটের দক্ষিণে নির্জন শ্যাওড়া গাছের তলায় তিন সঙ্গীকে নিয়ে বসে ঘন্টাখানে কথা চালাল জয়া। শলাপরামর্শ শেষ করে ঘরে কচি শিশু থাকায় চাকান গাঁয়ে ফিরে গিয়েছিল। তার সঙ্গী হয়েছিল উজানির মা। আব্বাসকে নিয়ে গোন্দলপাড়ায় সুপার্থর বাড়িতে, মাঝ-বিকেলে জয়া পৌঁছে গিয়েছিল। বড় রাস্তা ছেড়ে গলিঘুঁজির ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময়ে এক পান দোকানের বড় আয়নায় নিজের মুখটা দেখে জয়ার মনে হয়েছিল, রাস্তায় চেনা মানুষের সামনে দিয়ে হেঁটে যেতেও তার এখন অসুবিধে নেই। মা চিনতে পারলেও বাবা-কাকাদের কেউ তাকিয়ে দেখবে না। পুরনো তামার মত গায়ের রং, কোটরে বসা দুটো চোখ, চোয়াল ভেঙে গেছে। আয়নায় কয়েক সেকেন্ডের জন্যে নিজের মুখটা দেখে নিজে চিনতে পারছিল না। গত এগারো মাস সতের দিনে কঙ্কালসার হয়ে

না গেলেও তার শরীর আধখানা হয়ে গেছে। আগের মত সে ফরসা নেই। প্রথম নজরে আদিবাসী সাঁওতাল মেয়ে মনে হলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তেলচুকচুকে খোঁপার বদলে মাথায় রুক্ষ, খয়েরি চুল, হাতখোঁপায় বাঁধা—মেয়েকে প্রথম দর্শনে চিনতে মায়েরও অসুবিধে হবে। পান দোকানের আয়নার সামনে বেশি সময় দাঁড়িয়ে নিজের মুখ দেখা একজন তরুণীর পক্ষে শোভন নয়। দোকানের সামনে থেকে জয়া সরে গেলেও সন্দিগ্ধ চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকল দোকানি। অচেনা মেয়েটাকে বেহায়া সাব্যস্ত করতে তার অসুবিধে হল না। জয়ার কয়েক পা পেছনে হাঁটছে আব্বাস। রাস্তার কেউ না বুঝলেও জয়ার ওপর সে নজর রাখছে, তার রক্ষীর ভূমিকা পালন করছে। গোন্দল পাড়ায় সুপার্থর বাড়িতে তার মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল জয়া। সুপার্থর খবর জানতে আকণ্ঠ উদ্বেগে তার দমবন্ধ হয়ে আসছিল।

হাঁসগড়ার মাঠে মুরারি ঘোষকে দেখে, তাকে 'অ্যানিহিলেট' করতে কোনো পূর্বপরিকল্পনা ছাড়া কেন তার ওপর সুপার্থ ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল? সে কি খেপে গিয়েছিল? অ্যানিহিলেশন মানে কি ব্যক্তি হত্যা, খুন? কাজটা কি এত সহজ? মন থেকে গত কয়েকদিন এই প্রশ্নগুলো জয়াকে সরাতে পারছিল না। আরো একটা প্রশ্ন, অস্থির, কিছুটা আতঙ্কিত করছিল তাকে। যে গরিব চাষিদের জন্যে জীবন তুচ্ছ করে সুপার্থ লড়াই-এ নেমেছিল, সেই চাষিরা কেন পুলিসের হাতে তাকে তুলে দিল? গাঁয়ের মানুষ গণেশ বাউরিকে পর্যন্ত তার গোপন ডেরা থেকে ধরিয়ে দিল। হাঁসগড়ার মাঠে সেই সময়ে পুলিস এসে না গেলে গ্রামবাসী হয়তো পিটিয়ে মেরে ফেলত সুপার্থকে।

মাঝদুপুরে গোন্দলপাড়ায় সুপার্থর বাড়ির সামনে জয়া যখন এসে দাঁড়াল, চারপাশ শ্মশানের মত খাঁখাঁ করছে। নিস্তব্ধ বাড়ি, দোকানে, রাস্তায় যে দু এক খণ্ড মানুষ ঝিমোচ্ছে, শ্লথ পায়ে হেঁটে চলেছে, কেউ তাকাল না তার দিকে। চোখ যাদের খোলা ছিল, তাদের কেউ আগে তাকে দেখে থাকলেও চিনতে পারল না! রাস্তার খেঁদি, পেঁচির দিকে যেভাবে তাকায়, মুহূর্তের জন্যে তাকাল। সুপার্থর বাড়ির সামনে রাস্তায়, ধুলোর ওপর শুয়ে থাকা একটা কুকুর, আধঘুমন্ত চোখে জয়াকে দেখলেও চোখ খুলে দেখার প্রয়োজন বোধ করল না। সামান্য দূরে, অশত্থ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকা আব্বাসের চোখের সামনে দিয়ে একটা বাড়িতে জয়া ঢুকে গেল। জয়া যে সুপার্থর বাড়িতে ঢুকল অনুমান করে আরো কয়েক পা আব্বাস এগিয়ে গেল। এই মুহূর্তে বাড়িটা বিপজ্জনক, যে কোনো সময়ে পুলিস ঘিরে ফেলতে পারে। বাড়িটার ওপর আড়াল থেকে চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখার ব্যবস্থা, পুলিস হয়তো করে রেখেছে। দাগি বাড়ির ওপর পুলিস এভাবে নজর রাখে। সুপার্থর মত সাংঘাতিক এক আসামীর বাড়িতে সারাক্ষণ নজর রাখলেও যে অনেক গোপন তথ্য পাওয়া যেতে পারে, পুলিসের অজানা নয়। পুলিসের বিস্তর নজরদার

আছে। তাদের বলা হয় 'সোর্স'। ইদানিং নজর রাখার মত লোক, আরো বেশি করে পুলিস জোগাড় করছে।

নিরীহ যে সব মানুষকে দুবেলা ভ্যানে তুলে হাজতে নিয়ে যায়, তাদের মধ্যে থেকে বাছাই করে কয়েকজনকে নজরদারি কাজে লাগিয়ে দিচ্ছে। প্রাণের ভয়ে তারা পুলিসের গুপ্তচর হয়ে যাচ্ছে। শুধু প্রাণের ভয়ে কেন, পুলিসের নেকনজরে থাকলে, খুচরো অপরাধ করার সঙ্গে দশ-বিশ টাকা কামানোর সুযোগ পাওয়া যায়, এমন অভিজ্ঞতা যাদের হয়েছে, তারাও গোপনে পুলিসের খাতায় নাম লিখেছে, এদের বলা হচ্ছে 'খোঁচর।' গাঁয়ের ভেতরেও দু-একজন করে খোঁচর খুঁজে নিয়ে তাদের কাজে লাগিয়ে দিচ্ছে পুলিস। দলের মধ্যে তাদের কেউ কেউ ঢুকে পড়ছে। আব্বাসের মনে হল, সুপার্থর বাড়ির আশপাশে দাঁড়ানো খোঁচরদের কেউ নজর করছে তাকে। গোঁন্দলপাড়ার মত অজানা জায়গায়, সেরকম কেউ তাকে জাপটে ধরে 'চোর চোর' বলে চ্যাচামেচি শুরু করে দিলে, তার পালানোর পথ থাকবে না। পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে যেতে পারে। তবু জয়াকে একা ফেলে রেখে রাস্তা ছেড়ে সে নড়তে পারছে না। তাদের প্রিয় কমরেড বিভুর (সুপার্থর টেক নাম) বউ প্রীতিদিকে (জয়ার টেক নাম) এই দুর্দিনে, চোখের মণির মত আগলে রাখার দায়িত্ব গাংনেগড়ের মানুষের। যতই বিপদ আসুক, নিজের জায়গা ছেড়ে সে নড়বে না।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে আব্বাস যখন সাতপাঁচ ভাবছে, জয়াকে বুকে জড়িয়ে ধরে ফুলে ফুলে কাঁদছে সুপার্থর মা। প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটিয়ে সুপার্থর বাবা বলে চলেছে, পৃথিবীর কোনো শক্তি আমার ছোটবাবুকে জেলের ভেতর আটকে রাখতে পারবে না। জজসাহেবকেও কথাটা সে জানিয়ে দিয়েছে। বলেছে এ বিচার প্রহসন, আমি মানি না। আমাকে বিচার করার অধিকার আপনাদের নেই। দেশের মানুষই শুধু পারে আমার বিচার করতে। ওহ্, সে সব কী কথাবার্তা রে মা, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল আমার। এক বাপের ব্যাটা না হলে এমন কথা বলা যায় না। এক বাপ, এক পার্টি। এক বাপের ব্যাটারা কখনো পার্টি বদলায় না।

লুঙির মত দুভাঁজ করে কোমরে বাঁধা লাল ধুতি দাড়িগোঁফ-ভর্তি মুখ, মাথায় তামাটে লম্বা চুল, খ্যাপাটে মানুষটা গভীর এক ঘোর থেকে কথা বলে চলেছে, জয়ার বুঝতে অসুবিধা হল না। কেমন আছে সুপার্থ? জয়া প্রশ্ন করার আগেই তেজেশের বিবরণ থেকে অনেকটা সে জেনে গেল। গলা নামিয়ে তেজেশ বলল, কালই আদালতে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তার সঙ্গে। জেল হাজত থেকে তাকে আবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে পুলিস। জিজ্ঞাসাবাদ না ছাই। আরেক প্রস্থ পেটাই হবে। ছোটবাবুর সে সবে তোয়াক্কা নেই। পুলিস হেফাজতে পাঠানোর আদেশ শুনে তার সে কি হোহো করে হাসি। তারপর শুরু করল গান :

এ মাটি আমার, এ মানুষ আমার
গ্রাম থেকে গ্রামে
ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি
আমার আমার।

ছোটবাবুর নিজের লেখা গান, নিজের সুর, কয়েকজন গলা মিলিয়েছিল তার সঙ্গে। এজলাস কাঁপছিল গানের সঙ্গে, ঘরবাড়ি, বুকের ভেতরটা কাঁপছিল, মনে হচ্ছিল, পায়ের নীচে মেঝে, মাথার ওপর কড়িবরগা এখনি ভেঙে পড়বে। কাঠগড়া থেকে নেমে এজলাসের বাইরে যাওয়ার সময়ে, যা সে আগে কখনো করেনি তাই করল। টিপ করে আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। টের পেলাম,আমার পায়ের দুআঙুলের ফাঁকে কিছু গুঁজে দিল। ফিসফিস করে বলল, চিঠিটা জয়াকে দিয়ো।

স্বপ্নে পাওয়ার মত তার গলার আওয়াজ শুনলাম কি পেলাম না বুঝেই এজলাস খালি হওয়া পর্যন্ত মাটির পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকলাম। যখন কেউ দেখছে না, চিঠিটা তুলে জটায় গুঁজে রাখলাম। তোকে লেখা ছোটবাবুর চিঠিটা বড় যত্ন করে আগলে রেখে কীভাবে পৌঁছে দেব, যখন ভাবছিলাম, তখনই তুই, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমার কাছে এসে গেলি, আমি যেন দেবীমূর্তি দর্শন করলাম। আহা, প্রকৃতি যে এত দয়াবতী কে জানত! দাঁড়াও মা, চিঠিটা তোমাকে আগে দিয়ে দিই।

ঘরের ভেতরে জটাধারী মানুষটা ঢুকে গেল। জয়ার কাঁধের ওপর আলতো করে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুপার্থর মা। রাস্তায় আব্বাসকে ছেড়ে এসে উদ্বিগ্ন হচ্ছিল জয়া। গোন্দলপাড়ার অচেনা গলিতে দূর গাঁয়ের মানুষটা বিপদে পড়তে পারে ভেবে ভয় পাচ্ছিল। ছোট জায়গা। সবাই এখানে সবাইকে চেনে। ভরদুপুরে অপরিচিত মুখের একজন মানুষকে, সুপার্থর বাড়ির ওপর নজর রেখে রাস্তার গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পাড়ার লোক সন্দেহ করতে পারে। পুলিসের খোঁচর ভেবে তার ওপর এলাকার ছেলেরা ঝাঁপিয়ে পড়লে অবাক হওয়ার কিছু নেই। পুলিসের নজরদারদের চোখেও পড়ে যেতে পারে আব্বাস। সুপার্থর চিঠিটা পেলেই আব্বাসকে নিয়ে চটপট এ পাড়া থেকে সরে পড়বে। ভাঁজ করা ছোট একটা চিরকুট এনে জয়ার হাতে দিল তেজেশ। জয়া জিজ্ঞেস করল, চিঠির উত্তরটা কি আপনি পৌঁছে দিতে পারেন সুপার্থকে?

নিশ্চয়। কথাটা বলে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে তেজেশ বলল, পরশু দেখা করতে যাব। তখন দেব। কড়া নজর রাখা হয়, দেখা করার সময়ে। তবু একটা ফিকির খুঁজে তোমার চিঠি তুলে দেব তার হাতে। সাবধানে থেকো মা, কাজ শেষ না করে তোমাদের থামা চলবে না।

জয়া আর দাঁড়াতে চাইছিল না। সদর দরজার দিকে সে পা বাড়াতে সুপার্থর মা বলল, কিছু খেয়ে যাও, অন্তত দু'মুঠো মুড়ি, এক গ্লাস জল।

রাস্তায় একজনকে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছে সে কথা জয়া বলতে, তার

পাশে গিয়ে দাঁড়াল তেজেশ। বলল, চল. তাকে ডেকে নিয়ে আসি। রাস্তায় এসে অশ্বখ গাছের দিকে তাকিয়ে আব্বাসকে দেখতে পেল না জয়া। এবড়োখেবড়ো ইটের রাস্তা। ডানে-বাঁয়ে কোথাও আব্বাস নেই। তার গা ছমছম করতে থাকল। নিস্তব্ধ, রাস্তা, আব্বাস যেন উবে গেছে। তেজেশের দু-চোখ খুঁজছিল একজন অচেনা মানুষকে। ঝাঁকড়া অশ্বত্থ গাছের মাথা থেকে তখনই আব্বাস নেমে এল, বলল, হুই উদিকে একটা গাড়ির আওয়াজ শুনে গাছে উঠে লুকিয়ে ছেলাম।

আব্বাস ভয় পেয়েছে, তার মুখ দেখে জয়া আঁচ করেছিল। তেজেশকে বলল, চলি। ফের দেখা হবে।

কোথায় যাবে মা?

যেখানে ছিলাম।

গজঘন্টায় আমার মেয়ের বাড়িতে তোমাকে রেখে আসতে পারি। তোমাকে চেনে তারা। না দেখলেও তোমার কথা শুনেছে।

জয়া বলল আমি না ফিরলে সবাই চিন্তা করবে। তাদের কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে, আমার এই বন্ধুকে।

রাস্তা ধরে বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিল তিনজন। জয়া, তেজেশকে পাশাপাশি হাঁটতে দিয়ে, কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিল আব্বাস। তেজেশ বলল, আমার বাড়ির দরজা তোমার জন্যে সবসময়ে খোলা থাকবে। ইচ্ছে হলেই চলে এসো। জয়া কথা বলল না। সুপার্থর চিঠিটা পড়ার জন্যে উৎকণ্ঠ হয়ে উঠেছিল সে। কয়েক বছর আগে সাহেববাগানে বারিদ খুন হতে গৌরহাটির যে বাড়িতে হপ্তাখানেক লুকিয়ে ছিল, সেখানে, সমীরকাকুর ছোট বোনের শ্বশুরবাড়িতে এসে হাজির হয়েছিল সে। সমীরকাকুর সেই বোন, মালতিপিসি প্রথমে তাকে চিনতে পারেনি। কয়েক সেকেন্ড তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলেছিল, কঙ্কালের মত এমন চেহারা তোর হল কী করে? কাঠকয়লার মত হয়ে গেছে গায়ের রং। তোর মা-বাবা দেখেছে তোকে?

বাড়িতে যাইনি অনেকদিন।

আববাসকে নিয়ে মালতিপিসির বাড়িতে জয়া ঢুকলেও তার পরিচয় গৃহকর্ত্রীর কাছে সে ভাঙেনি। আব্বাসের দিকে আড়চোখে মালতি কয়েকবার তাকাতে জয়া বলল, গাংনেগড় থেকে ও এসেছে আমার সঙ্গে, আমাদের কমরেড।

জয়ার ভাগ্য ভাল তার কাছে কমরেডের নাম জানতে চাইল না মালতি। ঘরের এক কোণে সরে গিয়ে ব্লাউজের ভেতর থেকে সুপার্থের লেখা চিঠিটা বার করে জয়া পড়তে শুরু করল। দশ-এগারো লাইনের চিঠিতে সুপার্থ লিখেছিল, বিন্দু ভাঙতে সফল হলেও সামান্য ভুলের জন্যে ধরা পড়ে গেলাম। চারপাশের গাঁ থেকে মানুষ এসে ঘিরে ফেলতে, ভয় পাওয়ার কারণ না থাকলেও আমরা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের ভয় পাওয়া উচিত হয়নি। হাঁসগড়ার মাঠ ছেড়ে আমাদের পালাতে যাওয়া উচিত হয়নি। মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে বুক ঠুকে আমাদের

বলা উচিত ছিল, কোনো অপরাধ আমরা করিনি। গরিব কৃষকের স্বার্থে শ্রেণীশত্রু খতম করাতে কোনো অন্যায় নেই।

যাই ঘটুক, নিজের জায়গা ছেড়ে তুমি নোড়ো না। বিপ্লব সফল হবেই, দেশ মুক্ত হবেই। মনে হয়,আদালতের বিচারে আমাদের যাবজ্জীবন সাজা হবে। আমার আর সত্যমাস্টারের কাছে এই সাজা বড়ো কিছু নয়। বেচারা গণেশের সংসারটা ভেসে যাবে। তার বউ, ছেলেমেয়েদের দেখার কেউ নেই।

তোমার যদি মনে হয়, আমাকে ভালবাসতে পারছ না, অন্য কাউকে যদি ভালবাসতে চাও, অনায়াসে তা করতে পারো। তবে একটা অনুরোধ, ফুলে ফুলে উড়ে বেরিয়ো না। তবু আমি বলছি আমাদের দেখা হবে। জেল থেকে আমরা বেরবই এবং সেটা ঘটবে সামনের পাঁচ বছরের মধ্যেই। মুক্তির প্রশ্নে দুটি মাত্র সম্ভাবনা, এক চাষি-মজুররা এসে আমাদের মুক্ত করবে অথবা দেশ মুক্ত হবার দরুন জেল থেকে আমরা খালাস পাব। মুক্তির এই সম্ভাবনাকে অবিশ্বাস করো না।

দুবার চিঠিটা পড়ে, তৃতীয়বার চোখ বুলোনোর আগে তাকে মালতি প্রশ্ন করল, ভাত খাবি তো?

ভাত আছে?

আছে।

দুজনের হবে?

হবে।

আব্বাসকে ঘরে বসিয়ে রেখে জয়া স্নান করতে কলঘরে ঢুকল। সুপার্থর চিঠি পড়ে অদম্য সাহসে তার বুক ভরে গেলেও পাঁচ বছরের মধ্যে জেল থেকে কীভাবে সে বেরিয়ে আসবে, ভেবে পেল না। তার সারা শরীর থেকে তাপ বেরোচ্ছিল। দশক ফুরনোর আগে মুক্তির কথা জেনে গভীর প্রত্যাশায় মগ্ন হয়ে যাচ্ছিল সে। মগ্নতার মধ্যে কিছু ভেবে চমকে উঠছিল। মাথায় একমগ জল ঢেলে আরামে যখন দুচোখ বুজে যাচ্ছে, সুপার্থর আকাশছোঁয়া আশার মধ্যে বিপদের গন্ধ পেল। ছেলেমানুষর মত স্বপ্ন দেখে সুপার্থ। সে বড়ো বেশি আশাবাদী। দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে যে আশাতে সে বিন্দু ভেঙেছিল, তা হাওয়ায় মিশে গেছে। বিন্দু ভাঙার খবর প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লেও গাংনেগড়ের মাঠঘাট ফুঁড়ে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা জেগে ওঠেনি, বরং বন্ধুর চেয়ে শত্রুর সংখ্যা সেখানে বেড়ে গেছে। তারপরেও পথ সংক্ষেপ করতে চার বছরের মধ্যে মুক্তির অঙ্ক কষে চলেছে সুপার্থ। কোথায় যেতে চায় সে?

স্নান সেরে পোশাক বদলে আব্বাসকে নিয়ে ভাত খেয়েছিল জয়া। তেল, নুন, কাঁচালংকা দিয়ে মাখা আলুভাতে, ভাত খেয়ে অমৃতের স্বাদ পেয়েছিল। মালতির বাড়িতে এক রাত কাটিয়ে পরের সকালে আব্বাসকে নিয়ে ডেমরা ফিরে গিয়েছিল।

সুপার্থর সঙ্গে চিঠি চালাচালিতে অসুবিধে থাকল না। সুপার্থের অঙ্কে যে ভুল হয়েছিল, দু-মাস পরে তা ধরা পড়ল। সুপার্থ তখন পৃথিবীতে নেই। নিজেদের মুক্ত করার প্রবল তাড়নায় জেল থেকে পালাতে গিয়ে মারা পড়েছিল সে। শহিদ হয়েছিল। পুনর্নির্মিত হয়েছিল জয়ার পরিচয়। রাতারাতি শহিদের স্ত্রী বনে যেতে তাকে ভাঙিয়ে সহকর্মীরা বিপ্লবের ধুনি জ্বালিয়ে রাখতে চেয়েছিল। তার জীবনের সবচেয়ে কঠিনতম সেই পরিস্থিতিতে জয়া কিছুদিন আচ্ছন্ন থাকলেও মাথা তুলে, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বিলুপ্তপ্রায় আত্মপরিচয় পুনরুদ্ধারেও খুব বেশি দেরি করেনি। সে আর এক সুদীর্ঘ পরিক্রমার কাহিনী।

অন্ধকার ঘরে শুয়ে জয়ার মনে প্রশ্ন জাগল, আত্মহননকারী সময়ের পটভূমিতে সেলুলয়েডের পর্দা 'ক্রেডিট কাড' 'কনডোমে'র স্বপ্নিল জীবন আর অ্যাসল্ট রাইফেল লালিত তরুণী মেয়েরা কি কাল তার সমাপ্তি ভাষণ শুনে খুশি হবে? তাকে মান্ধাতা আমলের ভূতের বোঝা বহনকারিণী এক প্রাচীনা ধরে নিয়ে তার ভাষণের মধ্যে তারা উসখুস শুরু করে দিতে পারে, হাই তুলতে পারে, ঘন ঘন চিউইংগাম চিবিয়ে চাপা পালায় হাজারবার 'শিট' উচ্চারণ করে ঘুমিয়ে পড়লেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। বলার কথাগুলো তবু সে চেপে যেতে চায় না। মানবীবাদী হওয়ার প্রক্রিয়ায় ঝোড়ো হাওয়া আর সময়ের সর্বগ্রাসী শূন্যতাকে মেলাতে সে আর একবার, শেষবার চেষ্টা করবে।

কুড়ি

সকাল ছ-টায় শ্রীরামপুরের গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে, তিনটে বাস বদল করে, বেলা দশটা নাগাদ বারাসত, চাঁপাডালি মোড়ে, বাসস্ট্যান্ডে বাস থেকে নেমে, দু-পা এগিয়ে ডানদিকে 'শান্তি সুইট্স' সাইনবোর্ড লাগানো মিষ্টির দোকানের সামনে দুটো মলিন বেঞ্চের কোনও একটাতে মাথায় রঙ-ওঠা লালচে গামছা জড়ানো যে লোকটার বসে থাকার কথা, তাকে জয়া দেখতে পেল না। লোকটার নাম আনোয়ার, হাড়োয়া, না হিঙ্গলগঞ্জের বাড়ি থেকে তারও সকাল দশটায় বারাসতে পৌঁছে 'শান্তি সুইট্স'-এর সামনে জয়ার জন্যে বসে থাকার কথা। সময় এমনভাবে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, যাতে তার জন্যে জয়াকে অপেক্ষা না করতে হয়। মিষ্টির দোকানের আশপাশে নজর করে, মাথায় গামছা-জড়ানো, আধময়লা হেঁটো ধুতি, ছিটের শার্ট, ছোটখাট রোগা শরীর, কালো রঙ, বয়স, চল্লিশ, বিয়াল্লিশ,

শ্রেণীশত্রুর নজরে পড়ে যাওয়ার ভয়ে সদাসন্ত্রস্ত দু'চোখ, চোখের মণিদুটো ঘুরছে, এমন কাউকে জয়া খুঁজে পেল না। জয়া নিজের চোখে আনোয়ারকে কখনও না দেখলেও প্রকাশের বর্ণনা মিলিয়ে মানুষটাকে চিনে বার করতে অসুবিধে হবে না, ধরে নিয়েছিল। মানুষের চেহারা, চালচলন, এমনকি গায়ের গন্ধে তার শ্রেণীচিহ্ন লেগে থাকে। দোকানের বেঞ্চে বসার সাহস না পেয়ে কাছাকাছি কোথাও লোকচোখের আড়ালে, প্রায় গা-ঢাকা দিয়ে গাঁয়ের সেই গরিব চাষি আনোয়ার মিষ্টির দোকানের বেঞ্চে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। গেল আড়াই বছরে চাষি, মজুরকে আলাদা করে চেনার চোখ জয়ার তৈরি হয়ে গেছে। জয়ার বিশ্বাস. মাথায় গামছা জড়ানো তিনজন কমবেশি একই চেহারার মানুষ মিষ্টির দোকানের বেঞ্চে এখন বসে থাকলে, তাদের কে আনোয়ার, সে চিনে ফেলবে। বাসগুমটির উল্টোদিকে শান্তি সুইট্স-এর সামনে, ডানে বাঁয়ে আনোয়ারের মত কাউকে না দেখে, সে যে তখনও পৌঁছোয়নি, জয়া বুঝে গেল। আনোয়ার যে কোনও মুহূর্তে এসে যাবে, অনুমান করেও রাস্তা পেরিয়ে উল্টোদিকে, মিষ্টির দোকানের বেঞ্চে গিয়ে বসল না। আনোয়ারকে মিষ্টির দোকানের সামনে থেকে জয়া খুঁজে নেবে। আনোয়ারের সঙ্গে সেভাবেই জয়নুল কথা বলে রেখেছে। মিষ্টির দোকানের বেঞ্চে জয়া একা বসে থেকে পাঁচজনের নজর কাড়ুক, জয়নুল চায়নি। নিজের ঘোরাফেরার এ নিয়ম জয়া চালু করেছিল। স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়মের নড়চড় হয় না। বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে সে টের পেল, তাকে দেখার মত সময় কারও নেই। সবাই ছুটেছে। বাসে সে উঠছে, না বাস থেকে নামল, কেউ ভাল করে দেখার আগে ধরে নিয়েছে সে ও একজন যাত্রী, ছুটন্তদের একজন। চাঁপাডালি থেকে হাসনাবাদ, বসিরহাট, বনগাঁ, শ্যামবাজার, এসপ্ল্যানেড, কোথাও যাওয়ার বাস ধরতে এসেছে।

শরতের ঝকঝকে নীল আকাশ। রোদের তাপ বাড়তে আকাশের ঘন নীল আস্তরণে পোড়ামাটির রঙ লাগছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সেই রঙ কালো হয়ে, মেঘ জমে বৃষ্টি নামতে পারে। মাঝদুপুরে কয়েক পশলা বৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। তার আগেও নামতে পারে। শরৎ ফুরিয়ে এলে শুরু হয় মেঘবৃষ্টির এই খামখেয়ালিপনা। শান্তি সুইট্স-এর দরজার বাঁ পাশের বেঞ্চে এর মধ্যে যে দুজন লোক এসে বসেছে, চা-এর গ্লাস হাতে নিয়ে কথা বলছে, তাদের কেউ আনোয়ার নয়। দুজনের কারও মাথায় গামছা জড়ানো নেই। গামছা কাঁধে চাষি তারা নয়। পোশাক-আশাক দেখে তাদের সাদামাঠা গেঁয়ো মধ্যবিত্ত ছাড়া ভাবার উপায় নেই। দুজনের পায়ে পুরনো হলেও যে দু-জোড়া জুতো রয়েছে, তা কাবলি আর শস্তার মোকাসিন, হাওয়াই চটি নয়। কাবলির মালিক জুতোজোড়া খুলে রেখে বেঞ্চে পা মুড়ে আরাম করে বসলেও পাশের জনের দু-পা অর্ধেক ঢোকানো রয়েছে মোকাসিনে। আনোয়ারের পায়ে বড়জোর হাওয়াই চটি থাকতে পারে। জয়নুলের বিবরণ অনুযায়ী, তার আদুল

পায়ে আসাই সম্ভব। সবচেয়ে বড় কথা, আনোয়ার আসবে একা, সঙ্গীসাথি কেউ পাশে থাকবে না। গাঁয়ে তার সংসারে, বউ-ছেলেমেয়ে থাকলেও জমিজিরেত নেই। দ্বিতীয় কর্মক্ষম পুরুষ নেই। অথচ খাওয়ার জন্যে কয়েকটা হাঁ-মুখ আছে, তাদের পেট, পাকস্থলী আছে, সকাল-সন্ধে তাদের খিদে পায়। অন্যের জমিতে খেতমজুরির মরশুম শেষ হয়ে যেতে আনোয়ার এখন বেকার হলেও পরিবারের অভুক্ত মানুষেরা চাট্টি চাল, ডালের আশায় তার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। কাজের খোঁজে রোজ সকালে বাড়ি থেকে সে বেরলেও শরতের এই শেষ দিনগুলোতে বীজতলা, জমিতে নিড়েন দেওয়া পর্ব শেষ হয়ে যাওয়ায়, কে তাকে কাজ দেবে। খালি হাতে বাড়ি ফেরে সে। ফি বছর এরকম হয়, এরকম হবে, পরিবারের লোকজনও জেনে গেছে। পেটে খিদে নিয়ে শুকনো-মুখে পরের দিনের জন্যে তারা অপেক্ষা করে।

আনোয়ারের সংসারে দু-বেলা দু-মুঠো ভাতের সংস্থান করে দেওয়ার সঙ্গে তাকে বিপ্লবী বানানোর 'ট্রেনিং' দিতে হুগলি জেলার এক কারখানায় ঢোকানোর ব্যবস্থা করেছে জয়াদের দলের হুগলি জেলার পয়লা নম্বর নেতা, প্রকাশ। দলের অনুগামী দু-তিনজন শ্রমিককে ঘাঁটি এলাকা বানাতে হাড়োয়া, হিঙ্গলগঞ্জ, হাসনাবাদে পাঠানো হয়েছে। তাদের একজন আনোয়ারের মগজ ধোলাই করে কারখানায় ঘাঁটি গড়ার উপযুক্ত করে তুলেছে। বারাসত থেকে আনোয়ারকে এনে হুগলির ত্রিবেণীতে পৌঁছে দেওয়ার ভার পড়েছে জয়ার ওপর। জয়াও দলের জেলা কমিটির এক নেতা। গোপন, জরুরি এক কাজের ভার, তিনদিন আগে সে নেওয়ার পর থেকে দম ফেলার সময় পাচ্ছে না। বারাসত থেকে আনোয়ারকে ত্রিবেণী পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব, তবু সে নিয়েছে। দলের ওপর দিয়ে এমন ঝড় বয়ে চলেছে সে উপায়ান্তর ছিল না। আনোয়ারকে আনার কথাবার্তা দিন-সাত আগে বারাসতে গিয়ে সে পাকা করে এসেছিল, এই মুহূর্তে সে শয্যাশায়ী। গত হপ্তায় শেষ রাতে তেলিনিপাড়ায় দলের যে গোপন সভা পুলিস ঘিরে ফেলেছিল, সেখান থেকে পালানোর সময়ে পুলিসের গুলিতে, জয়নুলের ডান পায়ের পাতা এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যাওয়ার পরে, জোয়ারের গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে স্রোতের টানে ভেসে যেতে যেতে সে কীভাবে বেঁচে গেল, সে আলাদা এক গল্প। গঙ্গার স্রোত থেকে উদ্ধার পেয়ে দু-দিন জ্বরে বেহুঁশ ছিল। জ্ঞান ফিরতে যন্ত্রণায় এত গোঙাচ্ছে যে দলের গোপন ডেরার গোপনীয়তা বজায় রাখা মুশকিল হয়ে উঠেছে। তেলিনিপাড়ার গোপন বৈঠকের তিন সাক্ষী, পুলিসের গুলিতে মারা পড়েছে, জয়নুলকে এখনও জানানো হয়নি। নড়াচড়ার ক্ষমতা না থাকলেও শহিদ সাথিদের মৃত্যুর বদলা নিতে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তে সে ছটফট করবে। আরও নানা পাগলামি সে করতে পারে, যা সামলাতে জয়াকে হিমশিম খেতে হবে। গঙ্গায় ভাসন্ত জয়নুলকে গৌরহাটির কাছে জল থেকে উদ্ধার করার পরের সন্ধেতে শ্রীরামপুরের গোপন

ডেরায় প্রকাশ নিয়ে আসে। গুলিতে থেঁতলে যাওয়া পা নিয়ে গঙ্গায় ভেসে যাওয়ার পুরো সময় ধরে জ্ঞান ছিল। প্রকাশের জিম্মায় নিজেকে সঁপে দেওয়ার পরে বেহুঁশ হয়ে যায়। জ্ঞান ফেরে পরের দিন সকালে। চোখ খুলে কিছু সময়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকার পরে পায়ের কাছে জয়াকে বসে থাকতে দেখে যন্ত্রণা মাখানো মুখে জয়নুল যখন জানতে চেয়েছিল, সে কোথায়? গলা নামিয়ে ধীরে ধীরে গোটা বৃত্তান্ত জয়া শুনিয়েছিল জয়নুলকে। প্রিয় তিন সাথির মৃত্যুর খবর জয়নুলকে না বললেও তাকে যে শ্রীরামপুরের এক নিরাপদ আশ্রয়ে আনা হয়েছে, সে পুরো সেরে না ওঠা পর্যন্ত, দল থেকে তার পাশে বউ সেজে জয়াকে থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সব কথাই বলেছিল জয়নুলকে। গুলিতে ঝাঁঝরা পায়ের যন্ত্রণায় জয়নুলের চোয়াল বেঁকে গেলেও মুখে হাসি টেনে বলেছিল, কী ভাগ্য আমার। পায়ে গুলি না লাগলে তোমার মত বউ-এর সেবা পেতাম না!

মুচকি হেসে জয়া বলেছিল, খোদ মানুষটার কানে তোমার কথা গেলে, মজা দেখাবে সে।

জয়ার কথা জয়নুলের কানে পৌঁছোনোর মধ্যে কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছিল তার চেতনা। তখনও হাসি লেগেছিল ঠোঁটে। জয়া ভাবছিল, বাড়িওয়ালা, পুরনো পরিচিত, নবেন্দুর সামনে কী অবলীলায় নিজের স্ত্রী, জয়াকে জয়নুলের স্ত্রী পরিচয় দিয়ে রেখে গেল প্রকাশ। জয়নুলের নাম বলল জয়ন্ত রায়, পেশা, প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। দলের শৃঙ্খলা কীভাবে মেনে চলতে হয়, জয়া জানে। সে মুখ খোলেনি। নবেন্দুকে প্রকাশ যা বলছে, নিঃশব্দে মেনে নিয়েছিল। প্রকাশের বিবরণ, তার কাকার বন্ধু, নবেন্দু হাঁ করে শোনার সময়ে, বাবার বয়সী মানুষটা যে সরল, জয়ার বুঝতে অসুবিধে হয়নি। প্রকাশের প্রতিটা কথা বিশ্বাস করে, বেপরোয়া বাসচালকদের জঘন্য ড্রাইভিং নিয়ে নানা মন্তব্য করে, করুণ চোখে জযার দিকে তাকিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল বাবার বয়সী নবেন্দু লস্কর। বেশ কয়েকবার বলেছিল, বউমা, ভয় পেও না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমার বউ, রূপনারায়ণপুরে, তার বাপের বাড়ি থেকে ফিরে আসার আগে তোমাদের কিছু অসুবিধে হলে, দরকার হলে ডেকে নেবে আমাকে।

সদ্য হারানো তিন সহকর্মীর শোকের পাহাড় মাথায় নিয়ে থমথমে মুখে নবেন্দুর সমবেদনার কথা জয়া যখন শুনছে, তখনও শান্তভাবে দাঁড়িয়েছিল প্রকাশ। কাকার বন্ধুকে বুঝতে দেয়নি, সাথিদের হারানোর বেদনায়, শোকে তার বুক ভেঙে গেলেও সেই মুহূর্তে জেলা কমিটির সবচেয়ে লড়াকু সদস্য জয়নুলকে বাঁচানো ছাড়া আব কিছু সে ভাবছে না। বাস্তবিক তাই। প্রকাশের ডান হাত ছিল জয়নুল। দলের সবেচেয়ে বেশি ঝুঁকির কাজগুলো সে প্রায় ছিনিয়ে নিত। তার হাবভাব, কথা বলার ভঙ্গিতে প্রায়ই মৃত সুপার্থর ছায়া দেখতে পায় জয়া। পুলিসের গুলি খাওয়া, আধমরা জয়নুলকে দেখাশোনার যাবতীয় কাজ তাই যখন তাকে প্রকাশ

নিতে বলল, সে একটু থতমত খেলেও দায়িত্ব এড়াতে পারেনি। তার ওপর প্রকাশের অগাধ আস্থা, সে জানে। নিজের জীবনসঙ্গী, জয়াকে অনায়াসে জয়নুলের বউ পরিচয়ে নবেন্দুর কাছে চালিয়ে দিতে পারে। পুরুত ডেকে যজ্ঞ করে বিয়েতে দলের অনুমোদন না থাকলেও দলীয় কিছু সহকর্মীকে সামনে রেখে, গণসঙ্গীত গেয়ে, মালাবদল করে আনুষ্ঠানিক জোড়বাঁধার যে প্রথা চালু হয়েছে, নানা কারণে তা আটকে রয়েছে। সেই অর্থে তারা আজো অবিবাহিত। তবে সবাই জানে, তারা প্রেমিক-প্রেমিকার চেয়ে বেশি, স্বামী-স্ত্রী, সন্তানের মা-বাবা হলেও হতে পারে, কেউ ভ্রূ কুঁচকোবে না। তারা জানে না দলের নেতৃত্বের কাছ থেকে এখনও তাদের কাছে বিয়ে করার অনুমোদন আসেনি। দলের বাছাই করা কর্মীরা ঝাঁক বেঁধে পৃথিবী ছেড়ে নিয়মিত চলে গেলে, যুদ্ধের ময়দান থেকে সেনাপতিরা বিয়ের নির্দেশ পাঠাতে দেরি করতে পারে। জয়ার সন্দেহ আরও একটা কারণে নির্দেশ আসতে দেরি হচ্ছে। হুগলি জেলে রক্ষীদের হাতে সুপার্থ মারা যাওয়ার পর থেকে শহিদের স্ত্রী পরিচয়ে তাকে বিভিন্ন সভা, বৈঠকে হাজির করে উপস্থিত কর্মীদের মধ্যে যে উদ্দীপনা, শহিদ হওয়ার ব্যাকুলতা জাগানো গেছে, সেই তীব্রতায় দলের মেজাজ আরও কিছুকাল নেতারা বেঁধে রাখতে চায়। জয়া চট করে কারও সহধর্মিণী হয়ে গেলে, শহিদের বউ-এর আবেগ জাগানো পরিচয় হারাবে। সুপার্থর মত বীর শহিদের প্রসঙ্গ উঠলে আজও যে কত কর্মীর চোখ থেকে জল পড়ে, হিসেব নেই। জয়াকে দেখলে তাদের মনে পড়ে যায় সুপার্থর মুখ, বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে সুপার্থর গন্ধ, গলার স্বর, আবৃত্তি, সকালের আলো, শেষ বিকেলের ছায়ায় তারা দেখতে পায় সুপার্থর হাসি। সুপার্থর বউ, কমরেড জয়া, আর কাউকে বিয়ে করেছে, তারা ভাবতে পারে না। জয়ার মধ্যে মৃত সুপার্থকে তারা খুঁজে বেড়ায়, সম্ভবত খুঁজে পায়। শহিদের বউ হিসেবে স্বর্গের দেবীর মত শ্রদ্ধা পেতে প্রথমদিকে ভাল লাগলেও জয়া অনুভব করছিল মৃত সুপার্থর মহিমা উজ্জ্বল রাখতে গিয়ে নিজের আত্মপরিচয় সে হারিয়ে ফেলছে। রক্তমাংসের মানুষের বদলে তাকে দেবী ভাবতে শুরু করেছে অনেকে। সুপার্থর আত্মত্যাগ এক অসহনীয় বোঝার মত গুরুভার হয়ে রোজ তার কাঁধে চেপে বসেছে। যেখানে যায়, কেউ বলে না জয়া এসেছে, সবাই তটস্থ হয়ে শহিদের বউকে অভ্যর্থনা করে। প্রকাশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার আগে থেকে কিছু বৈঠকে সে বলেছিল, শহিদ সুপার্থর স্ত্রী হলেও আমার নাম জয়া, আমি একজন রক্তমাংসের মানুষ, শহিদের অসম্পূর্ণ কাজ একজন মানুষ হিসেবে আমাকে শেষ করতে হবে, তার বউ হিসেবে নয়। শহিদের আদর্শ একজন মানুষ বয়ে নিয়ে যায়, তার নামটা বোঝার মতো মাথায় তুলে ঘোরে না।

জয়ার কথা সকলে যে বুঝত, এমন নয়। যারা বুঝত, তাদের মুখচোখে অস্বস্তি ফুটে উঠত, ভুল বুঝত অনেকে। তারা ভাবত সুপার্থর মত মহৎ প্রাণের উপযুক্ত মেয়ে নয় জয়া। ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ানোর যুক্তি খাড়া করছে সে।

আলোচনাটা ভুল পথে গড়ানোর আগে প্রকাশ ঠেকাতে চাইত। প্রকাশের সঙ্গে তখন থেকে জয়ার কিছুটা বোঝাপড়া শুরু হয়েছিল। কলকাতা ছেড়ে হুগলির শ্রমিক মহল্লায় সংগঠন করতে আসা সমবয়সী ছেলেটা যে অন্যদের চেয়ে আলাদা, মানুষের সম্পর্কের ভেতর পর্যন্ত দেখতে চায়, গভীরভাবে দেখতে চায়, জয়া অনুভব করেছিল। দরকারে, অদরকারে মিতভাষী মানুষটা তার পাশে আছে, বুঝিয়ে দিলেও গায়ে পড়ে সাহায্য করতে এগিয়ে আসত না। জয়া তখন রাজনীতিব পাট চুকিয়ে দিয়ে চাকরি করতে যাওয়ার চিন্তাতে একাধিক যোগাযোগ গড়ে তুলেও মাঝপথে গুটিয়ে নিয়েছিল নিজেকে। মনে হয়েছিল, নতুন পৃথিবী গড়ার কর্মসূচি, স্বেচ্ছাচারীর মত একতরফা ছেড়ে দিয়ে চলে গেলে আজীবন নিজের কাছে দোষী থেকে যাবে। পথ যত জটিল হোক, দু-চারজন সহমর্মী, সাথী সবসময়ে পাওয়া যায়। নিজের ব্যক্তিপরিচয় জারি রেখে পথের শেষ পর্যন্ত সে হেঁটে যাবে। বিশেষ করে প্রকাশের মত একজন পাশে আছে টের পেয়ে, নির্মাণের যে কর্মসূচি, এত বছর বুক দিয়ে আগলে রেখেছে, তা ছেড়ে নড়তে পারল না।

আনোয়ারের দেখা পাওয়ার আশায় বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থেকে জয়ার পা ধরে গিয়েছিল। তাকে ঘিরে চলমান যাত্রীর ঢেউ ওঠাপড়া করছে। ঢেউ-এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিরাপদ বোধ করছে সে। ভিড়ের মধ্যে একা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার 'প্রিভেসি'তে যে মজা রয়েছে, আগে থেকে সে তা জানে। ভিড়ের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালে এ মজা কেটে যায়। তখন একজন মেয়ে সত্যি একা। কত কৌতূহলী চোখ যে তাকে চেটেপুটে খায়, তার সীমাসংখ্যা নেই। মেয়ে হওয়ার দিকদারি, ছেলেবেলার সেই ছাতু আর ছাই ওড়ানোর দিন থেকে জয়া জানে। শাস্ত্রমতে সব আনন্দানুষ্ঠান, শুভদিনগুলো পুরুষদের কল্যাণের জন্যে নির্ধারিত থাকে। মেয়েদের কাজ, স্বামী-সন্তান, ভাইয়ের মঙ্গল কামনায় ব্রতপালন, উপোস করা। মেয়েদের কল্যাণে, কোনও লোকাচার, পুরুষদের পালন করার জন্যে শাস্ত্রের বিধান নেই। পুরুষদের মত 'শত্রুর মুখে ছাই আর বন্ধুর জন্যে ছাতু ওড়ানো'র উৎসবে মেয়েদের থাকা নিষেধ। মেয়েদের আবার 'শত্রু, মিত্র' হয় নাকি?

প্রশ্নটা করে, উৎসবে মেতে ওঠা ছেলেদের ভেতর থেকে জয়ার হাত ধরে টেনে বার করে এনেছিল বাল্যবিধবা এক পিসিমা। অপমানে সাত-আট বছরের মেয়ে, জয়ার চোখে জল এসে গেলেও সে কাঁদেনি। পিসিমা তখনও বলে যাচ্ছিল, ছাতু, ছাই ওড়ায় ছেলেরা। শত্রু বলো, বন্ধু বলো তাদেরই থাকে। মানুষ বললে পুরুষকে বোঝায়, মেয়েরা আবার মানুষ নাকি? তাদের শত্রুমিত্র আসবে কোথা থেকে? বিধবা পিসির এসব বাখানা শোনার সঙ্গে হরেক লোকাচার দেখে জয়ার মনের ভেতর ক্রমাগত যা জমছিল, তার নাম ক্রোধ আর বিপুল অসহায়তা। স্কুলে পড়ার শেষ বছরে হঠাৎ সব কিছু বদলে দেওয়ার ডাক শুনে তার দেহ-মনে যে রোমাঞ্চ জাগল, দু'বছর পরে সুপার্থ পাশে এসে দাঁড়াতে তা জমাট বেঁধে গেল।

বাড়ি ছেড়ে গাংনেগড়ের গরিব কৃষকদের পাড়ায় চলে গেল। সেখানে তার আশ্রয়ের ব্যবস্থা আগে থেকে করে রেখেছিল সুপার্থ।

বাসস্ট্যান্ডে যাত্রীর জটলা কখনও কমছে, কিছুক্ষণ পরে ফের বাড়ছে। বেলা গড়ানোর সঙ্গে নিত্যযাত্রীর ভিড় হালকা হতে থাকলে, নতুন যাত্রী সমাগম কমতে থাকল। কলকাতা আর জেলার নানা জায়গা থেকে যে বাসগুলো আসছে, সেখানেও যাত্রী পাতলা। গুমটির অনেকটা জায়গা ফাঁকা লাগছে। রোদে পুড়ে পশ্চিম আকাশের নীল রঙ এতক্ষণে কালো মেঘের চেহারা নিয়েছে। বাকি আকাশের মূল চত্বর তখনও নীল, রোদে ভাসছে চারপাশে। পশ্চিম আকাশ থেকে মেঘের ডাক গড়িয়ে চলল উল্টোদিকে। অথবা মেঘের গুড়গুড় আওয়াজ উঠেছিল, নির্মেঘ, পরিচ্ছন্ন নীল, পুব আকাশে। মেঘ কোথায় ডাকল, আকাশ দেখে বোঝা যায় না। ঠান্ডা হাওয়া গায়ে লাগতে জয়া টের পেল, বৃষ্টি নামতে দেরি নেই। হাতঘড়িতে প্রায় এগারোটা বাজলেও মাথায় গামছা জড়ানো, আনোয়ারের মত কাউকে শান্তি সুইটস-এর বেঞ্চে, দুপাশে জয়া দেখতে পেল না। আনোয়ার কি অন্য কাজে আটকে গেছে, আসতে পারবে না? প্রশ্নটা মনে আসতে, মধ্যবিত্ত সন্দিগ্ধতায় ভুগছে ভেবে, জয়া সঙ্কোচ বোধ করল। শ্রমিক, কৃষকের ওপর আস্থা বজায় রাখার, দলীয় উপদেশ মনে পড়ে গেল তার। উঁচু কপালে মধ্যবিত্ত অহমিকা সরিয়ে রেখে শ্রমিক-কৃষকের ওপর অটুট বিশ্বাস, বজায় রাখতে হবে। গুরু মানতে হবে তাদের। শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচ্যুত হলে বুঝতে হবে, কমরেডের পদস্খলন ঘটেছে। দলের পক্ষে ক্ষতিকারক হচ্ছে তার ভূমিকা। অবিলম্বে তাকে ঠুঁটো জগন্নাথ করে দেবে ইতিহাস। ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বিস্মৃতির অতল খাতে ফেলে দেবে। আনোয়ার গরিব চাষি। সে যখন কথা দিয়েছে, দশটার মধ্যে বারাসতে আসবে, তখন তার প্রতিশ্রুতিতে অটল বিশ্বাস রেখে জয়াকে অপেক্ষা করতে হবে। শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ থাকলে, আনোয়ারের দেরির কারণ অনুমান করতে জয়ার অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। আনোয়ারের গাঁয়ের রুটের বাস আজ হয়তো বন্ধ আছে। বাড়ির কেউ কাল রাত থেকে ওলাউঠোয় পড়ে এই মুহূর্তে চিকিৎসার অভাবে হয়তো মৃত্যুপথযাত্রী। বাসভাড়া জোগাড় করতে বাড়ি ছেড়ে কয়েকমাইল দূরে পায়ে হেঁটে কারও কাছে গিয়ে হাত পেতেছে। ভাড়ার পয়সা হয়তো পুরোটা সেখানে না পেয়ে, বাকি পয়সা জোগাড় করতে আবার দু-চার মাইল হেঁটে আরও একজনের দরজায় হত্যে লাগিয়েছে। বারাসতে আসার বাসভাড়া জোগাড় করতে গিয়ে নির্ধারিত সময়ে, নির্দিষ্ট জায়গায় হাজির থাকার বিষয়টা হয়তো তার মাথা থেকে বেরিয়ে গেছে। শ্রমিক-কৃষক এরকম ছোটখাটো ভুলত্রুটি করে থাকে। শ্রেণী-সচেতন মধ্যবিত্তের এসব হাসিমুখে মেনে নিয়ে প্রমাণ করতে হয়, শ্রেণী হিসেবে চাকী, মজুর নিরপরাধ, যতরকম নষ্টামি, সে সবের ধাবক-বাহক মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। আনোয়ারের জন্যে কতক্ষণ অপেক্ষা করা যায়, সময়ের মাপে তা ঠিক করতে

গিয়ে নিজের নড়বড়ে মধ্যবিত্ত পরিচয়ের জন্যে জয়া একটু থতমত খেল। নিজের কবজিতে বাঁধা ঘড়িতে বেলা এগারোটা দশ দেখে সে যত সহজে সাক্ষাৎকারের নির্ধারিত সময় একঘণ্টা দশ মিনিট পেরিয়ে যাওয়াব হিসেব পাচ্ছে, হাতে ঘড়িবিহীন গরিব কৃষক, আনোয়ারের পক্ষে সময়ের সেই হিসেব পাওয়া সম্ভব নয়। তার গাঁয়ে হাতঘড়ি আছে, এমন বাসিন্দার সংখ্যা হয়তো নগণ্য। ঘড়িপরাদের কেউ, তার বাড়ির কাছাকাছি না-ও থাকতে পারে। জয়া ধরে নিল, তাকে আরও অনেকক্ষণ, অন্তত দুপুর একটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। মধ্যবিত্তের মত ঘড়ি দেখে ক্রমাগত মিনিট, মুহূর্ত পল, অনুপল গুনে, শ্রেণীনির্ভরতা হারিয়ে অধৈর্য হলে চলবে না। সাড়ে এগারোটা বাজতে জয়ার মনে হল, 'শান্তি সুইট্স'-এর বেঞ্চে সে বসলে, রাস্তার দোকানপাট, ঝুপড়ির আড়ালে গা ঢেকে দাঁড়িয়ে থাকা আনোয়ার, তাকে দেখে সাহস করে বেরিয়ে আসতে পারে। তাকে আগে দেখেনি আনোয়ার, জয়নুলের মুখে শুধু তার নাম জয়া, শহিদ সুপার্থর বউ, এই পরিচয় জেনেছে। কেবল-মাত্র এই বিবরণ দিয়ে অচেনা এক মহিলাকে খুঁজে নেওয়া সম্ভব নয়। আনোয়ারকে জয়নুল তাই বলে এসেছিল, কালো পেড়ে সাদা শাড়ি, কালো ব্লাউজ পরে, কাঁধে খয়েরি রঙের কাপড়ের ঝোলাব্যাগ নিয়ে জয়াদিদি বাসগুমটির মুখে দাঁড়াবে। আনোয়ারকে জয়াদিদি খুঁজে নিলেও চব্বিশ-পঁচিশের সেই মেয়েটার চেহারা, পোশাকের কিছু বর্ণনা, জয়ার চামড়ার চটি, খোঁপা, ফরসা রঙ সম্পর্কে দু-চার কথা, গাঁয়ের মানুষটাকে জয়নুল শুনিয়ে রেখেছিল। শিক্ষিতা, তরতাজা শহুরে এক মেয়ে সামনে এসে দাঁড়ালে আনোয়ার যাতে ঘাবড়ে না যায়, সে কারণে সবদিক বেঁধে কাজ করেছিল জয়নুল। আনোয়ার তার ফুফুর ছেলে, অর্থাৎ পিসতুতো ভাই। আনোয়ারের মগজ সে যতই ধোলাই করুক, গেঁয়ো ভাই-এর ধাত তার অজানা নয়। দিন বদলের পালায় নিজেকে জুতে দেওয়ার প্রবল বাসনা থাকলেও গ্রামীণ মনের জড়তা আনোয়ার এখনও কাটাতে পারেনি। অচেনা এক মেয়ে সামনে এসে দাঁড়ালে নির্ঘাত তার কথা আটকে যেতে পারে। জয়া যে পোশাকে ঘোরাফেরা করে,-সেই বেশে বারাসতে এসেছিল। কালোপেড়ে সাদা মিলের শাড়ি, কালো ব্লাউজ, শক্ত করে বাঁধা খোঁপা, আনোয়ারকে জয়নুল যে বর্ণনা শুনিয়েছিল, অবিকল তাই। তেলিনিপাড়ার দুর্ঘটনার আগে বারাসত থেকে আনোয়ারকে আনার বিষয়ে জয়নুলের সঙ্গে জয়ার পাকা কথা হয়েছিল। জয়া সেভাবেই এসেছে। সবকিছু নিখুঁত। বেঞ্চিতে তাকে বসে থাকতে দেখলে আনোয়ার সামনে এসে দাঁড়াবে। সত্যি কথা বলতে কি রোদে, গরমে জয়ার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। কাকভোরে শ্রীরামপুরের বাসা থেকে বেরেনোর সময় দাঁতে একটা দানা কাটেনি। খিদেও পেয়েছিল। দোকানের বেঞ্চে বসে সবচেয়ে সস্তার একটা সন্দেশ, এক গ্লাস জল খেতে যে তীব্র ইচ্ছে জেগেছে, জয়া জানে, তার নাম 'লোভ'। সামান্য সঙ্কোচ মনে জাগলেও শান্তি সুইটস-এর সামনে খালি

বেঞ্চে জয়া বসল। দেড় ঘণ্টার বেশি দাঁড়িয়ে থেকে ঝনঝন করছিল দু'পা। চাপা উদ্বেগ বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে শরীরের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়া অস্বস্তি থেকে এই সব ব্যথা, যন্ত্রণা জন্ম নেয়। বেঞ্চে বসে জয়া এত আরাম পেল যে তার মনে হল, একটা সন্দেশ, এক গ্লাস জল নিয়ে এখানে আরামসে আধঘণ্টা কাটানো যায়। বয়স্ক দোকানদার, তার সহকারী, বেঞ্চ খালি করে দিতে বলা দূরের কথা, কেউ কৈফিয়ত চাইবে না। রোদে, বৃষ্টিতে জয়ার শরীর যত পোড়খাওয়া, কালচে তামাটে হয়ে যাক, তার মুখের লাবণ্য, দু চোখের দীপ্তিতে যে পরিচয় ফুটে আছে তা হেলাফেলা করার মত নয়, এক নজরে বোঝা যায়। জয়ার সিঁথিতে সিঁদুর নেই, পাশে স্বামী নেই, তার বয়সের মেয়ের পক্ষে এই অতীব একাকিত্ব, অল্প সময়ের মধ্যে সবাই নজর করে। দোকান-মালিকও করল। তার মনে প্রশ্ন জাগলেও সে জানতে চাইল না। সবাইকে সব প্রশ্ন করা যায় না, বাস রাস্তায় পঁচিশ বছর সন্দেশ, রসগোল্লা, জিলিপি, গুঁজিয়া বেচে সে জেনে গেছে। জয়ার ফরমাশ মতো দোকানের ছোকরা কর্মী একটা সন্দেশ, এক গ্লাস জল দিয়ে গেল তাকে। বেঞ্চের একধারে শালপাতায় সন্দেশের পাশে অ্যালুমিনিয়মের ফকফকে হালকা একটা চামচ রাখল। চামচে করে যতটা সম্ভব কম সন্দেশ, বলা যায়, সন্দেশের কুঁচো মুখে তুলে সময় কাটানো দীর্ঘ করার পাশাপাশি জয়া টের পাচ্ছিল, বাসস্ট্যান্ড ছেড়ে দোকানের বেঞ্চে বসতে এসে ভুল করেছে। দোকানের সামনে এক চক্কর ঘুরে, দোকানের পাশ থেকে, সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে, রাস্তার উল্টোদিক থেকে তাকে নজর করে কেউ সরে যাচ্ছে কেউ দাঁড়িয়ে পড়ছে। বাঁ হাতে শালপাতা সমেত সন্দেশ, ডান হাতে চামচ নিয়ে মনোযোগ দিয়ে খাওয়ার ভান করলেও সে যে দর্শনীয় হয়ে উঠছে, অনুভব করছিল। তার বুকের ভেতরটা দুড়দুড় করলেও যে কোনও মুহূর্তে আনোয়ার এসে যাবে, এই আশাতে চামচে করে সন্দেশের টুকরো মুখে তোলার সঙ্গে যতটা সম্ভব চোরা-নজর বুলিয়ে নিচ্ছিল চারপাশে। মাথায় গামছা জড়ানো হেঁটো ধুতি পরা সেই মানুষটা হাজির হলে মনের উদ্বেগ, অস্বস্তি থেকে এই মুহূর্তে সে রেহাই পেতে পারে। আনোয়ার আসছে না কেন? আনোয়ার কি সকাল ন'টায় এসে এই বেঞ্চে আধঘণ্টা বসে ফিরে গেল? জয়নুলের সঙ্গে তার ঠিক কী কথা হয়েছিল, সময় নিয়ে কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে কিনা, হতে পারে, দশটার বদলে ন-টায় এসে গিয়েছিল আনোয়ার, জয়া ভেবে পাচ্ছিল না। আনোয়ার কি দুর্ঘটনায় পড়ল? শান্তি সুইটস-এর এই বেঞ্চে সে বসার আগে, পুলিস কি 'অ্যারেস্ট' করল তাকে? বেঞ্চে সে বসার পাঁচ মিনিট পরেও ঘটনাটা ঘটতে পারে। সে বাড়ি থেকে বাসরাস্তায় এসে বাসে ওঠার পর থেকে কি তার পেছনে পুলিস লেগে গিয়েছিল? পুলিসের খাতায় কি তার নাম উঠে গেছে? কীভাবে পুলিস জানল তার পরিচয়? তার বাড়িতে মাঝে-মধ্যে জয়নুল, তার সঙ্গে আরও কেউ গিয়ে এক-দুরাত কাটিয়ে এলেও আনোয়ারকে দেখে, সবলে

রাষ্ট্রব্যবস্থা উচ্ছেদকারীদের সহযোগী ভাবার কারণ নেই। তবে পুলিস এখন যা খুশি করতে পারে। করছেও তাই। কাউকে জবাবদিহি করার দায় তাদের নেই। দু-পাঁচটা লাশ যখন-তখন নামিয়ে দিতে পারে। আনোয়ারের অতি-সতর্ক হাবভাব, দু'চোখের সন্ত্রস্ত দৃষ্টি দেখে তাকে 'বিপ্লবী'র বদলে ছিঁচকে চোর ভেবেও অ্যারেস্ট করতে পারে পুলিস। প্রায় আধঘণ্টা ধরে চার আনা দামের সন্দেশ খেয়ে, তারপর ধীর চুমুকে পনেরো মিনিট ধরে জলের গ্লাস নিঃশেষ করার আগের মুহূর্তে হিমেল চাদরের মত অন্য এক ভয় তাকে জড়িয়ে ধরল। আনোয়ার অন্যরকম বিপদে পড়তে পারে। আশপাশের প্রায় সব বাড়ির দেওয়াল জুড়ে, মুখে মধুক্ষরা হাসি, এশিয়ার মুক্তিসূর্য, যে ভারতীয় দেশনেত্রীর বহুবর্ণে আঁকা বিশাল প্রতিচ্ছবি রোজ সংখ্যায় বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে তার দলের জহ্লাদপনা ক্রমশ প্রবল হচ্ছিল, প্রতিপক্ষের লাশ ফেলে দেওয়ার কাজে পুলিসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, অনেক সময়ে তাদের টপকে যাচ্ছিল সেই যুববাহিনী। প্রতিপক্ষকে ঠেকাতে পুলিসের কাজ, কখনও তাদের জানিয়ে, দরকারে না জানিয়ে করে দিচ্ছিল মুক্তিসূর্যের অনুগামীরা। দেওয়ালে আঁকা হাসিমুখ ছবিতে লাল রঙের প্রলেপ ক্রমশ চড়া হচ্ছিল। পুলিসের সঙ্গে তাদের নজর এড়ানোর সতর্কবার্তা দলের নেতৃত্বের পক্ষ থেকে সব স্তরে জানানো হয়েছিল। মুক্তিসূর্য বাহিনীর খপ্পরে আনোয়ারের জমা হয়ে যাওয়ার চিন্তা মাথায় আসতে হাড়ের মধ্যে জয়া কাঁপুনি অনুভব করল। তার মনে হল, এখনই দোকান ছেড়ে বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে কলকাতায় ফেরার প্রথম বাসে উঠে বসা দরকার। বাসস্ট্যান্ড ছেড়ে মিষ্টির দোকানে আসার আগে বিষয়টা নিয়ে খতিয়ে ভাবা উচিত ছিল। সন্দেশ খাওয়ার লোভে, অলস হয়ে গিয়েছিল তার মগজ। বেঞ্চে জলের গ্লাস রেখে, কাঁধে ঝোলানো কাপড়ের থলি ঠিকঠাক জায়গায় এনে, দোকানির পাওনা মেটাতে বেঞ্চ ছেড়ে জয়া উঠে দাঁড়ানোর আগের মুহূর্তে কুড়ি-একুশের হ্যাংলা চেহারা একটা ছেলে এসে তাকে বলল, আপনাকে একটু যেতে হবে।

কথাটা শুনে জয়া ভয়ে কেঁচো হয়ে গেলেও মুখের ভাব আগের মত রেখে সহজ গলায় জিজ্ঞেস করল, কোথায় যেতে হবে?

জয়া প্রশ্ন করার আগে হ্যাংলা চেহারার সামান্য পেছনে তার যে দুই স্যাঙাত দাঁড়িয়েছিল, তাদের একজন এগিয়ে এসে বলল, ঝালাবাবুর কাছে।

জয়া শুনল, শালাবাবু ডাকছে তাকে।

ভয়ের সঙ্গে কিছুটা অবাক হয়ে সে প্রশ্ন করল, শালাবাবু কে?

জয়ার মুখ থেকে প্রশ্নটা বেরনোর পরের মুহূর্তে অশ্লীল এক শব্দ উচ্চারণ করে হ্যাংলা যা বলল, তার মানে, জয়ার সন্তানের বাবা হতে পারে, এমন একজন, সবাই ঝালাবাবু বলে তাকে। জয়াকে সেই ঝালাবাবু ডেকে পাঠিয়েছে। বেঞ্চ ঘিরে তিনজন খাড়া হয়ে যেতে জয়া উঠে দাঁড়াল। দোকানিকে কোনও ঝামেলায় না ফেলতে দু'পা এগিয়ে, সন্দেশের দাম দিল তাকে। শুকনো মুখে জয়ার দিকে

তাকিয়ে থাকলেও মানুষটার ভেতরে যে কাঁপুনি ধরেছে, টের পেয়ে জয়ার বুক ধড়াস করে উঠল। কালো ছায়া জড়ানো আকাশের রোদের ভেতরে গড়িয়ে যেতে থাকল মেঘের গুড়গুড় আওয়াজ।

একুশ

অচেনা তিনজন ছেলের আধা ঘেরাও অবস্থার মধ্যে বাসগুমটি ছেড়ে বাঁ দিকের রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে জয়ার মনে হল, মিষ্টির দোকান ছেড়ে হুট করে বেরিয়ে এসে ভুল করেছে সে। ঝালাবাবু এলকার যতই পরাক্রান্ত মানুষ হোক, সে ডেকে পাঠালে, তাকে যেতে হবে, এমন দাসখত কাউকে সে লিখে দেয়নি। তার সমান বয়সী তিনটে ছেলে, এমন ভাষায় কথা বলছিল, যা শুনলে কানে আঙুল দেওয়ার ইচ্ছে হলেও জয়া সামলে রাখছিল নিজেকে। তাদের কথা কানে যাচ্ছে না মুখচোখে এমন এক নির্ভয় অভিব্যক্তি ফুটিয়ে রেখে হাঁটছিল। ইচ্ছে করলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গিয়ে অচেনা সঙ্গীদের বলতে পারত, ঝালাবাবুর সঙ্গে দেখা করার সময় তার নেই। বাড়িতে এমন এক রুগি সে রেখে এসেছে, যার বিছানা থেকে ওঠার সামর্থ্য নেই। তাকে বাড়ি ফিরে সে ওষুধ না দিলে তার খাওয়া হবে না। ঝালাবাবুর অনুচরদের কথাগুলো বলা দূরে থাকুক, তাদের দিকে সে ভ্রুক্ষেপ পর্যন্ত করল না। বাড়িতে রোগী রেখে আসার জের, রোগীর পরিচয়, আর রোগব্যাধি নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ, কতদূর গড়াতে পারে অস্বস্তিকর এ চিন্তা মাথায় আসতে কথার জালে ঝালাবাবুর সঙ্গে যাতে জড়িয়ে না যায়, আগে থেকে সে বিষয়ে জয়া সতর্ক হয়ে গেল। মিষ্টির দোকান থেকে এত পথ এসে, তারপর ল্যাজ গুটিয়ে পালাতে চাওয়ার মত বোকামি সে করতে চায় না। ঝালাবাবু নামে লোকটার মুখোমুখি হতে ভয়ে কুঁকড়ে যাওয়ার মেয়ে সে নয়, নিজের কাছে জয়া এটাও প্রমাণ করতে চাইছিল। আগুন মাড়িয়ে হাঁটতে থাকা বাইশ-তেইশের এক মেয়ের দুর্জয় অস্মিতা তার মাথায় জেঁকে বসেছিল। বহুখণ্ডিত চিন্তার মধ্যে পুরনো গুদোমঘরের মত টানা লম্বা, একতলা এক বাড়ির চার নম্বর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকার সময়ে আগের দরজায়, তিন নম্বরের ওপরে 'জয় বাংলা রিলিফ কমিটি' লেখা সাইনবোর্ড দেখে জায়গাটা জনমানসহীন, পরিত্যক্ত নয়, আন্দাজ করতে পারল। চার নম্বর দরজার বাইরে জয়াকে ঘিরে দাঁড়ানো ঝালাবাবুর তিন স্যাঙাতের একজন, হ্যাংলা চেহারা বলল, ভেতরে চলুন।

দরজার চৌকাঠ টপকে ভেতরে ঢুকে একফালি চাতালের সামনে দাঁড়িয়ে জয়া দেখল, ডান পাশে চারটে ছোট সিঁড়ি ভেঙে যে ঘরে হ্যাংলা ঢুকছে, গুহার মত সেই ঘরে তাকে যেতে হবে। অনতিবিলম্বে ঘরে পৌঁছে জয়া দেখল সমপরিমাণ মাংস, চর্বিতে ঠাসা পুরুষ্ট শরীর বছর চল্লিশের একজন মানুষ, চৌকো মুখ, ভাঁটার মত চোখ, কলারওলা, বুকের বোতাম খোলা, পাঞ্জাবির নীচে কুচকুচে কালো লোম, হাতল লাগানো সিংহাসনের মত একটা চেয়ারে বসে রয়েছে। তার সামনে টেবিলের এপাশে দুটো চেয়ার, চেয়ার জোড়াতে হাতল নেই। ঘরের তিন দেওয়ালের ধার ঘেঁষে সবুজ রঙ করা তিনটে বেঞ্চে 'জো হুজুর' মুখ করে কয়েকজন বসে আছে। সিংহাসনের মত চেয়ারে বসে থাকা মানুষটা যে ঝালাবাবু জয়া বুঝে গেল। তার দিকে একবার চোখ তুলে তাকিয়ে না দেখার ভান করে, ত্রিপল, চট, গালা, কেরোসিন মোমবাতির হিসেব শোনার মধ্যে হিসেবদাতাকে ধমক দিতে ঝালাবাবু এমন এক হুঙ্কার ছাড়ল, যে ঘরের ভেতরটা নিমেষে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। লোকটা একবার তাকাতে তার দু'চোখে যে জান্তব নিষ্ঠুরতা জয়া দেখল, তা আগে দেখেনি। ঘরে ঢুকে দরজার কাছে জয়া দাঁড়িয়েছিল। কেউ বসতে বলল না তাকে। শুধু দুজনকে ঘরে রেখে, বাকিদের ইশারায় চলে যেতে বলে, জয়ার দিকে কয়েক সেকেন্ড স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে সামনের হাতলহীন একটা চেয়ারে, ঝালাবাবু হাতের তর্জনী তুলে তাকে নিঃশব্দে বসতে বলল। জয়া দেখল, ঝালাবাবুর কুচকুচে কালো চোখের মণির ঠিক ওপর আর ডানপাশে জমাট রক্ত।

জয়াকে ঝালাবাবু প্রথম প্রশ্ন করল, 'শান্তি সুইটস'-এর বেঞ্চে কেন এক ঘণ্টা সে বসে আছে?

জয়া কিছু বলার আগে ফের জিজ্ঞেস করল, তার কতজন 'নাঙ' আছে?

তারপর ফোয়ারার মতএকঝাঁক প্রশ্ন, প্রত্যেকটা সমান অশ্লীল, মা বাবা স্ত্রী-শরীরকে পা দিয়ে পিষে মারার মত যন্ত্রণাদায়ক, ঝালাবাবু করে যেতে থাকল। চাঁপাডালি বাসস্ট্যান্ডে সে বাস থেকে নামার পরের মুহূর্তে যে ঝালাবাবুর নজরদারের চোখে পড়েছে, তার গায়ে তাদের দৃষ্টি আঠার মত সেঁটে ছিল, হাড়ে হাড়ে টের পেলেও আত্মপক্ষ সমর্থনে সে কসুর করল না। ভদ্রভাষায় প্রথমে সে বোঝাতে চাইল, সে দেহোপজীবিনী নয়, খদ্দেরের অপেক্ষায় মিষ্টির দোকানে বসে ছিল না।

তার সব কথা শোনার ধৈর্য ঝালাবাবুর ছিল না। নোংরা শব্দ জুড়ে জুড়ে খিস্তির লহরা ছোটাচ্ছিল সে। ঘরের দু'পাশের দুটো বেঞ্চে বসে তার দুই চ্যালা, গুরুর 'ডায়ালগ'-এর মেজাজ বুঝে কখনও ফ্যাকফ্যাক করে হাসছিল, কখনও গম্ভীর হচ্ছিল। নিজেকে সতী রমণীর পরিচয়ে হাজির করতে চাওয়া ভুল হয়েছে, বুঝতে জয়ার কয়েক সেকেন্ড লাগল। ঝালাবাবু বলল, তোকে খানকি মনে হলে থোড়াই এই কুঠিতে ধরে আনতাম। বারোভাতারি দিয়ে এস ডি ও সাহেবকে খুশি করা যাবে না। মাঝখান থেকে তাকে সিফিলিসে ধরলে আমার রিলিফের ঠিকেদারি

বরবাদ হয়ে যাবে।

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্বপাকিস্তান সীমান্তে বনগাঁ, বেনাপোল ঘিরে কয়েকশো বর্গকিলোমিটার জুড়ে যে লাখ লাখ উদ্বাস্তু ভিড় করেছে, তাদের ত্রাণের রসদ জোগানের বরাত পেয়ে ঝালাবাবু লুটতরাজ চালাচ্ছে, অনুমান করতে পারল জয়া। সাক্ষাৎ শয়তান, ঝালাবাবুকে নরম করে তার মুঠো থেকে বেরিয়ে যেতে জয়া তখন বলে চলেছে, সে বিবাহিতা, স্বামী গুরুতর অসুস্থ, তার বাচ্চা ছেলেমেয়েরা মা না ফিরলে খেতে পাবে না। দু-মুঠো ভাত রেঁধে, তাদের দেওয়ার মত কেউ নেই বাড়িতে।

ঝালাবাবুর ঘরের দরজা ভেজানো থাকলেও বাইরের চাতাল থেকে যাদের চলাফেরার আওয়াজ ভেসে আসছে, সবাই যে ঝালাবাবুর পোষা, হুকুম তামিলকারী, জয়ার সন্দেহ নেই। সে বুঝতে পারছিল, তার কথাগুলো অবিশ্বাস করার সঙ্গে ঝালাবাবু আরও নৃশংস হয়ে উঠছে। ঠোঁট দুটো জুড়ে গেছে। দাঁতে দাঁত টিপে সে নিশ্চয় রাগে ফুঁসছে। ঠিক তাই। জয়ার কথার মধ্যে ঝালাবাবু চেঁচিয়ে উঠল, এই মাগি, চুপ কর, আর কথা বললে জিভ ছিঁড়ে নেব।

অপমানে জয়ার মাথা ঝিমঝিম করলেও সে থামল না। বলল, ভদ্রভাবে কথা বলুন। আমি কিন্তু একা নই, আমারও একটা শিবির আছে। কথার মধ্যে কাপড়ের ঝোলা ব্যাগ কাঁধ থেকে নামিয়ে, থলির ভেতর হাত পুরে হাতের মুঠোয় এক গোছা বই, ইস্তেহার বার করে বলল,আমাদের দলের বই, হ্যান্ডবিল, আমাদের এক সমর্থককে দিতে বারাসতে এসেছি। মিস্টির দোকানে তার জন্যে বসেছিলাম।

জয়া কথা শেষ করার আগে ঝালাবাবু বলল, তোর সেই নাঙ আগেই জমা পড়ে গেছে আমাদের হেফাজতে। পাশের ঘরে, ফাটকে আছে।

ঝালাবাবুর কথার মধ্যে পাশের ঘরে এক পুরুষকণ্ঠ ডুকরে উঠল, আমাকে বাবু ছেড়ে দ্যান। ওরা জোর করি আমারে ওদের দলে ঢুকাইছে। আমার কোনও দুষ নাই।

সকাতর সেই গলার আওয়াজ শুনে, আনোয়ার ধরা পড়ে গেছে ভেবে আতঙ্কে জয়ার বুক কুঁকড়ে গেলেও ঝালাবাবু বলল, অ্যাই হারামজাদি শুনছিস, কী বলছে তোর নাঙ? আরও বলবে। কড়া দাওয়াই পড়লে তোর মত মেয়েছেলেকে আমাদের জিম্মায় রেখে পোঁদের কাপড় তুলে পালাবে।

ভেতরের ঘরে আটক মানুষটা যে আনোয়ার, এ নিয়ে জয়ার সন্দেহ ছিল না। আনোয়ারের দুর্দশার জন্যে নিজেকে অপরাধী ভেবে তাকে বাঁচাতে জয়া বলল, ওকে ছেড়ে দিয়ে, দয়া করে আমাকে পুলিসে দিন।

ক'জন নাঙ আছে তোর? যে কোনও লোকের সঙ্গে তোরা তো রাত কাটাতে পারিস, সেটাই তো তোদের নীতি? মেয়েরা রাষ্ট্রের সম্পত্তি, যে কোনো পুরুষের সঙ্গে শুতে পারে। তাদের জারজ ছেলেমেয়েদের বাপের ঠিক নেই। দলের যে

কোনো নেতাই তাদের বাপ! আহা, খাবলা, খাবলা মেয়েমানুষ ভোগ, কী মজা!

টেবিলের ড্রয়ার খুলে এক টুকরো কাগজ বার করে জয়ার দিকে বাড়িয়ে ধরে ঝালাবাবু বলল, নে, কী লেখা আছে পড়।

চিরকুটটা নিয়ে জয়া দেখল কাঁপা হাতের হরফে লেখা, 'আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দিন। জোর করে ওরা দলে টেনে এনেছে আমাকে। জীবনে এ কাজ করব না। আপনি হুকুম করলে বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে নিজের গাঁ ছেড়ে চলে যাব।'

মুচলেকা লেখা কাগজের নীচে ট্যারাবাঁকা দুর্বোধ্য যে স্বাক্ষর, জয়া দেখল, তা মানুষের হস্তলিপি, না কালিতে চোবানো ত্রস্ত পিঁপড়ের দ্রুত পালানোর পায়ের দাগ, জয়া বুঝতে পারল না। মগজে সে শক্তি ছিল না। ঝালাবাবুর সঙ্গে তার দুই চ্যালার কখনও চোখের ইঙ্গিতে, কখনও এক অদ্ভুত ভাষায় যে বার্তা বিনিময় হচ্ছিল, তার একবর্ণ বোধগম্য না হলেও তাকে নিয়ে যে কথা চালাচালি হচ্ছে, সে-ই বিষয়, জয়া টের পাচ্ছিল। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মত এক উপদ্রবের আশঙ্কায় তার শরীরের ভেতরটা বাইরে থেকে দেখা না গেলেও তিরতির করে কাঁপছিল।

তেষ্টায় শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে তার গলা। সুপার্থকে জয়ার মনে পড়ল। রোজই পড়ে। সুপার্থর সজীব মুখের সঙ্গে স্মৃতিতে ভেসে উঠল তার লেখা কবিতার লাইন।

"যা কিছু জীবন তাই জীবন ভেঙেই ছোটে জীবনের কাছে
কার কি বয়স লেখা আছে।"

সুপার্থ শহিদ হওয়ার পরে যে সুদীর্ঘ যন্ত্রণার অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে অনেকগুলো মাস সে কাটিয়েছে, হতাশায় ভেঙে পড়ে চাকরি নিয়ে রাজ্যেব বাইরে চলে যাওয়া যখন একরকম পাকা করে ফেলেছিল, তখন সুপার্থর কবিতার দু-এক ছত্র মনের মধ্যে জেগে উঠলে হাতের কাছে ধরার মত অবলম্বন পেত। তারপর প্রকাশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে নির্ভর করার যোগ্য আর একজনকে পেলেও দুর্যোগে, আপদবিপদে সুপার্থর কবিতা মাথায় ঝিলিক দিয়ে উঠলে সে ফের অকুতোভয় হয়ে যায়। ঘরের বাইরে থেকে এক চ্যালা এসে চেয়ারের মানুষটার কানে ফিসফিস করে কিছু বলে ঘর থেকে চলে যেতে ঝালাবাবুর দু'চোখের কালো তারার পাশে ছিটিয়ে থাকা লাল রঙ ঘন হল। জয়ার চোখে চোখ রেখে বলল, তোকে পেয়ে তোর পিরিতের নাঙকে ছেড়ে দিয়েছি। কয়েকটা রাত তুই এখন থাকবি, আমার সঙ্গে। তারপর যার কাছে তোকে ভেট পাঠানোর কথা ভেবে রেখেছি সেখানে পাঠিয়ে দেব। পুলিস-বোঝাই সরকারি গাড়ি এসে তোকে নিয়ে যাবে।

ঝালাবাবুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে পরিষদরা যখন হেসে গড়িয়ে পড়ছে, জয়ার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এলেও নরম গলায়, কিছুটা অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে বলল, দাদা, আপনার

চেহারা বলছে, আপনি এরকম কাজ করতে পারেন না।

গলাখাঁকারি দিয়ে হেসে উঠে ঝালাবাবু বলল, তুই তো আমার কিছুই দেখিসনি রে। আসল জিনিসটা যখন দেখবি, তার অল্পদিনের মধ্যে তোর পেট হয়ে যাবে। তখন তুই পৌঁছে যাবি রিলিফ কর্তাদের দখলদারিতে। বড়সাহেবের বাংলো থেকে হাত ঘুরে কোন মক্কেলের জিম্মায় গিয়ে পড়বি, খোদা জানে। জয় বাংলা!

জয়ার মাথার ভেতরে যে আগুন জ্বলছিল, সে চেপে রাখলেও তার কিছুটা তাপ লেগে গেল তার কথাতে। সে বলল, আমরা কোনও অন্যায় কাজ করছি না। দেশের মুক্তি, মানুষের মুক্তির জন্যে।

জয়া শেষ করার আগে কাঁচা খিস্তি করে ঝালাবাবু বলল, আগে আমরা গব্বা থেকে তোর মুক্তি হোক, তারপর দেশের মুক্তি, মানুষের মুক্তি, লম্বাচওড়া বুকনি শোনা যাবে।

জয়া টের পাচ্ছিল দাগি অপরাধীদের গুহায় ঢুকেছে সে। তাকে আটকে রাখার ফাঁদ ক্রমশ শক্ত হচ্ছে। জয়নুলের পা থেকে গুলি বার করতে বেলা দশটায় শ্রীরামপুরের বাসাতে প্রকাশের সঙ্গে যে বন্ধু ডাক্তারের আসার কথা ছিল, সে কি ঠিক সময়ে এসে কাজ শেষ করতে পেরেছে? জয়নুলের পায়ের পাতায় ঢুকে থাকা দুটো গুলি কি বার করা গেছে? সময়মতো জয়নুলকে ওষুধ দিতে, খাওয়াতে, প্রকাশের নিশ্চয় অসুবিধে হয়নি। কলেজে পড়ার সঙ্গে সনৎকাকার যোগাযোগে 'নার্সিং'এ কাজ কিছুটা শিখে রাখায় জয়া যে কত উপকৃত হয়েছে তার হিসেব নেই। শ্রীরামপুরে গোপন ডেরার খবর পুলিস না জেনে গেলে, সেখানে কোনও গোলমাল হওয়ার কথা নয়। নিজের পায়ে জয়নুল না দাঁড়ানো পর্যন্ত, মনে হয় আশ্রয়টা নিরাপদ, ঝামেলা হবে না। ঝালাবাবুর টেবিলের ওপর হিজিবিজি সই করা মুচলেকা লেখা যে কাগজের টুকরোটা পড়ে আছে, তা কি আনোয়ারের লেখা? জয়নুলের মুখ থেকে আনোয়ার সম্পর্কে জয়া যা শুনেছে, তা থেকে অচেনা সেই মানুষটা, চিঠি যত ছোটই হোক, এত গুছিয়ে লিখতে পারে, জয়ার মনে হয়নি। চিরকুটটা আনোয়ারের লেখা নয়। পাশের ঘরে কিছুক্ষণ আগে যে লোকটা ডুকরে কেঁদে উঠল, সে যদি আনোয়ার না হয়, তাহলে কে? কী তার পরিচয়? তাকে ছেড়ে দেওয়ার বদলে হাসতে হাসতে তার গলা কেটে, ঝালাবাবুর চ্যালারা, রাস্তাঘাটে যেখানে সেখানে ছুঁড়ে ফেলে দিলে, লাশের ভিড়ে শুধু একটা সংখ্যা বাড়বে। পরশু ভোরে, শ্যামনগরের ঘাটের পাশে, পায়ের নীচে মাটি পেয়ে ভাসতে থাকা একটা লাশ, কয়েকজন স্নানার্থীর সামনে, পেট থেকে বেরিয়ে আসা নাড়িভুঁড়ি দু-হাতে আগলে ধরে, হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে, কিছু বলতে গিয়ে বেহুশ হয়ে যায়। জনা তিন-চার বয়স্ক মানুষ যারা বুকজলে গা ডুবিয়ে নিজেদের মাজাঘষা করছিল, অল্পবয়সী সেই ছেলেটাকে নজর করে, ভূত দেখার মত ভয় পেলেও তাড়াহুড়ো করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিল। হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে তার দেওয়া

বিবৃতি থেকে জানা যায়, টিটাগড়ে মেজদার দলবল, তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে, ছুরি মেরে তার পেট ফাঁসিয়ে দিয়ে তাকে জোয়ারের গঙ্গায় ভাসিয়ে দেয়। পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়া যাকে মৃত ভেবে টিটাগড়ের গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সে তখনই না মরে, দু'হাতে নিজের নাড়িভুঁড়ি সামলে রাতভর ভেসে, শ্যামনগরের ঘাটে এসে ঠেকবে, মেজদার চ্যালারা ভাবতে পারেনি।

বারাসতের বাসে বসে আজ সকালের সংবাদপত্রে জয়া খবরটা পড়েছিল। ভাঁজ করা খবরের কাগজটা এখনও তার কাপড়ের ঝোলায় রয়েছে। কিছু সময় আগে, পাশের ঘরে বন্দি, একজনকে ছেড়ে দেওয়ার আশ্বাসবাণী জয়াকে শুনিয়ে, আদপে কোথায় নিয়ে যাওয়া হল, ভেবে জয়ার গায়ে কাঁটা দিল। মানুষটা অচেনা হলেও বন্ধুদের একজন, জয়া আগেই বুঝেছিল। বেঁচে থাকতে চেয়ে, ফেঁসে যাওয়া পেটের নাড়িভুঁড়ি আগলে সারা রাত যে ছেলেটা জলে ভাসিয়ে রেখেছিল নিজেকে, সে-ও যে তার ভালবাসার মানুষ, সুপার্থর মত এক প্রিয়জন, জয়ার আজানা নয়। ঘরে-বাইরে এরকম বন্ধু যেমন কম নেই. তেমনি সংখ্যায় বাড়ছে বারাসতে ঝালাবাবু, টিটাগড়ে মেজদা, কলকাতায় ফাটা কেষ্টার মত ঘাতক আর তাদের বাহিনী। পুলিস, প্রশাসনের সঙ্গে তারাও মহান গণতান্ত্রিক ভারত রাষ্ট্রের এক স্তম্ভ।

জয়াকে চুপ করে থাকতে দেখে ঝালাবাবু বলল, অ্যাই তো লক্ষ্মী মেয়ে! আমার সঙ্গে দু-এক রাত কাটালে আরও লক্ষ্মী হয়ে যাবি।

দুজনের জায়গায় এখন ঘরে চ্যালার সংখ্যা বেড়েছে। ওস্তাদের কথা শুনে তারা বাজখাই আওয়াজ করে হেসে উঠতে ঝালাবাবু বলল, তোরা বাড়ি থেকে নেয়ে-খেয়ে আয়। মেয়েটাকে পাহারায় থাকুক বুটু আর সাঁটুল। আমিও বাড়ি থেকে চাট্টি খেয়ে আসছি।

এক সেকেন্ড থেমে ঝালাবাবু বলল, পেটে জায়গা রেখে খেতে হবে, এখানে তো আবার 'বড়হা কাবাব' রইল। সেটাও সাবড়ে খেতে হবে।

জয়ার দিকে তাকিয়ে ঝালাবাবু কথাটা বলতে আবার হো হো করে হেসে উঠল সবাই। মিষ্টির দোকান থেকে যে তিনজন ছেলে তুলে এনেছিল জয়াকে, তাদের একজন ছাড়া ঝালাবাবুর সঙ্গে ঘর থেকে সকলে বেরিয়ে গেল। লম্বা, মজবুত শরীর, গম্ভীর মুখ একজন, যাকে এখানে আসার পর থেকে জয়া এই প্রথম দেখল, সে ঘরে ঢুকল। জয়ার দিকে সে তাকাল না। দুজনের কে বুটু, সাঁটুলই বা কে, জানার আগ্রহ জয়ার ছিল না। পাথরের মত চেয়ারে সে বসে থাকলেও তার মাথায় ঝড় বইছিল। অসহায়তা, ভয়, দুশ্চিন্তার মধ্যে আদিবাসী চাষিদের গ্রাম গাংনেগড়ে থাকার দিনগুলো তার মনে পড়ছিল। অন্ধকারে ডুবে থাকা ভারতের তিন লক্ষ নামের একটা, গাংনেগড়ের পাশে ডেমরা গ্রামে, কানাই মুর্মুর বাড়িতে, তার মেয়ে উজানির সঙ্গে রাত এগারোটায় পৌঁছেছিল। নিস্তব্ধ বিস্তৃত ফাঁকা মাঠের কোথাও একছিটে আলো নেই, মানুষ থাকলেও প্রাণের সাড়া

নেই, অজগরের পেটের মধ্যে মৃত এক ভূখণ্ড, অনন্ত শয়ানে ঘুমিয়ে রয়েছে। মাটি ফুঁড়ে সেই অন্ধকার থেকে সুপার্থ, আরও যে দু-তিনজন এসে দাঁড়াল, সুপার্থ ছাড়া বাকিদের মনে হয়েছিল ছায়ামূর্তি। কেরোসিন কুপির আলোতে তার সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা টেনে দিয়ে সেই রাতে বিয়ের পাট চুকিয়ে নিয়েছিল সুপার্থ। সুপার্থর জীবনসঙ্গিনী হয়ে গিয়েছিল সে। বিয়ের ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পাশের গাঁয়ে মনিবের ধানের গোলা পাহারার কাজে সুপার্থ চলে গিয়েছিল। অন্ধকারের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বিয়ের পর্ব চুকিয়ে মিলিয়ে গিয়েছিল অন্ধকারে।

ঝালাবাবুর দুই চ্যালা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজার দুটো পাল্লা টেনে বন্ধ করে শেকল তুলে তালা মেরে দিল কি না, জয়া বুঝতে পারল না। শেকল লাগানোর আওয়াজ পায়নি। শেকল না তুলে দরজার দুটো কড়ায় তালাচাবি লাগিয়ে দিলে ঘরের ভেতরে বসে তা বোঝা সম্ভব নয়। জয়া সে চেষ্টা করল না। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর শক্তি পাচ্ছিল না সে। দরজা খোলা থাকলেও এই অচেনা বিভুঁই-এ পালানোর আগে সে সাতবার ভাবত। বাসস্ট্যান্ড থেকে বেশি দূরে না এলেও সেখানে ফিরে যাওয়ার পথ এই মুহূর্তে খুঁজে পাবে কি না, মাথায় এ সন্দেহ জাগতে তার হাত-পা শিথিল হয়ে যাচ্ছিল। ভাবনাগুলো তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল মাথার মধ্যে। ঝালাবাবু ফেরার আগে এই মৃত্যুগুহা থেকে বেরোতে না পারলে যে অন্ধকারে সারা জীবনের মত তলিয়ে যাবে, সেখান থেকে হয়তো আর ফিরতে পারবে না। পুকুরে, ডোবায়, হয়তো গঙ্গার জল থেকে পাওয়া যাবে তার লাশ। ধর্ষিতাকে আজকাল লুঠেরারা বাঁচিয়ে রাখে না। নিরাপদে লুঠতরাজ, খুন, ধর্ষণ করার নিয়ম তারা শিখে গেছে। তাদের মাইনে করা আইনজীবীর সংখ্যা হুহু করে বেড়ে চলেছে। আইন-জানা, নিষ্ঠাবান উকিলদের জীবিকা চালানো কঠিন হয়ে পড়ছে। জেলে সুপার্থকে যারা পিটিয়ে মেরে ফেলল, সেই সংগঠিত সরকারি খুনিবাহিনীর বিরুদ্ধে আদালতে সওয়াল করার মত আইনজীবী জোগাড় করতে মানবাধিকার কর্মীদের ঘাম বেরিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত আড়াল থেকে প্রকাশই উদ্যোগ নিয়ে আইনজীবী জোগাড় করে, জেলে সুপার্থ-খুনের মামলা আদালতে পৌঁছোনোর ব্যবস্থা করেছে। জয়া জানে, তার ফিরতে দুপুর গড়িয়ে গেলে প্রকাশ ভীষণ অস্থির হবে। বিকেলের আগে শ্রীরামপুরের বাসায় পৌঁছে প্রকাশকে সরিয়ে জয়নুলের পরিচর্যার দায়িত্ব সে নিজে নিতে চায়। জয়নুলের পরিচর্যার কাজ কম কঠিন নয়। তার পায়ের ড্রেসিং করতে অনভিজ্ঞ প্রকাশ আতান্তরে পড়ে যাবে।

দরজা খুলে সেই লম্বা, গম্ভীর ছেলেটা ঘরে ঢুকে জয়ার মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে চাপা গলায় বলল, যদি বাঁচতে চাও, এখান থেকে পালাও, আমি পথ বাতলে দেব।

অচেনা ছেলেটার কথা শুনে আরও ভয় পেয়ে গেল জয়া। প্রথমে ভাবল,

তার সঙ্গে মজা মারতে গম্ভীর মুখ ছেলেটা তামাশা করছে। ঝালাবাবুর ফাঁদের ভেতরে আরও জটিল এক ফাঁদ তৈরি করে তাকে চরম হেনস্থার ছক কসছে।

জয়াকে চুপ করে থাকতে দেখে ছেলেটা বলল, পালাতে চাইলে চটপট্ এসো। পরে সময় পাবে না

ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু না ভেবে জয়া বলল, তুমি তো ঝালাবাবুর দলে। আমাকে পালাতে সাহায্য করতে চাও কেন?

এত জবাবদিহি করার সময় নেই। হোটেল থেকে ভাত খেয়ে যখন-তখন বুটু ফিরে আসতে পারে। এসো আমার সঙ্গে।

জয়া সাহস করে জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কি সাঁটুল?

হ্যাঁ।

আমি পালিয়ে গেলে তুমি তো বিপদে পড়বে।

সে আমি সামলাব। কথা বাড়িও না, এসো।

ঘরের বাইরে চাতালে এসে সাঁটুলের পাশে দাঁড়িয়ে জয়ার মনে হল, সিনেমায় দেখা ছবির মত ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে। আমগাছের তলা দিয়ে, পায়ে-হাঁটা পথে যে দরজা দিয়ে এই গুদোমঘরে জয়া ঢুকেছিল, সেদিকে না গিয়ে আলাদা পথে জয়াকে নিয়ে চলল সাঁটুল। সুড়ঙ্গের মত অন্ধকার গলি দিয়ে যাওয়ার সময়ে সাঁটুল বলল, এই বাড়িতে এক সময়ে নীলের কুঠি ছিল। এই সুড়ঙ্গ সাহেবদের আমলে তৈবি।

সাঁটুলের সঙ্গে বেশ কিছুটা হেঁটে সুড়ঙ্গের শেষ মাথায় আলোর হাঁ-মুখে এসে সামনে তিন ধাপ ওপরে রাস্তা দেখতে পেল জয়া। রাস্তায় এসে অল্প দূরে অন্য এক বাসস্ট্যান্ডে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে যে বাসটা ছাড়ার আগে শরীর ঝাঁকাচ্ছে, সেটা দেখিয়ে সাঁটুল বলল, কলকাতার বাস, এখনি ছেড়ে যাবে। উঠে যাও। জানলার ধারে বোসো না।

বাসের দিকে পা বাড়ানোর আগে সাঁটুলকে জয়া জিজ্ঞেস করল, তুমি কে? আমাকে বাঁচাতে কেন নিজের বিপদ ডেকে আনলে?

আমি 'ম্যানেজ' করে নেব।

কথাটা বলে, সামান্য দ্বিধা জড়ানো গলায় সাঁটুল বলল, তোমাদের দলে প্রথম দিকে আমিও ছিলাম। সে অনেক কথা।

সাঁটুল আর দাঁড়াল না। মুখ ঘুরিয়ে সুড়ঙ্গের সিঁড়ির দিকে হাঁটতে থাকল। দমকা ঠান্ডা বাতাসে গাছপালা জুড়ে উথালপাথাল শুরু হতে জয়া বাসে গিয়ে উঠল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বাসের চাকা গড়াতে শুরু করলে ঝেঁপে বৃষ্টি নামল। হু-হু হাওয়াতে খোলা জানলা দিয়ে সজোরে বৃষ্টির ছাঁট বাসে ঢুকতে যাত্রীরা হুটপাট করে জানলা বন্ধ করতে শুরু করল। সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুঠো থেকে বেরিয়ে এসে বাস কিছু পথ যাওয়ার পরে জয়া যখন অনুভব করল, সে নিরাপদ, কাঁপুনি

দিয়ে জ্বর এল তার। প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা থেকে সারা শরীরে রিরি তাপ ছড়িয়ে পড়ছিল। মুখের সামনে ডান হাতের পাতা ধরে কয়েকবার নিশ্বাস ফেলে টের পেল ফুটন্ত জলের বাষ্প লাগছে হাতে। ঝলসে যাচ্ছে হাতের পাতা। কোন সকালে চার আনা দামের একটা সন্দেশ, এক গ্লাস জল ছাড়া পেটে কিছু না গেলেও খিদে পাচ্ছে না। বুকফাটা তেষ্টায় গলা শুকিয়ে জ্বালা করছে। আধো ঘুম জাগরণের মধ্যে শ্যামবাজারে দুপুরের শেষে বাস থেকে নেমে মাথা ঘুরে রাস্তায় পড়ে যাওয়ার আগে জয়া সামলে নিল নিজেকে। পেছনে ফুটপাথ। বসার মত রক, একটা বেঞ্চ চোখে পড়ল না। ঘুরন্ত মাথায় কয়েক সেকেন্ড স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে, অন্ধ ভিখিরির মত গুটিগুটি পায়ে রাস্তার ভিড়ভাট্টার ফাঁকফোকর গলে খালপাড়ের এক বস্তিতে সুদীনের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। জয়ার ভাগ্য ভাল বাড়িতে সুধীন, তার বউ ইলা ছিল। দুজনে গ্রুপ থিয়েটারে প্রগতিবাদী নাটক করলেও বস্তির ঘরের ভাড়া দিয়ে দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না। পেট ভরে খাওয়ার লোভ কোনও মাসে সংবরণ করতে না পারলে, সে মাসে ঘর ভাড়া বাকি পড়ে যায়। প্রকাশের সঙ্গে লতাপাতায় পারিবারিক সম্পর্ক আছে সুধীনের। মতের দিক দিয়ে প্রকাশের অনুগামী হলেও নাটক, মঞ্চ অভিনয় নিয়ে সুধীন থাকতে চায়। ইলাও সেই পথে, স্বামীর সঙ্গিনী। জয়ার মুখচোখের চেহারা দেখে সুধীন জিজ্ঞেস করল, রাঙাদি, এ কি দশা হয়েছে আপনার?

জয়াকে রাঙাদি বলার চল করেছিল সুধীন। তার বৌ ইলা, নাটকরে গ্রুপের ছেলেমেয়েরা, এই বস্তির অনেকের কাছে সে এখন 'রাঙাদি'। শ্রীরামপুরে প্রকাশের কাছে তার খবরটা সুধীনকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছে দিতে বলে, স্পষ্ট করে ঠিকানাটা জানিয়ে, জয়া হুঁশ হারিয়ে ফেলল। তাকে দু'হাতে ধরে তক্তপোশে শোয়াতে গিয়ে ইলা টের পেল জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে জয়ার শরীর। স্ত্রীর কথাতে জয়ার কপালে হাত রেখে সুধীন আঁতকে উঠল। বলল, এখনই ডাক্তার দেখানো দরকার।

ডাক্তার ডাকতে যাওয়ার আগে জয়ার মুখ থেকে শোনা শ্রীরামপুরের ঠিকানাটা, যাতে ভুলে না যায়, তখনই এক টুকরো কাগজে সুধীন লিখে নিল। জয়াকে ডাক্তার দেখিয়ে, তার ফর্দ অনুযায়ী ওষুধ কিনে দিয়ে শ্রীরামপুরের বাসে সুধীন যখন উঠল, বিকেল ফুরিয়ে গেছে। তার মাথায় একটাই চিন্তা, প্রকাশকে শ্রীরামপুরে না পেলে জয়ার খবর তাকে কীভাবে দেবে? শ্রীরামপুর থেকে বাড়ি ফিরতে মাঝরাত গড়িয়ে গেলেও প্রকাশকে খুঁজে বার করে জয়া যে ভীষণ অসুস্থ, তাকে জানানো দরকার। জয়াকে দেখলেই সুপার্থকে, তার অসংখ্য কবিতা, সুধীনের যা কণ্ঠস্থ, সূর্যোদয়ের আলোর মত তাকে ঘিরে ধরে। বয়সে ছোট সুপার্থর শহিদ হওয়ার খবর শুনে সে কেঁদেছিল। মনের গভীরে মৃত্যুভয় থেকে যাওয়ায় নিজেকে কাপুরুষ মনে হয়েছিল। মরার ভয়ে মরে থাকার লজ্জা নিয়ে সারাজীবন কাটাতে হবে ভাবলে, তার লজ্জা করে। জয়ার কিছু ঘটে গেলে প্রকাশের কাছে সে মুখ দেখাতে পারবে না।

বাইশ

শ্রীরামপুরের ঠিকানা খোঁজ করে সেখানে পৌঁছে প্রকাশকে জয়ার গুরুতর অসুস্থতার খবর সুধীন যখন জানাল, তখন আরও সঙ্কটাপন্ন এক রোগীর পায়ের রক্তে ভিজে ওঠা ব্যান্ডেজ খুলে নতুন 'ড্রেসিং' করতে প্রকাশ হিমশিম খাচ্ছে। জয়ার অসুস্থতার বিবরণে, সুধীনের শেষ কথাটা ছিল, রাঙাদিকে বাঁচাতে হলে আজ রাতেই হাসপাতালে ভর্তি করা উচিত।

জয়াকে ইলা ডাকত 'রাঙাদি' বলে। সেই সুবাদে সুধীনও বলত রাঙাদি।

জয়নুলের পায়ের পাতায় ঢুকে থাকা শেষ গুলিটা ঘণ্টাকয়েক আগে যে বন্ধু ডাক্তার বার করে, সযত্নে ড্রেসিং করে, চলে যাওয়ার সময়ে, আপাতত চব্বিশ ঘণ্টা নিশ্চিন্ত থাকতে বলেছিল, সে যাওয়ার দু ঘণ্টার মধ্যে পায়ের ক্ষত থেকে রক্ত উপচে উঠে ব্যান্ডেজ ভিজিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে পড়তে থাকবে, প্রকাশ ভাবেনি। ডাক্তারকে ফের ডেকে আনার বদলে প্রকাশ ঘরে রাখা বাড়তি ব্যান্ডেজের কাপড় নিয়ে নিজে 'ড্রেসিং' করতে বসে গিয়েছিল জয়নুলের পা। তুলোর 'প্যাড' চেপে রক্ত বন্ধ করে নতুন ব্যান্ডেজ বাঁধার সময়ে প্রকাশ যখন ভাবছে, জয়া এখন এসে গেলে আরও পাকা হাতে 'ড্রেসিং' করতে পারত, তখনই সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল সুধীন, তার মুখে জয়ার খবর। গুলিতে থেঁতলে যাওয়া জয়নুলের পায়ের বাঁধনে স্টিলের 'ক্লিপ' দুটো এঁটে শান্তগলায় প্রকাশ বলল, আজ রাতটা তোমাদের রাঙাদিকে ইলা আর তুমি সামলাও। কাল সকালে কাউকে ধরে এখানে বসিয়ে রেখে বেলা বারোটার মধ্যে জয়ার কাছে পৌঁছে যাব। তারপর যা করার করব। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে গলা নামিয়ে প্রকাশ বলল, জয়নুলের বউ পরিচয়ে জয়া এখানে আসার পর থেকে চার রাত কাটিয়েছে। তার বদলে দলের অন্য একজন মহিলা কমরেডকে এখানে জয়নুলের বৌ পরিচয়ে এখন এনে রাখলে তাকে দেখে নবেন্দু ঘাবড়ে যাবে। জয়াকে তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে না আনলে বাড়িওয়ালা নবেন্দু লস্করের সঙ্গে আমার যত হৃদ্যতাই থাকুক, এই ঘরে ঢুকলে তার মনে প্রশ্ন জাগবে, বাস দুর্ঘটনায় সাঙ্ঘাতিক জখম, শয্যাশায়ী মানুষটার বউ স্বামীকে অন্য একজন মেয়ের জিম্মায় রেখে কোথায় গেল? আমাকে কিছু জিজ্ঞেস না করলেও প্রশ্নটা তাকে খোঁচাবে। তেলিনিপাড়ায় পুলিসের ঘেরাও টপকে পালানোর সময়ে পায়ে গুলি খেয়ে প্রাণে বেঁচে তার বাড়িতে যে শুয়ে আছে, তার নাম জয়নুল, তাকে গোরুখোঁজা খুঁজছে পুলিস, এত খবর নবেন্দু জানে না। আমি বলিনি। সব ঘটনা শুনলে নিরীহ, ভালমানুষ লোকটা তার ঠিকানায় আমাদের এটা গোপন আস্তানা অনুমান করে ভয় পেয়ে যেত।

ঘুমের ওষুধ খাইয়ে জয়নুলকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে প্রকাশ। ঘুমের মধ্যে বিছানায় পাশ বদলের কষ্টকর চেষ্টা করছে সে। মাথার ওপর পাখা ঘুরলেও ঘরের

গুমোট যাচ্ছে না। হাতঘড়িতে সুধীন দেখল সাড়ে-আট, রাত বাড়ছে। শ্যামবাজার যাওয়ার শেষ বাস, শ্রীরামপুরের গুমটি থেকে ছেড়ে যাওয়ার আগে সুধীন সেটা ধরতে চায়। ইলা তার অসুস্থ রাঙাদিকে আগলে বসে থাকলেও, তার ফিরতে দেরি হলে উৎকণ্ঠায় ভেঙে পড়বে, সুধীন জানে। প্রকাশ বলল, চল, বাইরে গিয়ে দাঁড়াই। চা খেতে চাইলে কাছাকাছি একটা দোকান আছে। খাবে নাকি?

শ্যামবাজারে যাওয়ার শেষ বাস রাত নটা দশে ছাড়ে জেনে প্রকাশের সঙ্গে রাস্তায় এসে চা খাওয়ার বদলে বাসস্ট্যান্ডের দিকে সুধীন হাঁটতে শুরু করল। রাস্তা বেশ অন্ধকার। বেশিরভাগ বাতি নিভে আছে। কতদিন নিভে আছে সুধীন না জানলেও, গোপন ডেরা বানাতে এরকম অন্ধকার গলি যে আদর্শ জায়গা, ভেবে খুশি হল। পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত সুধীন মধ্য কলকাতার দোতলা পাকা বাড়িতে থাকলেও, গেল চার বছর বস্তিতে বাস করে ইলেকট্রিক সংযোগবিহীন অন্ধকারে জীবনযাপন করতে করতে, অন্ধকার গলিঘুঁজি দিয়ে হাঁটতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। অনায়াসে বাসস্ট্যান্ডে এসে রাতের শেষ বাসের আগেরটা পেয়ে সে উঠে বসল। হাতে গোনা কিছু যাত্রী নিয়ে দু-তিন মিনিটের মধ্যে বাস ছেড়ে দিতে এগারোটার মধ্যে বাড়ি পৌঁছে যাবে ভেবে সুধীন খুশি হল। শ্যামবাজার এলাকায় রাত এগারোটাতেও রাস্তায় অনেক মানুষ, পাঁচমাথার মোড়ে বাস-ট্রামের লাইন থাকে। ফাঁকা জি টি রোড দিয়ে ঝড়ের গতির ছুটন্ত লরির সঙ্গে প্রায় পাল্লা দিয়ে বাসকে দৌড় করাচ্ছে চালক। বাসে যাত্রী বেড়েছে। বসতে জায়গা না পেয়ে বেশ কয়েকজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাসের গতিতে কিছু যাত্রী মজা পেলেও অনেকে, বিশেষ করে যারা দাঁড়িয়ে রয়েছে, তারা বিরক্ত হচ্ছে। বিড়বিড় করে এক-দুজন কিছু বলছে। বোধহয় ড্রাইভারকে গাল দিচ্ছে। সুধীনের সামনের সিটে সিড়িঙ্গে চেহারা, লম্বা, একমুখ কাঁচাপাকা দাড়ি, বয়স্ক এক যাত্রী হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে হুঙ্কার ছাড়ল, বলি হচ্ছেটা কী! লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দেব কিন্তু!

ড্রাইভার, কন্ডাক্টরের কেউ তার চিৎকারে কান দিল না। টকটকে লাল চোখ, তান্ত্রিকের মত চেহারা, বয়স্ক মানুষটা কাঁপছিল, না টলটলায়মান, সুধীন বুঝে ওঠার আগেই সামনের দরজার দকে দু-পা এগিয়ে বাসের মেঝেতে দাড়িওলা নির্লিপ্তের মত বসে পড়ে, বিরাট এক হিক্কা তুলে হুড়হুড় করে বমি করে দিল। সামনের যাত্রীরা ছিটকে সরে গেল। বসার জায়গা যারা পেয়েছে, তারা পা তুলে বসার চেষ্টা করল। যাদের বসার জায়গা জোটেনি, তারা কোণঠাসা হয়ে সিঁটিয়ে, কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে, তারপর নিজেদের উদ্ধার করতে বমি না মাড়িয়ে সাবধানে এক-এক করে গাড়ির পেছন দিকে চলে আসতে থাকল। রুমালে নাক ঢেকেছে অনেকে। বাসের ভেতরটা হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে যেতে কিছু অঘটন ঘটেছে অনুমান করে গাড়ির গতি কমিয়ে দিল ড্রাইভার। গতি কমে যেতে দিশি মদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। সামনে বমির স্রোত নিয়ে বসে দাড়িওলা লোকটা বলল, এই আমার

মুক্তাঞ্চল! কেউ এখন গুলি করে আমাকে মেরে দিলেও আর হটাতে পারবে না এখান থেকে।

দু-দরজার কন্ডাক্টর দুজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করছিল। সামনের দরজার কন্ডাক্টর হঠাৎ একটা খিস্তি করে সিঁড়ির ওপরের ধাপে উঠে এসে বলল, চলন্ত বাস থেকে তোকে ছুঁড়ে ফেলে দেব।

আগুন ছড়ানো দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে দাড়িওলা আবার সজোরে 'ওয়াক' তুলতে কন্ডাক্টর মুহূর্তে নেমে গেল সিঁড়ির শেষ ধাপে। যাত্রীদের একজন বলল, শ্যামবাজার পর্যন্ত এ গাড়িতে যাব কীভাবে? অসম্ভব! ভদ্রশলিতে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ধুয়ে নাও।

তার কথায় দুই কন্ডাক্টর কান না দিলেও ভদ্রশলি ছেড়ে উত্তরপাড়ায় বাস পৌঁছোতেই রাস্তা আটকে থাকা এক দঙ্গল পুলিসের নির্দেশে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। সাত-আটজন পুলিস রাস্তা 'ব্যারিকেড' করে দাঁড়িয়েছিল। বাস থামতে কয়েকজন বন্দুক তাক করে, পাঁচ ব্যাটারির টর্চ জ্বেলে দুজন, বাকিরা নিজেদের আগ্নেয়াস্ত্র বাগিয়ে ধরে গাড়ি ঘিরে ফেলল। রিভলভার হাতে উর্দি-পরা চারজনের দুজন পেছনের দরজা দিয়ে বাসে উঠে পড়লেও সামনের দরজার সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসা দুই অফিসারের একজন বাসের চাতালে পা দিয়ে, জটাজুটওলা এক বুড়ো মাতালকে বমি করে বসে থাকতে দেখে 'যত্তো শালা মাতালের কাণ্ড, বলে পেছনের জনকে বলল, ভেতরে ঢোকার উপায় নেই। হারামিটা বমিতে ভাসিয়ে রেখেছে। পা ফেলব কোথায়?

সামনের দরজার মুখ আগলে দুই রিভলভারধারী দাঁড়িয়ে গেলেও পেছনের দরজা দিয়ে যারা ঢুকেছিল, সেই দুই অফিসার, টর্চ হাতে তাদের সঙ্গী, বাসযাত্রীদের মুখে টর্চের জোরালো আলো ফেলে খুঁটিয়ে নজর করে কাউকে খুঁজতে শুরু করল। কাকে খুজছে না জেনেও ভয় পেয়ে গেল সুধীন। চোখে আলো পড়তে যাদের চোখ ধেঁধে যাচ্ছে, তাদের কেউ মুখ ঘুরিয়ে নিলে বিকট ধমক খাচ্ছিল। মুখ লুকোনোর চেষ্টা করলে রিভলভারের গুলিতে বুক ফুটো করে দেওয়ার হুমকি দিল এক অফিসার। ভয়ে গুড়গুড় করছিল সুধীনের বুক। জয়ার কোনও বিপদ ঘটেছে কিনা বুঝতে পারছিল না। তার ঘর থেকে জয়াকে অ্যারেস্ট করে, সেই সূত্রে খবর সংগ্রহ করে, তাকেই কি পুলিস খুঁজছে? শ্রীরামপুর থেকে তার ফেরার পথ আটকে পুলিস অপেক্ষা করছে? তাকে খুঁজতেই কি পুলিসের এই অভিযান? তাকে পুলিস কেন খুঁজবে? সেইভাবে রাজনীতি সে করে না। গ্রুপ থিয়েটারের কর্মী সে। সমাজসচেতন নাটকের দল আছে তার। সে পরিচালক, অভিনয়ও করে। অফিস-ক্লাবের নাটকে ভাড়াটে অভিনেত্রী, বস্তিবাসিনী ইলাকে বিয়ে করার অপরাধে তাকে বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। তাদের বস্তিতে আর একটা ঘরে ইলার বিধবা মা, স্কুলে-পড়া ছোট ছেলেকে নিয়ে থাকে। সুধীনের দলে অভিনয় করার

সঙ্গে মায়ের সংসার টানতে ইলাকে এখনও অফিস-ক্লাবগুলোতে অভিনয়ের খেপ খাটতে হয়। সুধীন চাকরি করে পুরসভার পাম্প হাউসে। কাজের চেয়ে সেখানে অবসর বেশি। রোজ যেতে হয়, এই যা মুশকিল! সে ডুব দিলে সহকর্মীদের কেউ তার কাজ করে দেয়। ঋণ শোধ করে দেয় সে, গতরে খেটে, নাটক দেখার টিকিট দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে ছাপোষা বলতে যা বোঝায়, সে তা-ই। তার চেয়ে ইলা বরং বেশি তেজি আর সাহসী। ইলার রাঙাদিকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য তাকে অ্যারেস্ট করতে কি পুলিস এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে? যাত্রীদের কাউকে সন্দেহজনক ঠেকলে তার মুখের ওপর বাঘের থাবার মত পাঁচ ব্যাটারির টর্চের আলো পড়ে থেমে থাকল। আলোর ঝাপটায় মনে হচ্ছিল সে অন্ধ হয়ে গেছে। সাজানো প্রশ্নগুলো যখন পরপর তার দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে, দাড়িওলা লোকটা আবার ওয়াক তুলে পেছনের দরজার দিকে দ্বিতীয় দফায় বমির বন্যা বইয়ে দিল। টর্চের আলো সেই মুহূর্তে নিভে যেতে সুধীন অন্ধকার দেখল দু-চোখে। দাড়িওলার বাপ-বাপান্ত করে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল প্রশ্নকর্তা অফিসার। দ্রুত বাস থেকে নেমে আকাশের দিকে রিভলভার তুলে ফাঁকা আওয়াজ করল। দাড়িওলা বুড়ো মাতাল লোকটাকে দেবদূত মনে হল সুধীনের। বমি করে বাসের ভেতরটা ভাসিয়ে দিয়ে পুলিসের তল্লাসীর নৈতিক জোর গড়াতেই ভেঙে চৌপাট করে দিয়েছিল।

উত্তরপাড়ায় আধঘণ্টা দেরি হলেও সওয়া এগারোটায় শ্যামবাজারে পৌঁছে সুধীন স্বস্তি পেল। পাঁচমাথার মোড়ে তখনও কিছু মানুষ, গুটিকয়েক বাস-ট্রাম চলাফেরা করলেও নির্জন, অন্ধকার বস্তির, অন্ধকার গলি দিয়ে, দরজা বন্ধ অন্ধকার ঘরের কপাটে সুধীন টোকা দিতে ভেতর থেকে ইলা প্রশ্ন করল, কে?

আমি।

সুধীনের গলা শুনে দরজা খুলে দিল ইলা। প্রথমেই সুধীন জিজ্ঞেস করল, রাঙাদি কেমন আছে?

ইলা জবাব না দিয়ে অন্ধকাবের মধ্যে দেশলাইকাঠি জ্বেলে হ্যারিকেন ধরাল। বস্তির একচিলতে ঘর ফাঁকা, জায়গা নেই। সুধীন প্রশ্ন করার আগে ইলা বলল, রাত দশটায় ভাত-ডাল-তরকারি খেয়ে রাঙাদি চলে গেছে। যাওয়ার আগে বলল, সারাদিন উপোস করে থাকার জন্য জ্বর এসে গিয়েছিল।

খবর শুনে আকাশ থেকে পড়ল সুধীন। তার মুখে কথা সরল না। ইলা বলল, হুঁশ ফিরতে গ্লুকোজের জল, গরম দুধ, তারপর এককাপ চা খেয়ে রাঙাদি বলল, খুব খিদে পেয়েছে। ভাত-ডাল, শিম, আলু, বড়ির তরকারি—যা ছিল দিলাম। গপগপ করে খেয়ে নিয়ে বলল, মুমূর্ষু রোগী রেখে এসেছি। আমি না গেলে সে হয়তো ঘরের ভেতর মরে পড়ে থাকবে। আমাকে যেতে হবে, এখনই।

এক মুহূর্ত থেমে ইলা বলল, রাঙাদিকে আটকাতে অনেক চেষ্টা করেছি। পারলাম না।

ইলার কথা মধ্যে সুধীন বলল, জ্বরে যার গা পুড়ে যাচ্ছে, চোখ খুলে রাখতে পারছে না, সে গেল কী করে?

ইলা বলল, ভাত খেয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকার পরে জ্বর ছেড়ে গিয়েছিল।

তুমি কীভাবে বুঝলে?

ওমা! দেখলাম, স্বাভাবিক হয়ে গেছে মুখ-চোখ, কপালে, গলায় হাত রেখে টের পেলাম, জ্বর নেই।

সুধীনের সামনে ভাতের থালা রেখে ইলা বলল, যাওয়ার আগে মুচকি হেসে রাঙাদি বলে গেল, বারাসতে গিয়ে একটা ঘটনাতে খুব ভয় পেয়েছিলাম রে ইলা! ভয়ে জ্বর এসে গিয়েছিল! এত ভয় পাওয়া উচিত হয়নি। আমাকে মানায় না।

হ্যারিকেন নেভানোর আগে তক্তপোশে শরীর এলিয়ে শুয়ে থাকা সুধীনকে ইলা বলল, যত রাত হোক, রাঙাদি শ্রীরামপুরে পৌঁছে যাবে।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সে ফের বলল, রাঙাদির সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার ভিড়ে যেতে ইচ্ছে করে।

ঠোঁটজোড়া অনেকটা জুড়ে, সরু করে সজোরে ফুঁ দিয়ে ইলা হ্যারিকেন নিভিয়ে দিল। অন্ধকার ঘরে, কেরোসিনের গন্ধমাখা খানিকটা বাতাস তার বুকে ঢুকে গেল। হাতপাখা চালিয়ে সুধীন ঘুমনোর চেষ্টা করছিল।

তেইশ

ভোররাতে সদর দরজার কড়া নাড়ার আওয়াজ যত জোরে কানে ঢোকার কথা, তার চেয়ে অনেক নিচু হয়ে, খুটখুট করে বাজতে প্রকাশের পাতলা ঘুম ছুটে গেল। প্রথম যে দুশ্চিন্তা মাথায় লাফিয়ে উঠল, তা হচ্ছে, পুলিস বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। তাদের এই গোপন ডেরার খবর তারা জেনে গেছে। ঘরের ভেতরে কম পাওয়ারের একটা ডুম জ্বলছে। রাতের প্রথম দিকে পায়ের যন্ত্রণায় জয়নুল ছটফট করলেও শেষরাতে শান্তভাবে সে ঘুমোচ্ছে। কযেকদিনের দাড়িগোঁফ ঢাকা জয়নুলের মুখ, আবছা দেখতে পেল প্রকাশ। সদর দরজা থেকে ভেসে আসা আওয়াজ তৃতীয়বার শুনে তার মনে হল, সন্তর্পণে কড়া-নাড়ার বদলে বন্ধ কাঠের কপাটে কেউ টোকা মারছে। ঘরে প্রমাণ 'সাইজ'-এর চেয়ে বড় 'ডাবল বেড' খাটে, জয়নুলের পাশে শোয়ার মত জায়গা থাকলেও ঘরের মেঝেতে শতরঞ্চি পেতে প্রকাশ ঘুমিয়েছিল। জয়নুলের পাশে, বিছানার ফাঁকা অংশের চাদরটা, রাতে

মানুষের ভার না সওয়ায় টানটান রয়েছে। আগের তিন রাত খাটে, জয়নুলের পাশে রাতে জয়া শুয়েছে। চাদরের ওপর লেগে থাকা জয়ার শরীরের দাগ সকালে ঘরে ঢুকে প্রকাশ দেখেছে। বিছানায় অন্য একজন পুরুষ, সে মারাত্মক জখম, প্রায় অকেজো হয়ে পড়ে থাকলেও তার পাশে শুয়ে জয়া ঘুমোতে পেরেছে কিনা, প্রকাশ জানতে চায়নি। জয়া তার বউ। তারই পরামর্শ মত জয়নুলের সঙ্গে এক বিছানায় জয়া রাত কাটিয়েছে, দেখে সে খুশি হয়েছিল। স্বামী যত অসুস্থ হোক, রাতে বিছানায়, তার পাশে শুয়ে স্ত্রী ঘুমোয়। এটাই স্বাভাবিক, দাম্পত্য সম্পর্কের সর্বজনবিদিত বিধি। সকালে আত্মীয়-পরিজনদের কেউ ঘরে ঢুকে বিছানায় তার শরীরের গভীর দাগ না দেখলে ধরে নেয়, বউটা গোলমেলে, স্বামীর পাশে শোয় না। নতুন এক অসুখী দম্পতির কাহিনী বাজারে চাউর হয়ে যায়। তেমন কিছু এখনও ঘটেনি। পরশু সকালে, বাড়িওলা নবেন্দু, ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দুর্ঘটনায় জখম, শয্যাশায়ী জয়ন্তর খবর নিতে এসে, বিছানার খালি জায়গাটা দেখে এক নজরে বুঝে গিয়েছিল, সেখানে রাতে জয়া ঘুমিয়েছে। নবেন্দুর বদলে শেষরাতে পুলিস এলেও দেখত, তখনই যে তরুণী বধূ ঘরের কপাট খুলে দিল, বিছানায় লেগে আছে তার শরীরের দাগ। ঘুমন্ত দম্পতিকে অসময়ে জাগানোর জন্যে তারা হয়তো ঈষৎ কুণ্ঠিত হয়ে চলে যেত। জয়া, জয়নুলের ছবি পুলিসের কাছে নেই। দুজনকে সম্ভবত পুলিস চেনে না। তাদের খাতায় জয়া, জয়নুলের বদলে যে নাম রয়েছে, তা-ও গত চার বছরে কয়েকবার পাল্টে গেছে। এই মুহূর্তে জয়নুলের নাম জয়ন্ত হলেও, জয়ার নাম বদলে গেছে। বাড়িওলা নবেন্দুর কাছে তারা ভিন্ন নামের ভাড়াটে।

সদর দরজায় আবার খুটখুট আওয়াজ শুনে প্রকাশের মাথায় অতর্কিতে আর এক চিন্তা, জাহাজের ভোঁ বাজার মত ধ্বনি তুলল। আসামী ধরতে এসে. পুলিস এত সন্তর্পণে, পাড়াপ্রতিবেশীকে না জাগিয়ে মৃদু শব্দ তুলে দরজায় টোকা দেয় না। বন্ধ দরজার একজোড়া লোহার কড়া সজোরে নেড়ে এলাকা সচকিত করে তোলে। সদরের কপাটে যে টোকা দিচ্ছে, সে পুলিস নয়। তাহলে কে? প্রশ্নটা মনে জাগতে সুপার্থর কবিতার দুটো পঙ্‌ক্তি, "তোমার শব্দের ভাষা, তোমার মুহূর্ত আর স্থির প্রাজ্ঞরেখা আমার সর্বস্বে স্থিত" প্রকাশের মনে পড়তে তার বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠল। সুপার্থ শহিদ হওয়ার পরে তার লেখা অসংখ্য কবিতার বান্ডিল খুলে জয়া এই কবিতাটা প্রকাশকে প্রথম পড়তে দেয়। কবিতাটা একাধিকবার পড়ে মুখস্থ হয়ে যেতে জয়াকে আবৃত্তি করে সে শুনিয়েছিল। জয়ার সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও সুপার্থ বেঁচে থাকতে তাকে চিনত প্রকাশ। সুপার্থর কাছে একাধিকবার গাংনেগড়ে সে দেখা করতে গেছে। গৌরহাটির শ্রমিক মহল্লায় তার ঘরে প্রায়ই রাত কাটাত সুপার্থ। তার কবিতার সঙ্গে সেই থেকে প্রকাশের পরিচয়, কবিতার প্রতি অনুরাগ। কবিতার লাইন দুটো মাথায় আসতে সদর দরজায় কে টোকা দিচ্ছে প্রকাশের বুঝতে অসুবিধে হল

না। বন্ধ দরজার সামনে জয়া দাঁড়িয়ে আছে। কলকাতা থেকে সে ফিরে এসেছে। শতরঞ্চির ওপর ধড়ফড় করে সে উঠে বসল। ঘুমন্ত জয়নুলের দিকে তাকিয়ে, সে যাতে জেগে না যায়, এমন ভঙ্গিতে, নিঃশব্দে, ঘরের দরজা খুলে, পা টিপে টিপে বন্ধ সদর দরজার পেছনে এসে ছিটকিনি, খিল পরপর খুলে, কপাটের ফাঁক দিয়ে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের তলানি আলোয় জয়াকে দেখে, দরজার পুরো একটা পাল্লা খুলে শান্ত গলায় বলল, এসো।

জয়া বাড়ির ভেতরে পা দিতে, তাকে ঘরে পাঠিয়ে সদর দরজা বন্ধ করে, সেখানে প্রকাশের ফিরতে কয়েক মিনিট লাগল। ঘরে ঢুকে প্রকাশ দেখল জয়নুলের খাটে, একপাশে জয়া শুয়ে পড়েছে। সে যে রীতিমতো অসুস্থ, তার মুখ দেখে প্রকাশ বুঝতে পারল। খাটের পাশে এসে জয়ার কপালে হাত রেখে টের পেল, গা বেশ গরম। জ্বর একশোর ওপরে। একশো দুই হতে পারে। শ্যামবাজার থেকে জ্বর নিয়ে এই ভোররাতে জয়া শ্রীরামপুর পৌঁছোল কীভাবে? কপালে রাখা প্রকাশের হাতের ওপর জয়া তার ডান হাতের পাতা রাখল। জ্বরে অথবা ঘরে ফেরার স্বস্তিতে তিরতির করে কাঁপছে জয়ার হাতের পাতা। কপালের মত গরম না হলেও জয়ার হাতের পাতায় তাপ রয়েছে। জয়ার কপালে হাত রেখে খাটের ধার ঘেঁষে প্রকাশ দাঁড়িয়ে থাকল। মিনিটখানেকের মধ্যে তার হাতের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে জল খেতে চাইল জয়া। আধভর্তি জলের গ্লাস এনে, তার হাতে গ্লাস না দিয়ে, প্রকাশ হাঁ করতে বলল জয়াকে। জয়ার মুখে ঢোঁকে ঢোঁকে অল্প করে জল ঢেলে দিতে থাকল। আধ গ্লাস জলের কয়েক চুমুক বাকি থাকতে জয়া মুখ বন্ধ করল! কিছুটা সাব্যস্ত হল সে। বুজে থাকা চোখ দুটো সে খুলতে প্রকাশ জিজ্ঞেস করল, শরীর কেমন? ফিরলে কীভাবে?

মুখ খোলার আগে ঘুমন্ত জয়নুলের দিকে তাকিয়ে বিছানা থেকে নেমে মেঝেতে পাতা প্রকাশের শতরঞ্চির ওপর, তার বালিশে মাথা রেখে জয়া শুয়ে পড়ল। তার পাশে প্রকাশ এসে বসতে বালিশের আধখানা প্রকাশের দিকে এগিয়ে বাকিটায় মাথা রেখে শতরঞ্চির একপাশ জয়া খালি করে দিল। জয়ার পাশে শরীর এলিয়ে দিয়ে, পুরো না শুয়ে প্রকাশ তাকিয়ে থাকল জয়ার দিকে। জয়ার বিবরণ শোনার সঙ্গে তার মুখটাও প্রকাশ দেখতে চায়। আনোয়ারকে আনতে গিয়ে বড়রকম বেকায়দায় না পড়ে গেলে পরিত্রাহি জ্বর গায়ে সে একা কলকাতায় ফিরত না। সুধীনের ঘরে ঢুকে জ্ঞান হারাত না। সারাদিনের ঘটনা বলার বদলে জয়া শোনাচ্ছিল, রাত দশটায় সুধীনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে উত্তরপাড়া আর হিন্দমোটর স্টেশনের মাঝখানে ট্রেনের তার ছিঁড়ে যাওয়ায় তার আটকে পড়ার বৃত্তান্ত। তিন ঘণ্টার বেশি দুই স্টেশনের মাঝখানে, অন্ধকারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল। অধৈর্য যাত্রীরা ঝাঁক বেঁধে কিছু সময় অন্তর নেমে যাওয়ায় কামরা প্রায় খালি হয়ে গিয়েছিল। ছেঁড়া তার মেরামত করে ব্যান্ডেল লোকাল যখন ছাড়ল,

বেশিরভাগ কামরা প্রায় খালি হয়ে গেছে। শ্রীরামপুর স্টেশনের জনমানুষহীন প্ল্যাটফর্মে, রাতের শেষ প্রহরে জয়াকে নিয়ে বেশি হলে, যে চার-পাঁচজন যাত্রী নামল, প্ল্যাটফর্মের বাইরে গিয়ে চোখের নিমেষে তারা কোথায় অদৃশ্য হল, জয়া হদিস পেল না। রাস্তায় সাইকেল রিকশ দূরের কথা, একটা মানুষও নেই। কিছু শালপাতার ঠোঙা হাওয়ায় ওড়াউড়ি করছে, সন্ধিগ্ধভাবে রাস্তার ধুলো শুঁকে একটা বৃত্তের মধ্যে ঘুরছে দুটো পাঁজরা বেরোনো কুকুর।

প্রকাশ দেখছিল, কথা বলতে জয়ার হাঁফ ধরছে। ঘুমে বুজে আসছে দু-চোখ। জয়াকে না থামিয়ে অর্ধেক বালিশে মাথা রেখে, আধশোয়া প্রকাশ লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। জয়ার এখন ঘুম দরকার, গভীর ঘুম, নিশ্চিন্ত বিশ্রাম। অসুস্থ হয়ে জয়া শুয়ে পড়লে, জয়নুলের ঠিকমতো পরিচর্যা হবে না। যথার্থ 'নার্সিং' জানে জয়া। নার্সিং শেখার সার্টিফিকেট তার না থাকলেও হাসপাতালে শুশ্রূষাবিদ্যার পাঠ্যক্রমে কয়েক মাস শিক্ষানবিশি করেছে। পায়ের ক্ষত থেকে জয়নুলের 'গ্যাংগ্রিন' হওয়া ঠেকাতে যে সেবাশুশ্রূষা দরকার, তা জয়াই করতে পারে। তার মুখের ওপর চোখ রেখে তাকে কথা বলতে একরকম বাধ্য করার জন্য প্রকাশ সঙ্কোচ বোধ করল। সে আসলে শুনতে চাইছিল আনোয়ারের খবর, বারাসতে জয়া কীভাবে কাটাল সারাদিন, এই সব। জয়াকে আর কথা বলাতে চায় না সে। জয়া এখন ঘুমোক। সে যা ভেবেছিল, তা-ই ঘটল। জয়ার মুখের ওপর নজর সরিয়ে সে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ার এক মিনিটের মধ্যে জয়া ঘুমিয়ে পড়ল। জয়াকে বারাসতে পাঠানোর জন্য প্রকাশের আপসোস হচ্ছিল। আনোয়ারকে আনতে জয়া বলা যায়, জোর করে, নিজে যেতে চেয়েছিল। আনোয়ারকে নিয়ে অবলীলায় দুপুরের মধ্যে বাসায় ফিরবে, এমন হিসেব ছিল তার। বিকেলের গোড়াতে গোপন ডেরায় তখন ডাক্তারের আসা ঠিক ছিল। সময়ের বদল ঘটেছিল পরে, জয়া তখন বারাসাতের বাসে। সে ধরে নিয়েছিল, বিকেলে জয়নুলের পা থেকে ডাক্তার গুলি বার করার সময়ে তাকে অতি অবশ্য থাকতে হবে। গুলি বার করার আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে গ্যাংগ্রিনের লক্ষণ, বিশেষ করে 'রিগার মর্টিস', মরণকাঁপুনি ধরল কি না, নজর রাখতে হয়। তেমন কিছু ঘটলে জয়নুলকে বাঁচানো যাবে না। মরণকাঁপুনি থেকে তাকে বাঁচাতে হলে হাসপাতালে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। গুলিবিদ্ধ রোগী হাসপাতালে ভর্তি হলে, আইন অনুযায়ী খবরটা থানায় নথিভুক্ত করাবে হাসপাতাল। জয়নুলের পরিচয় তখনই জানাজানি হয়ে যাবে। জয়া ধরে নিয়েছিল, ডাক্তার আসার আগে ফিরে তার সঙ্গে কথা বলে, যাবতীয় নিয়মবিধি জেনে জয়নুলের সেবা করলে তাকে হাসপাতালে পাঠানোর দরকার হবে না।

পরশু বিকেলে প্রকাশের সঙ্গে এরকম খুঁটিনাটি নানা বিষয়ে কথা সেরে রেখেছিল জয়া। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত জয়নুলের ওষুখবিষুধের যে ব্যবস্থাপত্র রয়েছে, প্রকাশকে বুঝিয়ে দিয়েছিল। সন্ধেব বদলে সকালে এসে গিয়েছিল ডাক্তার।

প্রকাশের বস্তু মানুষ সে। জলনুলের চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজ এক ঘন্টার মধ্যে সেরে সে চলে গেলেও দুপুর পেরিয়ে বিকেল, এমনকী সন্ধের মুখে জয়া না ফিরতে প্রকাশ উদ্বিগ্ন হতে শুরু করেছিল। উদ্বেগেরই সঙ্গে ভয় ঢুকছিল মনে। ঈষৎ বিপন্ন বোধ করছিল। জয়নুলের পা থেকে গুলি বার করার পরের ধাপে করণীয় কাজগুলো নিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলার যে ছক জয়া করেছিল, তা কতটা নির্ভুলভাবে সে করতে পারবে, ভেবে প্রকাশ দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিল। সংগঠনের আর কোনও মেয়েকে এখানে জয়নুলের বউ সাজিয়ে আনার উপায় নেই। জয়াকে এই ক'দিনে ভালরকম চিনে গেছে নবেন্দু। বউ হিসেবে জয়া যে প্রকৃত সতীসাধ্বী, তার পুণ্যের জোরে স্বামী জয়ন্ত রায় বেঁচে যাবে, বেশ কয়েকবার কথাটা প্রকাশকে নবেন্দু শুনিয়েছে। গুরুতর জখম জয়নুলের পাশে বউ হিসেবে জয়ার বিকল্প, জয়া ছাড়া কেউ হতে পারে না। অফিস থেকে আগের সন্ধেতে ফেরার সময়ে নিয়মমফিক চৌকাঠের বাইরে থেকে রোগীর খবর নিয়ে ঘরে জয়াকে না দেখে নবেন্দু প্রশ্ন করেনি। প্রকাশই আগ বাড়িয়ে জানিয়েছিল বাজার করতে গেছে জয়া।

জয়া সম্পর্কে দু-চারটে প্রশংসার কথা বলে নবেন্দু দোতলায় উঠে যেতে তখনকার মত প্রকাশ স্বস্তি পেলেও পরের দিক সকালে জয়া ঘরে না থাকার বিশ্বাসযোগ্য কারণ দর্শাতে ঘাম ছুটে যাবে, টের পেয়েছিল। জয়া কোথায়, তখনও জানতে চাইবে না নবেন্দু। তাকে জয়ার গতিবিধির খোঁজ প্রকাশকে জানাতেই হবে, এমন কথা নেই। প্রকৃত সজ্জন বলতে যা বোঝায় নবেন্দু তাই। সন্দেহ বাতিকে সে ভোগে না। প্রকাশকে সে পছন্দ করে। প্রকাশের মতবাদ, চালচলনে গভীর আস্থা আছে তার। নবেন্দুকে দিয়ে ক্ষতির কোনও সম্ভাবনা নেই জেনেও গোপনীয়তা মেনে চলার সুনির্দিষ্ট নিয়মগুলো প্রকাশ শুধু মেনে চলছে। বন্ধু, দরদি, সহযোগী, সে যাই-ই হোক, কারও মনে প্রশ্নের বুদ্‌বু ওঠার সুযোগ দেওয়া উচিত নয়।

আধখোলা জানলার বাইরে তাকিয়ে প্রকাশ দেখল আকাশে আলো ফুটছে। ঘুমে দু-চোখ বুজে আসতে শতরঞ্চি ছেড়ে নিঃশব্দে প্রকাসে উঠে পড়ল। ঘুমন্ত জয়াকে জাগাতে চায় না। সকাল ছটায় জয়নুলকে একটা জীবনদায়ী ক্যাপসুল, খাওয়াতে হবে। আটটা থেকে নটার মধ্যে রয়েছে তিন দফা ওষুধ খাওয়ানোর নির্দেশ। জয়নুলের পা থেকে কাল গুলি বার করে সেলাই-ফোঁড়াইয়ের শেষে ডাক্তার যে ব্যবস্থাপত্র দিয়ে গেছে, সেই অনুযায়ী যতটা পারা যায় নিখুঁতভাবে প্রকাশ দায়িত্ব পালন করে চলেছে। জয়াকে সব কিছু বুঝিয়ে তার হাতে ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র ধরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত সে সরে যেতে পারে না, সরে যাওয়ার উপায় নেই। তার ওপর জয়ার অটুট আস্থা না থাকলে জয়নুলের ভার তাকে দিয়ে যেত না। তাকে বিয়ে করার আগে এই নির্ভরতার কথা জয়া বলেছিল। নির্ভরতা মানে স্ত্রী আর স্বামীর পরস্পরের ওপর আস্থা, গভীর বিশ্বাস, কেউ কারও বোঝা নয়।

ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে কলঘরে ঢুকে মুখ-চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে, মাথায় কয়েক বালতি জল ঢেলে চান সেরে নিল প্রকাশ। সারাদিনের মত নিজেকে সে তৈরি করে নিতে চায়। জয়াকে তাড়াতাড়ি চাঙ্গা করে তুলতে হলে কয়েকদিন বিশ্রাম দেওয়া দরকার, সে বুঝে গেছে। বিয়ে করা বউয়ের সঙ্গে এই কঠিন সময়ে দাম্পত্যজীবন কাটানোর সুযোগ না থাকলেও ঝড়ের মধ্যে পথ হাঁটা থেকে কম শিক্ষা প্রকাশের হয়নি। জয়ার মনমেজাজ যেমন সে আঁচ করতে পারে, তেমনি জানে তার শরীরের ধাত। ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়ার মেয়ে সে নয়। বারাসতে বড়মাপের ফাঁড়া কাটিয়ে ফিরতে হয়েছে তাকে। জয়া একটু চাঙ্গা হলে নিজেই পুরো বৃত্তান্ত শোনাবে। আনোয়ারের কী ঘটল তা-ও জানা দরকার। গরিব চাষি সে। তার কোনও বিপদ ঘটলে দলের কিছু কর্মী জয়াকে দায়ী করতে পারো। সুপার্থ মারা যাওয়ার পরে শহিদের বউ, জয়াকে ব্যবহার করে, সহানুভূতির হাওয়া তুলে যারা দল বাড়াতে চেয়েছিল, জয়ার ওপর তাদের রাগ আছে। জয়া সম্পর্কে তাদের বিস্তর অভিযোগ। জয়ার শ্রেণীচেতনার গভীরতা, শ্রমিক, কৃষকের ওপর কতটা আস্থা, এ নিয়ে তারা সন্দিহান। প্রকাশের সঙ্গে জয়া নিজেকে জড়িয়ে ফেলায় আড়ালে তারা অকথা, কুকথা বলে বেড়িয়েছে। তখনও বলছিল। কলকাতার ছেলে প্রকাশকেও রেয়াত করেনি, জয়ার সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতাকে 'মেয়েবাজি' বলতে তাদের মুখে আটকায়নি। জয়া সাহসী মেয়ে, তাদের একজনকে দলীয় এক সভায়, সকলের সামনে বলেছিল, বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার কারণ এতদিনে বুঝতে পারলাম। সওয়া-শো বছর আগে, যে রক্ষণশীল, গোঁড়া হিন্দুরা বিধবাবিবাহকে বিরোধিতা করেছিল, তাদের ছানাপোনারা যে এখনও বেঁচে আছে, আমাদের দলের মধ্যেও ঢুকে পড়েছে, চোখকান খোলা রাখলে দেখা যায়।

জয়ার কথাটা যাদের গায়ে লেগেছিল, তারা চটে লাল হলে গেলেও বাকিরা চুপ করে ছিল। যারা চটেছিল, তারা মুখ খেলেনি। প্রকাশ নিজে সেই বৈঠকে না থাকলেও ঘটনাটা তার কানে পৌঁছে গিয়েছিল। দলের মধ্যে যাকে 'অন্তরের নেতা' বলা হয়, জয়ার মন্তব্য শুনে গম্ভীর হয়েছিল তার মুখ।

চান সেরে প্রকাশ ঘরে ঢুকে দেখল, জয়া অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ঘুমের মধ্যে জয়নুল যেভাবে শরীর মোচড়াচ্ছে, যে কোনও মুহূর্তে জেগে উঠতে পারে। জয়নুলের পায়ের যন্ত্রণা আগের মতো থাকলে ঘুম ভাঙলে শুরুতে ডুকরে উঠে, কিছুক্ষণ পরে থেমে যাবে। সে জানে, গোপন আস্তানায় প্রাণান্ত কষ্টেও মুখ বুজে থাকতে হয়। জয়নুল জেগে উঠে আজও গোঙাতে শুরু করলে তাকে থামাতে হবে। জয়াকে আরও কয়েকঘণ্টা ঘুমোতে দেওয়ার দরকার। অন্ধকার থাকতে চান করে নিয়ে প্রকাশের বেশ তরতাজা লাগল নিজেকে। আকাশে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ভোরের আলো। রাস্তার চা-দোকান এই সময় খোলে। দোকানের সামনে শুরু থেকে ক্রেতা এসে জমতে থাকে। বেশিরভাগ কাছাকাছি কলকারখানার মজুর।

রাতের খেপে কাজ করে যারা ঘরে ফিরছে, আর সকালের খেপে যারা কলকারখানায় ঢুকবে, তারা চা-দোকানের ভোরের খদ্দের। নবেন্দুর বাড়িতে জয়নুলকে আনার পরে দু-বার সাতসকালে, এখান থেকে স্টিলের গ্লাস ভরে প্রকাশ চা নিয়ে গিয়েছিল। জয়ার সঙ্গে ভাগ করে খেয়েছে। কোন্নগর আর শ্রীরামপুরের মাঝখানে শ্রীরামপুরের বাসা থেকে হাঁটাপথে দশ মিনিট দূরত্বে এক ডেরায় দলের আরও তিন সহকর্মীর সঙ্গে প্রকাশ থাকে। সেটা এক ঘরের গোপন কমিউন। চারজনই বেনামদার ভাড়াটে, বাড়িওলা জানে তারা চটকলের কর্মী।

চা খেতে যাওয়ার চিন্তা আপাতত সরিয়ে রেখে ঘুমিয়ে থাকা জয়ার পাশে শতরঞ্চিতে সন্তর্পণে প্রকাশ বসল। জয়া জাগলে চা আনতে বাড়ি থেকে বেরোবে। জয়নুল চা খেতে চাইলে, স্টিলের গ্লাসের বদলে কেটলি নিয়ে চা-দোকানে যাবে। প্রকাশ জানে, তার সঙ্গে জয়ার নতুন করে সম্পর্ক গড়ে উঠলেও জয়াকে আকীর্ণ করে রয়েছে সুপার্থর প্রতিভা, বিদ্রোহ, শস্যের ভেতরের রোদ। শতরঞ্চিতে ঘুমন্ত জয়ার পাশে বসে দু'বছর আগে সুপার্থকে ঘিরে গড়ে ওঠা নীলিমা, কুজ্ঝটিকার বাতাবরণ, তার দুর্ধর্ষ বিদ্রোহ, কবিতার স্বতোৎসারিত অনুভূতিমালা, জয়াকে কেন টেনেছিল, প্রকাশের বুঝতে অসুবিধে হয়নি। সুপার্থর কবিতা পড়লেও তার সঙ্গে তখনও প্রকাশের পরিচয় ঘটেনি। জয়াকে শুধু নামে চিনত বললে সত্যের অপলাপ হয়, তার ব্যক্তিপরিচয় ছাপিয়ে উঠেছিল, সুপার্থর সঙ্গে তার সম্পর্ক, সে শুধু সুপার্থর সহধর্মিণী নয়, শহর ছেড়ে পাশাপাশি দুটো গাঁয়ে গরিব কৃষকদের নিয়ে সুপার্থর কাঁধে কাধ মিলিয়ে আত্মগোপন করে থাকা সমান বীর সংগঠক। সুপার্থর মতো বিক্রমে জয়াও সংগঠন গড়ছিল। মানুষের অধিকার, সন্তানসন্ততি নিয়ে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, হাসি-আহ্লাদে বেঁচে থাকার অধিকার, দেশকে নতুন করে গড়ে তোলার চিরায়ত স্বপ্ন, আর সেই স্বপ্নকে বাস্তবে ফলিয়ে তোলার সঙ্কল্প নির্মাণে তাদের মেতে তোলার বিবরণ, প্রকাশের কানে এসেছিল। সত্য তার কল্পনা মেশানো রূপকথার মত সেই সেই বিবরণ! মাস কয়েক পরে, প্রথমে সুপার্থ, কিছুদিনের মধ্যে জয়ার সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। শ্রমজীবীদের সংগঠিত করতে পুরো সময়ের কর্মী হিসেবে শহর ছেড়ে যারা শিল্পাঞ্চলে ডেরা করত, তাদের চেয়ে বেশি বীর উঁচুদরের বিপ্লবীর মর্যাদা পেত গাঁয়ে গরিব কৃষকের আশ্রয়ে না খেয়ে, আধপেটা খেয়ে, মাটি কামড়ে পড়ে থেকে, যারা কৃষিবিপ্লবের মূল কর্মসূচি গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরতে যেত, তারা। দলের কর্মীদের কাছে রূপকথার নায়ক-নায়িকা হয়ে উঠেছিল জয়া-সুপার্থ। তাদের নিয়ে প্রশ্ন আর গল্পের শেষ ছিল না। দুটোই আকারে বাড়ছিল। প্রথম যে প্রশ্ন, তা ছিল, পুলিস হেফাজত থেকে পালিয়ে, সুপার্থ ফের তার পুরনো এলাকা, গাংনেগড়ে গিয়ে এলাকার এক মাতব্বর জোতদার, মুরারি ঘোষকে অচামকা কেন খতম করতে গেল? দ্বিতীয় প্রশ্নটা ছিল, জেলের ভেতরে পাগলাঘণ্টি বাজিয়ে রক্ষীবাহিনী কেন খুন করল সুপার্থকে? জেল ভেঙে

পালানোর আগে সুপার্থ কি মজবুত পরিকল্পনা করেনি? সাহসী, স্বপ্নদ্রষ্টা মানুষটা কেন এভাবে শেষ হয়ে গেল? সুপার্থ শহিদ হওয়ার পরে, ঘটনার দ্বিতীয় মাসে জয়ার প্রশ্ন দুটো জলের আর্তির মত প্রকাশের কানে বেজেছিল। কলকাতার বাড়ি ছেড়ে চিরকালের মতো চলে এসে প্রকাশ তখন এলাকার নেতৃত্বে পৌঁছে গেছে। শিল্পাঞ্চল থেকে গাংনেগড়ের মত অজ-পাড়াগাঁয়ে মুক্তির দশক গড়ার নড়বড়ে, প্রায় ভেঙে পড়া সংগঠনকে মেরামত করে খাড়া রাখা বড়রকম দায়িত্ব চেপেছিল প্রকাশের ওপর। মুষড়ে পড়া জয়াকে আনুষ্ঠানিক সান্ত্বনার কথা না শুনিয়ে তার সঙ্গে দেখা হলে, গাংনেগড় আর জেল থেকে জীবিত এবং মৃত সুপার্থ সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য যত তথ্য জোগাড় হত, জানিয়ে দিত। হুগলি জেলে গণেশ বাউরির সঙ্গে পাশাপাশি সেলে যে নরেন দলুই থাকত, তাকে হাঁসগড়া মাঠে মুরারিকে খতম করার যে বিবরণ গণেশ শুনিয়েছিল, জামিনে নরেন ছাড়া পেয়ে তা শোনায় প্রকাশকে। গাংনেগড়ের আশপাশের গ্রামগুলো থেকে নিজের সংগ্রহ করা তথ্যের সঙ্গে নরেন দলুইয়ের বিবরণ মিলিয়ে পুরো ঘটনার গ্রহণযোগ্য একটা কাঠামো তৈরি করতে পেরেছিল প্রকাশ। কেতাবি সামন্ততন্ত্রের নিষ্ঠুর শোষণ আর অত্যাচার কত ভয়ানক হতে পারে, গাংনেগড়,আর সংলগ্ন গ্রামগুলোর গরিব চাষিরা রোজ হাড়ে হাড়ে বুঝত। জোতদার, জমিদার, বিত্তবান মানুষের লোহার দুর্গের মতো কঠিন এক জোট ছিল অঞ্চল জুড়ে। কোথাও চুরি, ডাকাতি হলে আশপাশের গ্রাম থেকে যাকে খুশি ধরে নিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে বেদম পেটাত। পিটুনির চোটে সে বেঁহুশ হলেও ছাড়া পেত না। সারারাত গাছে বাঁধা আধমরা স্বামীকে আলো ফোটার আগে অভিযুক্তের বউ এসে চুপি চুপি বাঁধন খুলে নিয়ে গেছে, এ ঘটনাও ঘটেছে। ছাগলগাছিয়ার কানু বাউরি, সেখানের ভদ্রবাবুদেব অত্যাচারে মারা গেল। পুলিসে খবর দিয়ে কোনো বিহিত হয়নি। সুপার্থর দাদা কমল, আসামে চাকরি করতে গিয়ে মাথায় লোহার বিমের ঘা লেগে মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে এলেও যে পাগল হয়ে গিয়েছিল, কম বয়সে সুস্থ অবস্থায় সে ছিল গণেশ বাউরির বন্ধু। সুপার্থর পরিবারের সবাইকে চিনত। গাংনেগড়ের নতুন এক জনসমাজ গড়তে সুপার্থ হাজির হতে তার পাশে দাঁড়ায় গণেশ। নতুনগ্রামের জোতদার মুরারিকে খতম করতে সবচেয়ে বেশি বার চাঁচকাটারির কোপ মেরেছিল গণেশ, তারপর সুপার্থ, সব শেষে সত্যমাস্টার, তবে আদৌ সে মেরেছিল কিনা, জানা যায়নি। খুব বেশি একবার আঘাত করেছিল সে। সুপার্থর সঙ্গে সেই দুপুরে গ্রামে সংগঠন গড়তে সত্যমাস্টার প্রথম ঢুকেছিল, ঘটনার ঘূর্ণিতে সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। বিন্দুভাঙার পরিকল্পনা আগে থেকে করা ছিল না। তবে এটাও ঠিক যে ঘটনাচক্রে মুরারিকে ফাঁকা মাঠের মধ্যে তারা দেখেছিল, এমন নয়। বিশেষ করে গণেশ জানত তার গতিবিধি। বড় বেশি ফবসা ছিল গণেশ বাউরির গায়ের রঙ, টকটকে ফরসা বলতে যা বোঝায়, তাই। বাউরি পাড়ায় এত ফরসা মানুষ

একশো বছরে কেউ দেখেনি। মুরারি ঘোষের মতো ফরসা ছিল সে। গায়ের রঙের সঙ্গে তার চোখ, নাকে ছিল আভিজাত্যের চিহ্ন। আদালতে বিচারের সময়ে উকিলবাবুরা অবাক হয়ে তাকে দেখত। নিজেদের মধ্যে কথা বলত চাপা গলায়। এজলাসে দাঁড়িয়ে গণেশের মুখে সামান্য অনুতাপের চিহ্ন দেখা যেত না। আদালতে আইনজীবী, বিচারকদের কাজে গণেশ, সত্যমাস্টার সহযোগিতা করলেও সুপার্থ পাত্তা দিত না তাদের, গণসঙ্গীত গাইত, বিচারবিভাগ, প্রশাসন সম্পর্কে তার ছিল থোড়াই কেয়ার ভাব। খতমের ঘটনার পরে গাঁয়ের মানুষ তাদের ধরে পুলিসের হাতে তুলে দেবে, সুপার্থ ভাবেনি। সে ঘটনায় বড় ধাক্কা খেলেও ভেঙে পড়েনি। খতমের পরের মুহূর্তে স্লোগান দিতে দিতে মাঠের মধ্যে দিয়ে বেদেডাঙা গ্রাম পর্যন্ত দুই কমরেডকে নিয়ে পৌঁছে যেতে চেয়েছিল গণেশ। বেদেডাঙায় পৌঁছে গেলে পুলিসের হাতে ধরা তারা পড়ত না। সুপার্থ, সত্যমাস্টারকে বেদেডাঙায় পা রাখার আগে হাঁকডাক করে স্লোগান দিতে বারণ করেছিল গণেশ। তার কথা দুজনের কানে ঢোকেনি। উত্তেজনায় তারা বোধহয় কালা হয়ে গিয়েছিল।

বেদেডাঙার সীমানা পুলিস ঘিরে ফেলছে দেখে গণেশ চলে যায় ডেমরার দিকে, প্রকৃতির জোরালো ডাক অগ্রাহ্য করতে না পেরে শিবানীপুর লকগেটের কাছে সত্যমাস্টারকে রেখে সুপার্থ চলে যায় ঝোপের আড়ালে। কিছুক্ষণের মধ্যে তিন জায়গা থেকে ধরা পড়ে গিয়েছিল তিনজন। খবরটা জানাজানি হতে সময় লেগেছিল। সুপার্থকে, গণেশ বাউরি সত্যমাস্টাররের সঙ্গে অ্যারেস্ট করে পুলিস নিয়ে গেছে, পাশের গ্রাম, ডেমরায়, কানাই মুর্মুর বাড়িতে জয়ার কাছে পৌঁছেছিল ঘটনার আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে

জয়নুল জেগে গেলেও সকাল থেকে পায়ের যন্ত্রণা ঠোঁট সে টিপে গিলে নিচ্ছে। সকাল ছ'টায় ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র মেনে তাকে ওষুধ দিয়ে জয়া মেঝেতে শতরঞ্চি পেতে ঘুমিয়ে রয়েছে প্রকাশ জানাল। ফিসফিস করে জয়নুল জিজ্ঞেস করল, জয়ার শরীর ঠিক আছে তো?

জ্বর হয়েছে।

ভারিরকম?

না।

যন্ত্রণায় কুঁকড়ে থাকা জয়নুলকে আশ্বস্ত করতে মন রাখা কিছু কথা শোনাল প্রকাশ। শোওয়ার ঘরের লাগোয়া একচিলতে বারান্দার অর্ধেক ঘিরে রান্নাঘর। ঘর ভাড়া দেওয়ার জন্যে আগে থেকে নবেন্দু এ ব্যবস্থা করে রেখেছে। স্বামী, স্ত্রী, একটা বাচ্চা, ছোট পরিবার এখানে থাকতে পারে। ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা থেকে কয়েক হাত দূরে, বাঁপাশে কলঘর। প্রকাশ ভাড়া নেওয়ার আগে এই ঘরে যে চার ছাত্র থাকত, তারাও রান্নাঘর ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছে। বয়স্কা এক রাঁধুনি সকালে এসে তাদের দু'বেলার ভাত, তরকারি রেঁধে দিতে যেত। কলেজের

পড়া শেষ করে ঘর ছেড়ে বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে প্রথমে দুজন চলে যেতে, যে দুজন রইল, তারা হোটেলে খাওয়া শুরু করল। চাকরির খোঁজে থেকে যাওয়া দুজন ছাত্রের রাঁধুনি রেখে সংসার চালানোর সামর্থ্য ছিল না। দ্বিতীয় মাস থেকে তাদের বাড়ি ভাড়া বাকি পড়তে থাকল। ভাড়ার জন্যে তাগাদা দেওয়ার মানুষ, নবেন্দু নয়। সম্ভবত তার বউ, তাদের সামনে একবার ভাড়ার কতাটা পাড়তে, চতুর্থ মাসের শুরুতে কাউকে না বলে, শেষরাতে দুই তরুণ ভাড়াটে ঘর ছেড়ে নিঃশব্দে চম্পট দিল। পুরনো কিছু বই, স্টোভ, হাঁড়ি, কড়া, কেটলি, গ্লাস এরকম কয়েকটা বাসন ফেলে গিয়েছিল। ঘর ভাড়া নেওয়ার পরে, রান্নাঘরে সেই বাসনগুলো দেখে, প্রকাশ একটু ইতস্তত করে সেগুলো ব্যবহারযোগ্য কিনা, জানতে চাইলে, নবেন্দু শুনিয়েছিল আগের ভাড়াটের ঘর খালি করে দেওয়ার ইতিহাস। হাসিমুখে ঘটনাটা নবেন্দু বলতে প্রকাশও একচোট হেসেছিল। জয়নুলকে এই ঘরে এনে তোলার পরে ডাল-ভাত তরকারি রান্না করতে বাসনের অভাব জয়ার হয়নি। খাওয়ার জন্যে স্টিলের থালা পর্যন্ত ফোকটে পেয়ে গিয়ে ঘর ছেড়ে যাওয়া আগের চার বাসিন্দাকে মনে মনে 'লাল সেলাম' জানিয়েছিল জয়া। লাল সেলাম ঠিক কতটা লালাভ, পরিমাপ করতে না পারলেও ছোট ভাইয়ের মত চার নিরীহ অবৈষয়িক ছাত্রের মুখ কল্পনা করে স্নেহে বিগলিত হয়েছিল তার মন। প্রকাশকে সে বলেছিল, দুশো টাকা ভাড়ার বোঝা এড়াতে চারশো টাকার জিনিসপত্র ছাত্ররাই অবহেলায় ছেড়ে যেতে পারে।

চব্বিশ

গাংনেগড়ে হাঁসগড়ার মাঠ থেকে সুপার্থ ধরা পড়ার পর থেকে, তার হাজতবাস, জেলজীবন, আইন-আদালতকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়ার মনোভাব, জেল ভেঙে পালানোর ছক তৈরি, পরিশেষে তার মৃত্যু সম্পর্কে প্রকাশের সংগৃহীত সব তথ্য তার মুখ থেকে দফায় দফায় জয়া চুপচাপ শুনলেও, সুপার্থর খবর সে যে আরও বেশি রাখে, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ার পরে প্রকাশ জেনেছিল। জেল থেকে সুপার্থ নিয়মিত যত চিঠি, ছোট, বড় টুকরো, কুঁচো কাগজ, এমনকি ক্যালেন্ডারের তারিখ ছাপা কাগজের উল্টোপিঠে লিখেছিল, হাঁসগড়ার মাঠে মুরারি ঘোষকে খতমের ঘটনা থেকে, আদালতে তাদের যাবজ্জীবন সাজা হওয়ার রায় বেরোনো পর্যন্ত, খুঁটিনাটি সমেত হরেক বৃত্তান্ত (চিঠি লেখার কাগজের 'সাইজ'

অনুযায়ী) জয়াকে জানাত। সুপার্থর চিঠির গোছাতে নথিবদ্ধ তার হাজতবাসের রোমহর্ষক বিবরণের মুখবন্ধ ছিল এরকম, "মুক্তির প্রশ্নে দুটি সম্ভাবনা, এক, কৃষক শ্রমিক এসে আমাদের মুক্ত করবে অথবা ভারত মুক্ত হওয়ার ফলে কারাগার থেকে আমরা বেরিয়ে আসব, এই রাজনৈতিক বীক্ষায় অবিশ্বাস কোরো না।" ঠিক এই ভাষাতে চিঠি লিখে সুপার্থ, তার বাবা, তেজেশ সরকারের হাতে জয়াকে পাঠিয়েছিল। একের পর এক ব্যর্থতায় দল তখন ছিন্নভিন্ন হতে শুরু করেছে, মহান, গোষ্ঠী-কোঁদল, তাদের রাজনৈতিক বিতণ্ডা থেকে উচ্ছ্রিত থুতু থেকে কাদাখোঁচা নেতা, অন্তরের নেতা, শ্রদ্ধেয় নেতা আরও কতরকম নেতা যে গজিয়ে উঠছিল, হিসেব নেই। সেই সঙ্গে বাড়ছিল অবিশ্বাস, সন্দেহ, দলাদলি, আত্মঘাতী, খুনোখুনিতে জড়িয়ে পড়ে পৃথিবী থেকে পাশের মানুষটাকে সরিয়ে দিতে কোনও পক্ষের হাত কাঁপছিল না। সময়টা ছিল ইতিহাসের অপঘাত পর্ব। বারবার এই পর্ব ইতিহাসে ফিরে আসে। ছিন্নমস্তা সময়কে বুড়োরা গাল দেয়, অল্পবয়সীরা বুড়োদের দিকে আঙুল তুলে বলে, মার শালাকে। বুড়োরা জানে না যে, সময় তাদের খেয়ে ছিবড়ে করে দেওয়ার কারণে পরের প্রজন্মের দিকে তাকাতে তাদের যত ভয়, সময়ের স্থিরতা দেখে কমবয়সীরা তার হাজার গুণ বেশি ক্রুদ্ধ। তারা টের পায় না, সময় খেতে শুরু করেছে তাদের। তারুণ্যের গুমোর ছুটে যেতে দীর্ঘ সময় লাগবে না। এত ভাবার সময় তরুণদের তখন ছিল না। ভাবানোর মত স্বচ্ছদৃষ্টির মানুষ যারা ছিল, তারা দূরে সরে গিয়েছিল, হঠাৎ অসম্ভব ভদ্রলোক সেজে, চুপ করে ছিল, বেড়াব ওপরে বসে, দু-পাশে আগুন জ্বলতে দেখে, কোন পাশে আগুনের কাছাকাছি আগুন নেভানোর সরঞ্জাম আছে, যখন হদিস করে নিচ্ছিল, জেল থেকে পালাতে গিয়ে তখনই জেলের ভেতরে খুন হয়ে গেল সুপার্থ। সুপার্থ জানত পালানোর চেষ্টা না করলেও কয়েদখানা থেকে প্রাণ নিয়ে সে বেরোতে পারবে না। বছরখানেক আগে জেল থেকে হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর জন্যে যে বন্দিকে নিয়ে গিয়ে কর্তৃপক্ষ একবার ল্যাজেগোবরে হয়েছে, রক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে বন্দি পালিয়েছিল, হাজার খোঁজাখুঁজি করে যাকে ধরতে পারেনি পুলিস, ঘটনাচক্রে (পুলিসের সৌভাগ্য বলতে হবে) গাংনেগড়ের সুদূর গাঁ থেকে সেই সুপার্থকে খুনের অভিযোগে (বমাল-সমেত, মানে, মুরারি ঘোষের লাশ) দ্বিতীয় দফায় ধরে ফেলবে, এটা পুলিস ভাবেনি। রাষ্ট্ররক্ষকদের কাছে জীবন্ত সুপার্থ এক বিশাল ভয়। খাঁচা ভেঙে পালানো পালের গোদা, সবচেয়ে বিপজ্জনক, উগ্রপন্থীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার ছক, তখন থেকেই জেলার সবচেয়ে ওপরতলার প্রশাসন, পুলিস বানাতে শুরু করেছে, জয়াকে সে খবর জানিয়ে চিঠিতে সুপার্থ লিখেছিল জেলা পুলিসের বড়কর্তা রোজ, যত রাত হোক, একবার এসে তার খবর নিয়ে যায়। 'কনডেমড সেল' যেখানে সে একা থাকে, সেখানে কড়া পাহারা কত মজবুত, তা তত্ত্বতল্লাশ করে। সুপার্থর জেল থেকে পালানোর

পরিকল্পনা, সম্ভবত সেই পর্বে শুরু হয়েছিল। ইংরেজ আমলের জেলখানার দুর্বলতম জায়গা ছিল 'লালগাড়ি'। জেলের দেওয়াল সেখানে ত্রিশ ইঞ্চি চওড়া, বেশিও হতে পারে। দেওয়ালের দু'দিকে দুটো দরজা, দু'দরজার মাঝখানে রেলের লাইন জেলের ভেতর থেকে এসে ত্রিশ ইঞ্চি পুরু পাঁচিলের দু'দরজার বাইরে চলে গেছে। বন্দিদের খাটাপায়খানা, রাতের জন্যে সেলে রাখা পায়খানা, পেচ্ছাবের টুকরি, সব জায়গার ময়লা, ট্রলিতে তুলে দেওয়ালের দুই দরজা খুলে জেল চত্বরের বাইরে পাঠানো হত। আস্তাকুঁড়ের রাস্তা হওয়ার কারণে, 'লালগাড়ি' ছিল জেলের সবচেয়ে পরিত্যক্ত অঞ্চল। রক্ষীরা সাধারণভাবে সেদিকে ঘেঁষত না। জেল পালানোর পথ হিসেবে এই অঞ্চল বেছে নেওয়া সম্পর্কে চিঠিতে জয়াকে সুপার্থ লিখেছিল, রোজ বিকেলে আমরা 'চোরপুলিস' খেলার সময়ে জেলের যেদিকে লুকোলে চোরের হদিস করতে পুলিস নাজেহাল হয়, সেখানে চলে যাই। জায়গাটার নাম, লালগাড়ি। রেল লাইন পাতা আছে সে পথে। গু-মুত ভর্তি ট্রলি যাতায়াত করে লাইনের ওপর দিয়ে। 'নাইটসয়েল' বয়ে নিয়ে যাওয়ার ট্রলিটা দেওয়ালের বাইরের রাখা থাকলেও জেলের 'ব্রাহ্মণ' রক্ষীরা সে পথ মাড়ায় না। রক্ষীমাত্রই জেলের ভেতরে ব্রাহ্মণ। 'চোরপুলিস' খেলার সঙ্গে আরও নানা খেলা, এমনকি 'জিমনাস্টিক্স' 'মানুষ মই' বানানো পর্যন্ত খেলায় সারা বিকেল আমরা মেতে থাকি

বাবার হাতে পাঠানো গোপন চিঠিতে সঙ্কেতে এরকম নানা খবর সুপার্থ পাঠাত জয়াকে। 'মানুষ মই' খেলার নিয়ম সুপার্থর চিঠি পড়ে জয়া হৃদয়ঙ্গম করতে না পারলেও পরে জেনেছিল, জেল ভেঙে পালানোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল, এই 'অ্যাক্রোব্যাটিকস' চর্চা, যার নাম, 'হিউমান ল্যাডার' বাংলা তর্জমায় মানব মই। পাঁচজন মানুষ একে অন্যের কাঁধের ওপর ভারসাম্য বজায় রেখে খাড়া থাকবে। সবচেয়ে শক্তিমান মানুষটি স্তম্ভের মতো দাঁড়াবে গোড়াতে, তারপর দাঁড়াবে দ্বিতীয় শক্তিমান, এভাবে খাড়া হবে এমন এক মানব মই, যার সবচেয়ে ওপরে থাকবে, মই-এর সেরা সংগঠক, দলের নেতা। মই-এর কাঠামো হবে পাঁচ, চার, তিন, দুই, এক। (৫, ৪, ৩, ২, ১) জেলের পাঁচিল টপকে প্রথমে পাঁচ নম্বর, বাইরে বেরিয়ে লালগাড়ি যাতায়াতের বন্ধ দরজার তালা ভাঙবে। ভেতরের দরজার তালা হাতের কাছে থাকায় সেটা তখনই ভেঙে ফেলতে অসুবিধে হবে না। নির্ধারিত দিনের আগে রক্ষীদের অগোচরে, পরীক্ষামূলকভাবে ভেতরের তালা খোলা আর বন্ধের কাজে হাতেকলমে তালিম দিয়ে রাখা হবে কয়েকজনকে। দেওয়ালের দরজার ওপাশে থাকবে একাধিক গাড়ি। মানব মই-এর পাঁচ নম্বর, সুপার্থ পাঁচিলের বাইরে লাফিয়ে পড়লে, সেখানে গেটের তালা ভাঙার কাজ সেরে তখনই তাকে তুলে একটা গাড়ি গোপন ডেরায় পৌঁছে দেবে। উদ্ধারকারীরা সেই মুহূর্তে বাইরের তালা খুলে দিলে, ভেতরের বন্দিদের বাছাই করা সতেরো জন বেরিয়ে যাবে।

বাকি যারা সুযোগ পাবে, তাদের জন্যে সাড়ে-তিন মিনিট গাড়ি অপেক্ষা করবে। 'হিউম্যান ল্যাডার', মানব মই ভাঙতে রক্ষীরা ঝাঁপিয়ে পড়লে তাদের ঠেকাতে দুধাপে থাকবে দু'দল আত্মরক্ষাবাহিনী। পরিকল্পনা মতো কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা ঠেকাবে রক্ষীদের। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তারা প্রতিরোধব্যূহ ছেড়ে হটবে না।

মাসের পর মাস মই তৈরির যখন অনুশীলন চলছে, আদালতে তখন অন্য প্রেক্ষাপট। বিচারের কাজে, 'এগজামিনেশন অফ দ্য অ্যাকিউজড আন্ডার সেকশন থ্রি থারটি সি আর পি সি', আগে যাকে বলা হত, 'থ্রি থারটি অফ দ্য ক্রিমিনাল প্রোসিডিওর কোড', অনুযায়ী অভিযুক্তরা, সত্যমাস্টার, গণেশ আলাদা করে বিচারকের জিজ্ঞাসাবাদে জবাব দিলেও বিচারকের প্রশ্ন শুনে নিজের লেখা কবিতায় সুর দিয়ে সুপার্থ গেয়ে উঠত, 'ভাগীরথী, তুমি মেকং নদীর সীমানা ভাঙো, খবর আনো, খবর আনো।'

তার এই দ্রোহকালীন মূর্তি, তাকে আরও বেশি করে রাষ্ট্রক্ষমতার নিশ্চিহ্নকরণ কর্মসূচির নিশানা করে তুলছিল। আদালতে তার পক্ষে সওয়াল করার জন্যে কোনও আইনজীবী ছিল না। বিচারককে সে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিল, চালু বিচারব্যবস্থায় তার ঘোর অবিশ্বাস, সে বলত, দুর্নীতিপরায়ণ খুনিদের স্বার্থে, আরও বেশি দুর্নীতিপরায়ণ খুনিদের দিয়ে, সবচেয়ে বেশি খুনি দুর্নীতিপরায়ণ, লম্পট জোচ্চোরদের স্বার্থে তৈরি এই বিচারব্যবস্থায় তার বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। খুব শান্তভাবে, জোরের সঙ্গে কথাগুলো সে বলার সময়ে এজলাসের বিচারক থেকে সওয়াল জবাব শুনতে উৎসাহী শ্রোতারা পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে যেত। রাগে দাঁত কিড়মিড় করত সাদা পোশাকের পুলিস। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আদালতে সুপার্থর পেশ করা রাষ্ট্রদ্রোহমূলক বিবৃতি, বেপরোয়া আচবণের বিবরণ, গোয়েন্দারা পৌঁছে দিত।

ফৌজদারি মামলার তিনশো বিয়াল্লিশ ধারার নির্দেশ অনুযায়ী দুই অভিযুক্ত, গণেশ আর সত্যমাস্টারকে বিচারক জেরা শেষ করে সুপার্থকে যখন জানাল, আইন অনুযায়ী, অভিযুক্তদের সাক্ষ্য যেহেতু বিচারককে সরাসরি নিতে হয়, তাই প্রথম দুজনের পরে তৃতীয় সাক্ষী সুপার্থকে তার কিছু প্রশ্ন আছে। সুপার্থ ইচ্ছে করলে জবাব দিতে পারে, চুপ করেও থাকতে পারে। গণেশ, সত্যমাস্টার এই পর্বে বিচারকেব প্রতিটা প্রশ্নের যতটা সম্ভব সঠিক, সম্পূর্ণ জবাব দিলেও সুপার্থ বলল, তাকে প্রশ্ন করার অধিকার বিচারকের নেই। বিচারক মানে, শ্রেণীশত্রুর চিহ্নিত দালাল। তার প্রশ্নের জবাব দেওয়া দূরের কথা, প্রশ্নগুলো শুনতেও সে নারাজ। সুপার্থ প্রশ্নের জবাব দেয়নি, রাষ্ট্রব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে জীবনের মূলস্রোতকে সে যে তছনছ করে দিচ্ছে, আরও দেবে, রাষ্ট্রের কর্তারা তা বুঝে গিয়ে পৃথিবী থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। জেলা দায়রা জজের বিচারে তিনজনের আজীবন কারাদণ্ডের রায় ঘোষণা হতে গণেশ আর সত্যমাস্টারের দুই আইনজীবী উচ্চতর আদালত, কলকাতা হাইকোর্টে আপিল করে। আদালতে সে আবেদন গ্রাহ্য

হওয়ার কিছুদিন পরে সত্যমাস্টার ছাড়া পেলেও গণেশের যাবাজ্জীবন সাজা বহাল থাকে। আইন-আদালত, কোর্ট-কাছারি, বিচার-সাজা, কিছুতে ভ্রূক্ষেপ না করে সুপার্থ বেপরোয়াভাবে 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির', এরকম ভঙ্গিতে গণসঙ্গীত গেয়ে, বিদ্রুপের হাসি ছিটিয়ে প্রতিপক্ষের মর্মে আতঙ্ক জাগিয়ে রাখল। গণেশ বাউরির যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশে তার অসহায় পরিবারের জন্য গভীর উদ্বেগ থেকে জয়াকে এক চিঠিতে সুপার্থ লিখেছিল, গণেশের ছেলেমেয়ে, কচি বাচ্চা, বউ, যেন না খেয়ে থাকে, তাদের দেখভাল করতে জয়ার পক্ষে যা করা সম্ভব, করতে অনুরোধ জানিয়েছিল। নিজের বাড়িতে মা, বাবা উপোস করছে জেনেও গরিব চাষি গণেশের পরিবারকে বাঁচাতে দলের কাছে গোপনে একাধিক চিঠি লিখেছিল। জেলের মধ্যে গণেশের সঙ্গে মতের কিছু অমিল ঘটতে থাকলেও তাকে যতটা সম্ভব আগলে রেখেছিল সুপার্থ। সুপার্থর জেল ভাঙার কর্মসূচি থেকে দূরে থাকতে তাকে ছেড়ে পাশের ওয়ার্ডে গণেশ জায়গা করে নিলেও বিষয়টা নিয়ে কোথাও মুখ খোলেনি। সুপার্থর রাষ্ট্রবিরোধী চরম অবস্থান থেকে কর্তৃপক্ষ আঁচ করেছিল, যাবজ্জীবন সাজা পাওয়া, বিপজ্জনক এই আসামীকে বেশিদিন জেলের ঘানি টানানো যাবে না। সুযোগ পেলেই সে ফুড়ুত করে উড়ে যাবে। নিজে তৈরি করে নেবে সুযোগ। সেরকম কিছু ঘটার আগে, কাল্পনিক সঙ্ঘর্ষের, যাকে বলা হত এনকাউন্টার, গল্প রচনা করতে শুরু করেছিল জেলা প্রশাসন। জেল থেকে সুপার্থর আগে একবার পালানোর ঘটনা কারাকর্তাদের আতঙ্কিত করে রেখেছিল। অবাধ্যতম বন্দির ছাপ দেগে দেওয়া হয়েছিল তার নামের পাশে।

দিন শেষের ঘণ্টা শুনতে পাচ্ছিল সুপার্থ। চিঠিতে তা আগাম জানিয়েছিল জয়াকে। বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো এত তাড়াতাড়ি পৃথিবী ছেড়ে সুপার্থ চলে যাবে, জয়া কল্পনা করেনি। সাময়িকভাবে সুপার্থর মৃত্যুতে ভেঙে পড়লেও তার মনের মধ্যে নিভৃতে দুঃসংবাদ শোনার যে প্রস্তুতি চলছিল, দুঃখের দিনে সেটা তাকে বাঁচিয়ে দিল। মনের ভেতরের সব আলো নিভতে দিল না। শোকাতুর জয়াকে সামলে উঠতে প্রকাশ যখন সস্নেহে তার মনে সহানুভূতির প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা করছিল এবং অল্পস্বল্প সুফল পেতে শুরু করেছিল, তখনই সুপার্থর চিঠির গোছা তার সামনে হাজির করে জয়া বুঝিয়ে দিয়েছিল শোকের সমুদ্র হজম করে সে সটান দাঁড়িয়ে রয়েছে। জয়ার মত তেজি মেয়েকে সান্ত্বনা দেওয়ার বোকামিতে প্রকাশ যখন সলজ্জ, জয়া বলেছিল, তুমি পাশে এসে না দাঁড়ালে এই শোকের বোঝা একা আমি বইতে পারতাম না। সব ছেড়ে চাকরির খোঁজে নেমে পড়েছিলাম। দু-একটা যোগাযোগ ঘটেছিল। পেয়েও যেতাম একটা চাকরি। আমার পালানোর পথ আটকে দাঁড়ালে তুমি। বাঁচিয়ে দিলে আমাকে। সুপার্থর দায় না মিটিয়ে আমার উপায় নেই।

প্রকাশ কী বলবে ভেবে পায়নি। জয়াকে নিয়ে লেখা সুপার্থর যে কবিতা,

সে শহিদ হওয়ার পরে, দলের ভেতরে কমবয়সী ছেলেরা কাড়াকাড়ি করে পড়েছিল, প্রকাশও পড়েছিল, একবার নয়, বারবার পড়ে কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল, সেই দুর্দিনে জয়ার পাশে দাঁড়িয়ে কবিতার সেই মেয়েটির বুকের শব্দ শুনতে পেল প্রকাশ। পুরো কবিতাটা নম্র, নিচু গলায় জয়াকে শুনিয়েছিল।

'সেই মুখটা—তার কাছাকাছি আমার উজ্জ্বল বয়স।
আমার দৃপ্ত জীবন।
সেই মুখটা....। ঘুম এখন নেই, অনন্ত সুদুর পথ
আমার পায়ের নীচে, দিগন্ত বিস্তৃত আকাশ,
খোলা রোদ্দুর। আলাপ গভীরে জমে ওঠে
যেন এরকমই জীবন।
যেন এরকমই জীবন।
রোদ্দুরে মুখ দেখা, মিছিলে উজ্জ্বল সম্ভাষণ
যেন এরকম জীবন চিরকাল।।"

তাকে নিয়ে লেখা সুপার্থর কবিতা, প্রথম থেকে শেষ ছত্র, প্রকাশের মুখে শুনে অভিভূত জয়ার মনে হয়েছিল, কাছাকাছি কোথাও সুপার্থ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

প্রকাশকে কয়েকমাস পরে আশ্চর্য এই অনুভূতির বিবরণ জয়া শুনিয়েছিল। বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে থাকা জয়নুল ফের ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা শতরঞ্চিতে বসে প্রকাশ বুঝতে পারল না। ঘুমিয়ে থাকা জয়ার মুখে প্রশান্তি ছড়িয়ে রয়েছে। তার বুকের গভীর পর্যন্ত বাতাস যাতায়াতের শব্দ শুনতে পেল প্রকাশ। জয়াকে দু-তিনদিন বিশ্রাম দিতে হলে তার দিদি, বোন অথবা নিকটাত্মীয়া পরিচয় দিয়ে দলের সারাক্ষণের কর্মী, মেয়েদের মধ্যে কাকে এখানে আনা যায়, ভোর হওয়ার আগে থেকে প্রকাশ ভাবতে শুরু করেছিল। উত্তরপাড়া থেকে দেবেশের বউ চৈতালিকে আনলে, দুই রোগী সামলানোর কাজ সে অনায়াসে উতরে দিতে পারে। দেবেশকে খবর পাঠালে. চৈতালিকে নিয়ে নিজেই সে হাজির হয়ে যেতে পারে। তার ব্যস্ততা থাকলে, চৈতালি একা চলে আসবে। প্রকাশের পুরনো বন্ধু দেবেশ, বাগবাজার স্কুলে পড়ানোর চাকরি ছেড়ে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে পুরো সময়ের কর্মী হিসেবে সংগঠন তৈরি করছে। বাইরে থেকে তাকে নিরীহ ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী মনে হলেও হাওড়ার গেস্টকিন উইলিয়ামস ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা থেকে হিন্দমোটর, ডানলপ, ত্রিবেণি টিস্যু, ত্রিবেণি স্পান পাইপ পর্যন্ত শিল্পাঞ্চল জুড়ে শ্রমজীবী মানুষের গোপন সংগঠনের জাল বিছিয়ে চলেছে দেবেশ। বছরখানেক আগে চৈতালিকে বিয়ে করেছে দেবেশ। দলের মধ্যে না থাকলেও চৈতালি চৌকশ মেয়ে, দলের গোঁড়া সমর্থক। জয়াকে চেনে বললে কম বলা হয়, তার একান্ত অনুরাগী। জয়া অসুস্থ শুনলে, তার সেবা করতে এক ডাকে চলে আসবে। নিজের জন্যে নির্দিষ্ট, দিনের কাজের ফর্দ মাথার মধ্যে গুছিয়ে নেওয়ার মধ্যে জানলার

বাইরে আলো দেখে সকাল হয়েছে, প্রকাশ বুঝতে পারল। চৈতালিকে আনার আগে জয়ার সঙ্গে একবার কথা বলে নিতে চাইছিল সে। জয়নুলের ঘরে ভিড় বাড়ালে, তার পায়ের ক্ষত থেকে শরীরে সংক্রমণ ছড়াতে পারে, এরকম আশঙ্কা জয়ার আছে। প্রকাশকে কয়েকবার এই উদ্বেগের কথা জয়া শুনিয়েছে। জয়ার অভিমত জানতে হলে ঘুম থেকে সে জেগে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে বুঝেও তার ঘুম ভাঙাতে চাইল না প্রকাশ। সে জানে, বেলা করে ঘুম থেকে উঠে জয়া বলবে, তাকে এতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকতে দিয়ে প্রকাশ ঠিক করেনি।

প্রকাশ তখন কথা না বলে মুখ টিপে হাসলে জয়াও হেসে ফেলবে। জয়াকে এই মুহূর্তে জাগানোর প্রয়োজন নেই। জয়নুলকে এক ঘণ্টা পরে দিনের দ্বিতীয় ওষুধ খাওয়ানোর সময়ে, সে নিশ্চয় জেগে থাকবে। জয়া তখনও ঘুমোলে, জয়নুলকে সকালের দুধ, পাউরুটি, খেতে দেবে প্রকাশ। বেলা দশটা পর্যন্ত জয়া ঘুমোলেও তাকে ডাকা যাবে না। যত বেশি বিশ্রাম সে পায়, তত ভাল। তাড়াতাড়ি চাঙা হয়ে উঠবে। আজ শেষ রাতে জয়ার যে ক্লান্ত, ভেঙে-পড়া মূর্তি প্রকাশ দেখেছে, আগে কখনও দেখেনি। কথাটা মনে আসার পরের মুহূর্তে প্রকাশ টের পেল, তার স্মৃতিতে গলদ রয়েছে। পাগলিনির মত জয়ার বিবশা দশা, আরও একবার আগে প্রকাশ দেখেছে। জেল থেকে জামিনে ছাড়া পাওয়া, সুপার্থর সহবন্দি, নরেন দলুইয়ের বিবরণ শোনার আগে, সুপার্থর কোনও একজন কাছের মানুষ, সম্ভবত সুপার্থর পরিবারের কারও মুখ থেকে তার নিধনকালের প্রতি মুহূর্তের বৃত্তান্ত পৌঁছেছিল জয়ার কাছে। প্রকাশ ভুল কিছু ভাবেনি। সাতই ফেব্রুয়ারি, সেই কালো দিনের চুলচেরা ঘটনাক্রম জয়াকে শুনিয়েছিল সুপার্থর বাবা, তেজেশ সরকার। নরেনের চেয়েও আরও বেশি খবর জয়াকে দিয়েছিল তেজেশ। রোজকার দিনপঞ্জি রাখত তেজেশ। শেষ কয়েক বছরের দিনপঞ্জি জুড়ে পাতার পর পাতাতে ছিল সুপার্থর উল্লেখ। সুপার্থকে নিয়ে নানা ঘটনা, সুপার্থর জন্যে উদ্বেগ, ব্যাকুলতা, জেল ভেঙে ছেলের পালানোর খবরে গভীর শঙ্কার সঙ্গে সাহসী সন্তানের বীরত্বে গৌরববোধ, ছেলেকে দেখতে নির্দিষ্ট দিনে আদালতে যাওয়া, নানা সূত্রে ছেলের জীবনের ওপর নেমে আসতে থাকা মৃত্যুর ছায়া, অবশেষে সেই অবশম্ভাবী মৃত্যুর অবতরণ, পরের ঘটনাক্রম, তেজেশের দিনপঞ্জিতে সন্তানের রক্তস্রোতের মতো যা ঢুকে পড়েছিল, তার সঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শী নরেনের বিবরণ জুড়ে, যে আখ্যান জয়া গড়ে তুলেছিল, ছ-মাস পরে প্রকাশের সূত্রে সেই আখ্যানের অর্ধেক জয়া পুনর্বার শুনে নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে বোকা বনে গিয়েছিল প্রকাশ। ভুল করে, জয়ার কাছে যা ছ'মাসের বাসি খবর, তাই দিয়েছে, টের পেতে প্রকাশের সময় লাগেনি। ছ'মাস আগে জয়াকে পাগলিনির মত কেন দেখাচ্ছিল, প্রকাশ হৃদয়ঙ্গম করেছিল ছ'মাস পরে। জয়ার মনের যন্ত্রণা মুছিয়ে তাকে উদ্বুদ্ধ করতে নরেনের বিবরণ শুনিয়েছিল প্রকাশ। শোকে বিদীর্ণ মনের

অভিব্যক্তি জয়ার মুখে মুহূর্তের জন্যে ফুটে উঠে মিলিয়ে গিয়েছিল। সে বলেছিল, এ ঘটনা আমি আগেই শুনেছি।

ছি ছি, দ্বিতীয়বার শুনিয়ে কষ্ট দিলাম তোমাকে।

প্রকাশ আক্ষেপ করতে তাকে থামিয়ে জয়া বলেছিল, যতবার শুনি, মনে হয় এই প্রথম শুনলাম। বারবার শুনতে ইচ্ছে করবে। ফেব্রুয়ারির সাত তারিখের ঘটনা, তুমি যা জানো, সেখানে কিছু ফাঁকফোকর আছে, আমি সব জানি, এমন নয়। আমি যতটা জানি, তুমি শুনে নিজের বিবরণের সঙ্গে মিলিয়ে নাও। জয়া বলল, সেই ফেব্রুয়ারিতে শীত ছিল খুব, দীর্ঘও হয়েছিল শীতের সময়। সকালে ঘন কুয়াশা জমেছিল জেলের ভেতরে, বাইরে। সকালের 'লক-আপ' খুলেছে। ওয়ার্ড থেকে, জেল থেকে বন্দিরা সব বেরিয়ে পড়েছে। সকালের জলখাবার বিলি করা শুরু হয়ে গিয়েছিল। সুপার্থ, তার বন্ধুরা উত্তেজনায় আগের রাতে অর্থাৎ, ছয় ফেব্রুয়ারির রাতে ঘুমোতে পারেনি। সেই বিকেলে বেশ কয়েকবার 'মানব মই' বানানোর সফল মহড়া দিয়ে আত্মবিশ্বাসে টগবগ করে তারা ফুটছিল। সাড়ে সাতটার মধ্যে জলখাবার খেয়ে, বুকভরা উদ্দীপনা নিয়ে যে যার ভূমিকা পালন করতে মনের দিক থেকে প্রস্তুত হয়ে জায়গামত দাঁড়িয়ে গেল। ছোট ছোট দলে ভাগ করে দায়িত্ব বেঁটে দেওয়া হয়েছিল। প্রতিটা দলের সদস্যরা নিজেদের চিনলেও অন্য দলে, বন্ধুরা কে কোথায় রয়েছে, জানত না। সুপার্থর বাবা, তেজেশের সংবাদ সরবরাহকারী ধ্রুব ছিল ফুলবাগানের মালির কাজে ব্যস্ত কয়েদিদের সঙ্গে। সকালের জলখাবার খেয়েই ফুলবাগানে চলে গিয়েছিল। জেলে আটক, ফুলের মত ফুটফুটে ছেলেটিকে ফুলবাগানে কয়েদিদের সঙ্গে কাজ করতে অনুমতি দিয়েছিল জেলের হেড জমাদার। বন্ধুদের পরামর্শে পুষ্পপ্রেমিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল ধ্রুব। তার ওপর দায়িত্ব ছিল, জেলের প্রধান গেটের ওপর নজর রাখার সঙ্গে বাঁদিকে 'কনডেমড সেল', যেখানে সুপার্থ রয়েছে, বাঁপাশে হাসপাতাল, তার আগে 'জেনারেল হাওদা' মানে, কয়েদিদের চানের জায়গা, আর একটু এগিয়ে সারি দিয়ে পায়খানা, প্রস্রাবের ঘর সমেত যতটা দেখা যায়, চোখে চোখে রাখা। চানের জায়গা, পায়খানা-প্রস্রাবাগার, সব কয়েদি ব্যবহার করলেও দিনের বেশি সময়ে জায়গাটা ফাঁকা থাকত। সকাল, বিকেল মিলিয়ে দু-তিন ঘণ্টা লকআপের বাইরে থাকার সময়ে তারা এই সুযোগ পেত। সেখান থেকে 'লালগাড়ি', ময়লাবোঝাই ট্রলি বেরোনোর গেট বিশেষ দূরে নয়। ওয়ার্ডের ভেতরে জলের চৌবাচ্চা, পায়খানা, প্রস্রাবাগার, দিনের মধ্যে দশ ঘণ্টা বন্দিরা ব্যবহার করত। সুপার্থ, তার সঙ্গীরা সচরাচর 'জেনারাল হাওদায়' চান করত না। সেদিকের পায়খানায় কদাচিৎ ঢুকত। হাসপাতালের পথে অসুস্থ বন্দিরা সকাল ন'টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত ডাক্তার দেখাতে যাওয়ার সুযোগ পেত। দুপুরের আগে থেকে বাকি দিনের মতো ফাঁকা পড়ে থাকত সেই পথ। জেল থেকে পালানোর জন্যে লালগাড়ি চত্বর বেছে

নেওয়ার পর থেকে সেদিকের হাওদা, পায়খানা, প্রস্রাবাগার ব্যবহারের বহর বাড়িয়ে দিল সুপার্থ, তার বন্ধুরা। জেল কর্তৃপক্ষ, রক্ষীবাহিনী, সাধারণ কয়েদিদের চোখে 'জেনারেল হাওদা'র চারপাশে মার্কামারা উগ্রপন্থীদের দল বেঁধে ঘোরাফেরা ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে উঠতে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামানোর দরকার বোধ করল না। কমবয়সী উগ্র মতের বন্দিদের প্রায় রোজ বিকেলে চোরপুলিস খেলার মত লালগাড়ি এলাকাতে তাদের ঘোরাফেরা বেকসুর সন্দেহের বাইরে থেকে গেল। তেজেশকে অবশ্য ধ্রুব বলেছিল, তার ধারণা, জেনারাল হাওদা থেকে লালগাড়ি এলাকায় দলবল নিয়ে সুপার্থর খেলা, শরীরচর্চা, শরীরের নানা কসরত সড়গড় করার অনুশীলকে জেলরক্ষীরা পাত্তা না দিলেও আড়াল থেকে কেউ নজর রাখত। সুপারের ছাদের অন্ধকার চিলে কুঠরির ভেতরে বসে, খোলা জানলা দিয়ে জেনারাল হাওদা থেকে লালগাড়ি পর্যন্ত জেল চত্বরের উত্তর-পশ্চিম মাঠে চোখ রেখে, সন্ধের লকআপ হওয়া পর্যন্ত কেউ নজরদারি করলে ফুলবাগান থেকে তাকে শনাক্ত করার উপায় ছিল না। তেজেশকে জোরের সঙ্গে ধ্রুব বলেছিল, সুপার, জেলার কারও চিলেকোঠা অথবা দুজনের বাড়ির কোনও গোপন জায়গা থেকে সুপার্থর ওপর নজর রাখা হচ্ছিল। ধ্রুব, তার সন্দেহের লেখা গোপন চিরকুটে জানিয়েছিল। গজঘণ্টায় সুপার্থর ছোড়দির শ্বশুরবাড়ির পাড়াতে ধ্রুব থাকত। ক্লাস ইলেভেনের ছাত্র ধ্রুব, সক্রিয় রাজনীতি না করলেও সুপার্থর অনুরাগী ছিল। তেজেশকে 'দাদু' বলত সে। নাতির বয়সের ধ্রুবকে স্নেহে, মায়ায় আপন করে নিয়েছিল তেজেশ। তার পেকেট পয়সা থাকলে ধ্রুবর জন্যে কখনও-সখনও সে তেলেভাজা, খোসাসুদ্ধ চিনেবাদাম ভাজা কিনে এনে সুপার্থর হাতে পাঠিয়ে দিত। নিজের হাতে ধ্রুবকে দেওয়ার সুযোগ পেলে দারুণ খুশি হত তেজেশ। তার দু'ঠোঁট, লম্বা দাড়ি দিয়ে হাসি ঝরে পড়ত।

সাতই ফেব্রুয়ারির সেই সকালে নরেন দলুইয়ের 'ডিউটি' ছিল 'এস এস', মানে সুপার্থ সরকারকে সময়ের অবধারিত মুহূর্তে 'হিউম্যান ল্যাডার'-এর স্তম্ভের পাশে হাজির করানো। মই-এর শিখরে চতুর্থজন তখন পা রেখে 'কংক্রিট' থামের মত পঞ্চমজনের অপেক্ষা করছে। মহড়ার সময়সূচক অনুযায়ী দু'মিনিটে মই-এর টং-এ সুপার্থর পৌঁছে যাওয়ার কথা। আগের দু'দিনের মহড়ায় দু'মিনিট পূর্ণ হওয়ার আগে সেখানে উঠে দাঁড়িয়েছিল সুপার্থ। ফেব্রুয়ারির সেই সকালে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হল না। কর্মসূচির প্রধান অংশ মই তৈরিতে ত্রুটি ধরা পড়ল। মই-এর দুটো মজবুত ধাপ, ষাঁড়ের মত শক্তিমান দুই কমরেডকে চব্বিশ ঘণ্টা আগে 'ল্যাডার টিম' থেকে আত্মরক্ষা বাহিনীতে টেনে নেওয়ার ত্রুটি ধড়া পড়ল চরম মুহূর্তে। নতুন দুজনকে নিয়ে আগের দিনে মহড়ায় কোনও গোলমাল ধরা না পড়লেও চরম সময়ে মই খাড়া রাখা গেল না। প্রথম চারজনের মই তৈরি হওয়ার পরের মুহূর্ত থেকে তা নড়বড় করতে থাকল। কংক্রিটের থামের মত অটল থাকতে

মহড়া দিয়ে মই-এর দ্বিতীয় আর তৃতীয় ধাপের জন্য আগাগোড়া যাদের তৈরি করা হয়েছিল, মজবুত দেহের সেই দুজনকে সরিয়ে নতুন দুজনকে আনতে, পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে চলেছে, ফুলের বাগান থেকে দেখে ধ্রুব বুঝে গিয়েছিল। লালগাড়িতে মই-এর শীর্ষ, পাঁচ নম্বর ধাপ, সুপার্থর হাজির হওয়ার কথা ছিল, চার নম্বর ধাপ তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে। সুপার্থকে আনার সঙ্কেত, লালগাড়ি থেকে তার সেলে পৌঁছোলে, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মই-এর কাছে তাকে নিয়ে আসবে নরেন। মাসখানেকের বেশি সময় ধরে নাটকের দৃশ্যের মত বারবার গোটা অনুষ্ঠানটা পুনরাবৃত্ত হলেও সুপার্থকে তার সেল থেকে নিয়ে যাওয়ার সঙ্কেত নরেন পেল না। সিগন্যালের প্রতীক্ষায় সেলের মধ্যে বন্দি বাঘের মতো পায়চারি করছিল সুপার্থ। প্রতিটি মুহূর্ত যেখানে আলোকবর্ষের চেয়ে বেশি দামি, সেখানে এক, দুই, তিন করে মিনিট কেটে যেতে অধৈর্য সুপার্থ সেল থেকে বেরিয়ে লালগাড়ির দিকে রওনা হতে চাইল। তাকে ঠেকাল নরেন। সিগন্যালের জন্যে অপেক্ষা করতে বলল। লালগাড়িতে গিয়ে, নরেনকে সরেজমিনে দেখে আসতে সুপার্থ চাপ দিলেও নরেন নড়ল না। সুপার্থকে আগলে নিয়ে মই-এর গোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেলের দরজা ছেড়ে তার নড়াচড়া বারণ, 'জেল ব্রেক কমিটি'র এটা 'ম্যানডেট', কড়া নির্দেশ। 'ম্যানডেট' অমান্য করার সাহস তার নেই। সুপার্থ চটে যাচ্ছিল। তার নির্দেশ অমান্য করার সাহস নরেন পেল কোথা থেকে? সুপার্থ ধমক দিতে শুরু করতে অনিচ্ছা নিয়ে লালগাড়ির দিকে নরেন পা বাড়াল। ফুলের বাগানে কর্নিক হাতে কাজ করার মধ্যে পুরো প্রেক্ষাপট ধ্রুব নজর করছিল। টলমলে মই বারবার ভেঙে পড়ার সঙ্গে নিজের সেলের বাইরে দাঁড়ানো সুপার্থর সঙ্গে নরেনের কথোপকথন, চা খাওয়ার জন্যে এক রক্ষীর হঠাৎ লালগাড়ির পথে হাসপাতালের দিকে হাঁটতে থাকা, টুকরো দৃশ্যগুলো কর্নিক হাতে ধ্রুবর চোখের সামনে, একটা ফ্রেমে আবদ্ধ সম্পূর্ণ 'ল্যান্ডস্কেপ' হওয়ার মধ্যে চা-পিপাসু সেই রক্ষী, 'হিউম্যান ল্যাডার' দেখে, আতঙ্কে, কপালে, দুচোখ তুলে পকেট থেকে 'হুইসিল' বার করে দুঠোঁটে চেপে বিপদজ্ঞাপক সুতীব্র আওয়াজ তুলল। একটা হুইসিল বেজে উঠতে দুটো, তিনটে জেলখানার নানা দিক থেকে কানে তালা ধরানো একঝাঁক হুঁইসিলের সম্মিলিত ধাতব আওয়াজ ভেসে এল। সুপার্থ তখনও তাগাদা দিয়ে চলেছে। সুপার্থর সেলের দরজা খোলা থাকলেও 'কনডেমড সেলে'র সামনে আট ফুট খাড়া পাঁচিল। লালগাড়ি সেখান থেকে দেখা যায় না। সেল থেকে লালগাড়ির দূরত্ব দেড়শো মিটারের কম নয়। লালগাড়ি পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে ফিরে এসে সুপার্থকে নিয়ে ফের 'হিউম্যান ল্যাডারে'র তলায় পৌঁছোনো অনেক সময়ের ধাক্কা, যুক্তি সাজিয়ে পরিস্থিতি বেগতিক পরিমাপ করেও সেল চত্বরের বাইরে এসে দাঁড়াল নরেন। লালগাড়ির দিকে কিছুটা গিয়ে দেখতে পেল, সিগন্যাল যাদের দেওয়ার কথা, নির্দিষ্ট জায়গায় তারা দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিন দিক দিয়ে তাদের

ঘিরে ফেলেছে রক্ষীর বেষ্টনী। তাদের সামনের রাস্তার ওপর উর্দি পরা যে রক্ষী পড়ে রয়েছে, চা খেতে হাসপাতাল পর্যন্ত সে পৌঁছোতে পারেনি, তার মাথা ফেটে রক্ত বেরচ্ছে। হুইসিলের শব্দে রক্ষীবাহিনী জড়ো হয়ে ঝাঁক বেঁধে লালগাড়ির দিকে ছুটে আসছে। লালগাড়ির চারপাশ ফাঁকা। সুপার্থকে খবর দিতে দ্রুত ফিরে এসে নরেন দেখল, 'সেল' খালি, সুপার্থ সেখানে নেই। নরেন টের পেল সেল চত্বরের বাইরে সে পা রাখতে, সেল ছেড়ে সুপার্থ বেরিয়ে গেছে। নরেনের চোখে না পড়ার জন্যে জেল পাঁচিলের ধার দিয়ে, বন্দিদের জন্যে নিষিদ্ধ পথে লালগাড়ির দিকে সে হাঁটা দিয়েছে। সেখানে পৌঁছে যারা মই তৈরি করবে, তাদের না পেয়ে নিশ্চয় অবাক হয়ে শুনছে, আকাশ চিরে বেজে ওঠা পাগলাঘণ্টির আওয়াজ। হাওদার চারপাশে ছড়িয়ে পড়া উগ্রপন্থীদের ওপর রক্ষীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। নৃশংস পেটাই শুরু হয়ে গেছে। ধ্রুবকে বাঁচাতে, তার হাতে কর্নিক ধরিয়ে ফুলবাগানে পরিচর্যায় ব্যস্ত কয়েদিরা বাগান ছেড়ে নিজেদের ওয়ার্ডের দিকে দৌড় লাগাল। ধ্রুবকে সঙ্গী করে নিয়েছে তারা। জেনারাল হাওদার চারপাশে উগ্রপন্থী ছেলেদের পেটাই করতে তখনও ঝাঁক বেঁধে ছুটে আসছে রক্ষীবাহিনী।

পাগলাঘণ্টি বাজলে বন্দিদের যে যার ওয়ার্ড, সেলে ঢুকে পড়া নিয়ম। বাইরে তখন থাকলে সমূহ বিপদ। লালগাড়ির পাঁচিল টপকে 'জেল ব্রেক'-এর পরিকল্পনা যারা করেছিল, তারা সবচেয়ে কাছে, হাসপাতালের ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। তারা ভেবেছিল, সেখানে তাদের গুনতি করে হিসেব মিলিয়ে নির্যাতন থেকে রেহাই দেওয়া হবে। তাদের অনুমান মিলল না। হাসপাতালে যাদের তখন থাকার কথা নয়, তাদের আলাদা করে বাইরে এনে শুরু হল অমানুষিক মার। কার মাথা ফেটে ঘিলু বেরিয়ে গেছে, কোমর ভেঙে গেছে, মাংস কেটে শরীরের নানা অঙ্গের হাড় বেরিয়ে এসেছে, রক্তে ভিজে যাচ্ছে তাদের শরীর, শক্ত মাটি রক্তাভ কাদার চেহারা নিচ্ছে, প্রতিহিংসায় উন্মত্ত রক্ষীদের দেখার অবস্থা ছিল না। শিকারি কুকুরের মতো জিঘাংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছিল তারা। হাসপাতাল থেকে বার করে যাদের চোরের মতো ঠেঙিয়েছিল, তাদের একজন ছিল নরেন। অন্ধ হয়ে গয়েছিল সে। সুশান্তর মাথা ফেটে ঘিলু বেরিয়ে যাওয়ার পরে সবাই ভেবেছিল, কয়েকঘণ্টার মধ্যে সে মারা যাবে। মৃত্যুর সঙ্গে সে যখন লড়াই করছে, জেল থেকে সুপার্থকে তখন বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে সম্ভবত তার প্রাণহীন দেহ পৌঁছেছিল। সুপার্থর যাবজ্জীবন সাজা হওয়ার পরে হুগলি জেলার প্রশাসন, পুলিসের দুই কর্তা, পৃথিবী থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়ার 'প্ল্যান' করেছিল। ফেব্রুয়ারির সাত তারিখের সকালে তা কার্যকর হয়। যাবজ্জীবন সাজা পাওয়া খুনি, ডাকাতদের সঙ্গে ফুলবাগানের কাজে লেগে থাকার জন্যে 'বি ক্লাস' কয়েদিদের ওয়ার্ডে তখনকার মতো আশ্রয় পেয়ে, নির্যাতন থেকে ধ্রুব রেহাই পায়। নাবালক বন্দি হিসেবে জামিনও পেয়েছিল সকলের আগে। প্রকাশের দলের সঙ্গে ধ্রুব এখনও সম্পর্ক

রেখেছে। প্রকাশের চেয়ে জয়ার বেশি অনুগত সে। কলেজে ছাত্রসংগঠন গড়তে প্রাণপাত করে কাজ করে চলেছে। দলে ভাঙন ধরলেও সুপার্থর সান্নিধ্য যারা পেয়েছিল, তারা ছেড়ে যায়নি জয়াকে। ধ্রুবর ধারণা, জেলপালানোর পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ার প্রধান কারণ, পাকাপোক্ত মহড়া দিয়ে তৈরি 'হিউম্যান—ল্যাডাবের। দুই মজবুত স্তম্ভের শেষ সময়ে রদবদল। 'ল্যাগর' তৈরির চেয়ে তা আগলানোর জন্যে প্রতিরোধ ব্যূহ রচনাতে শেষ মুহূর্তে বেশি গুরুত্ব আরোপ কারায় 'মানবসিঁড়ি' কিছুটা অকর্মণ্য হয়ে পড়েছিল। ধ্রুবর অভিমত জয়া উড়িয়ে দিতে পারেনি।

সুপার্থর মৃত্যুতে জয়ার বিস্ফোবক ক্ষমতা বহুগুণ বেড়ে গেছে, প্রকাশ টের পেয়েছিল সকলের আগে। জয়ার পাশে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সে থাকতে চেয়েছিল।

পঁচিশ

সুপার্থ শহিদ হওয়ার পরে দলের মধ্যে জয়াকে নিয়ে গোপন বৈঠক করার ধুম পড়ে গেল। শোকাতুর জয়া সব বৈঠকে হাজির থাকত। অনুপস্থিত সুপার্থর উষ্ণতা অনুভব করার সঙ্গে মনের সঙ্কল্পটা ঝালিয়ে নিত। বেশিরভাগ ঘরোয়া সভা। জয়ার মুখে সমাজবদলের তত্ত্ব শোনার চেয়ে তাকে দেখতে, আরও স্পষ্ট করে বললে, শহিদ সুপার্থর বিধবাকে দেখতে অনেকে ভিড় করত। সদ্য পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়া সুপার্থর নামের টান কম ছিল না। সুপার্থর সমাজ বদলের সঙ্কল্প, রাজনৈতিক কর্মসূচির চেয়ে তাকে ঘিরে তৈরি নানা গল্প, কিংবদন্তি, জেল থেকে তার প্রথমবার পালানো, গভীর রাতে লাল আলখাল্লা গায়ে চাপিয়ে সন্নাসীর বেশে গজঘণ্টায় দিদির বাড়িতে আবির্ভাব, তার সাহস, আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টির মতো তার খাতার পাতায় পাতায় কবিতার বর্ষণ, ষোলো ফুট উঁচু জেল পাঁচিলের ওপর 'হিউম্যান ল্যাডার'-এর পাঁচ নম্বর ব্যক্তি হিসেবে পৌঁছে গিয়েও কপালে সশস্ত্র বাহিনীর রাইফেলের গুলি লেগে সেখান থেকে জেলের ভেতরে পড়ে যাওয়া, শহিদের মৃত্যুবরণ, সব মিলে তার কাহিনীর বৃত্ত ঘিরে, বৃত্তের ভেতরে, বাইরে আলাদা কথকতা নির্মিত হয়ে চলেছে জয়া বুঝতে পারছিল। লোকমুখে তৈরি সুপার্থর বীরত্বের গাথা যে তার বিবরণের চেয়ে জোরালো হয়ে উঠছে, টের পেয়েও সেই আখ্যান সংশোধনের উপায় জয়ার জানা ছিল না। তার নিজের কথিত প্রকৃত কাহিনীও তার কানে সুদূরকালের কিংবদন্তির মত ঠেকতে শুরু করেছিল। ত্রিবেণী

শ্মশানের চাতালে শোয়ানো, অত্যাচারে চৌপাট হয়ে যাওয়া মৃত সুপার্থর মুখটা বৈঠকী ভাষণের মধ্যে চোখের সামনে ভেসে উঠলে তার গলা বুজে গিয়ে বুকের মধ্যে রক্ত ঝরতে থাকত। জল এসে যেত চোখে। তার ভিজে চোখের দিকে নজর পড়লে শ্রোতাদের কেউ হাপুস নয়নে কাঁদত, নিঃশব্দে কেউ মুছত চোখের জল। কথা বন্ধ করে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে জয়া হাসত। অভিশপ্ত সেই রাতে, শ্মশানে, নির্মীয়মাণ চিতার অদূরে শায়িত সুপার্থর সারা শরীর, তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত প্রতি ইঞ্চি, সশস্ত্র পুলিস তাদের কাঁটা মারা জুতো মাড়িয়ে, বন্দুকের কুঁদোর ঘায়ে, বেয়নেটে খুঁচিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার সঙ্গে রক্ষীবাহিনীর তেলমাখানো বেতের লাঠিতে মাংসমজ্জা থেঁতো হয়ে যাওয়া, মাংসের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা শরীরের সাদা, হাড়, বিচূর্ণ হাড়ের ভয়ানকভাবে উঁচিয়ে থাকা, ঘন অন্ধকারেও জয়ার নজর এড়ায়নি। পাশে নিভুনিভু অন্য চিতার আগুনের যৎকিঞ্চিৎ আভা সেখানে ছড়িয়ে থাকার জন্যে বোহয় জয়া দেখতে পাচ্ছিল অসংখ্য ক্ষতজর্জরিত সুপার্থকে। সুপার্থর টিকোলো নাক, টানা চোখ, পাতলা জোড়া ঠোঁট, চিবুকে ঢেউ খেলানো গোল মুখ, আলাদা করে চেনা না গেলেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল কপালে গুলির ফুটো। কালচে জমাট রক্ত, খয়েরি আবের মত আটকে ছিল সেখানে। হাঁসগড়ার মাঠ থেকে তাকে অ্যারেস্ট করে থানা লকআপে পুলিস জমা করার পরে, তার মুখ থেকে 'মাও সে তুং শুয়োরের বাচ্চা' কথাটা বার করার জন্যে তার হাতের একটা করে আঙুলের নখ উপড়ে নেওয়ার সঙ্গে আরও নানা নির্যাতনে তাকে ছেঁড়ে ফেললেও সে মুখ খোলেনি। মাও-বিরোধী একটা কথা তার মুখ থেকে বার করতে পারেনি পুলিস। থানা হেফাজত থেকে পনেরো দিন পরে সে জেলের জিম্মায় পৌঁছোলে, সেখানে প্রথম তাকে দেখে দলের অনেক সহকর্মী কেঁদে ফেলেছিল। পাটের দড়ি দিয়ে গলা থেকে ঝোলানো, ঝুলঝুলে ভাঙা দুটো হাত, আদুল শরীরে দাগড়া দাগড়া ফুটো-ফাটা বড়-ছোট কালশিটে, পরনে আট ইঞ্চি 'আন্ডারউইয়ার', দু'ডানা ভাঙা কাকের মত লাফাতে লাফাতে জেলের গেট থেকে অফিসঘর পর্যন্ত পৌঁছোতে কষ্টে হাঁপাতে থাকলেও তার মুখে তবু এক চিলতে হাসি লেগেছিল। তার দুর্দশা দেখে জেলে ইতিমধ্যে আটক যে বন্ধুরা কেঁদে ফেলেছিল, তাদের চোখে জলের ধারা নজর করে বিস্তৃত হয়েছিল তার হাসি। গলা ছেড়ে স্বরচিত যে কবিতাটা বলেছিল. তার প্রথম দু-লাইন,

'মানুষের মাঝখানে বেঁচে থেকে বড়ো বেশি সুখ
মানুষেব মাঝখানে মৃত্যু মানে শেষ গল্প বলা।'

সুপার্থর সঙ্গে জেলে দেখা করতে এসে, সেখানে ছেলের হেনস্তা আর বীরত্বের কাহিনী শুনে রাগে অগ্নিশর্মা মূর্তি ধারণ করে, জেলারের ঘরের দরজার সামনে ডান হাতের তর্জনী তুলে দাঁড়িয়ে, গলা ফাটিয়ে তেজেশ চ্যাচাত, ছেলেকে বলেছি, পার্টি ছাড়বি না। শেষ পর্যন্ত বলবি, 'মাও সে তুং জিন্দাবাদ. ইন্দিরা গান্ধি মুর্দাবাদ!'

ঘরের ভেতরে, জেলার বসে থাকলেও কাপালিকের মত চেহারা, তেজেশ সরকার নামে তুকতাক জানা সাঙ্ঘাতিক লোকটা বাণ মেরে দিতে পারে, এই ভয়ে কুসংস্কারের বান্ডিল, উঁচুপদের কারাকর্তা সাড়াশব্দ করত না। শ্মশানে সারারাত পঞ্চমুন্ডির আসনে বসে যে লোক মড়া জাগানোর সাধনা করে, তার পক্ষে যে কোনও সর্বনাশ ঘটানো সম্ভব। তেজেশ সম্পর্কে নানা সাঙ্ঘাতিক খবর জেলারের কাছে এসেছিল। জেলার মুখ বুজে ঘরের মধ্যে বসে থাকলেও তার ঘরের দরজার বাইরে রক্ষীর ভিড় লেগে যেত। তেজেশকে ঘাঁটাতে তারাও সাহস পেত না। তাদের দেখে আরও চড়ে যেত তেজেশের গলার আওয়াজ। সে বলত, ছোটবাবুকে বলেছি, এখন যারা পার্টি করে, তাদের বাবার ঠিক নেই। তুই তেজেশ সরকারের ছেলে, তুই যখন পার্টি করছিস, একটাই পার্টি করবি। তোর একটাই বাবা, পার্টিও হবে একটা।

শহিদ সুপার্থ সম্পর্কে সভা, বৈঠকে বলতে শুরু করে, তার পরিবারের কথা, সেই পরিবারের মানুষগুলোর কাছ থেকে পাওয়া অফুরন্ত স্নেহের বিবরণ, শ্রোতাদের না শুনিয়ে জয়া থামতে পারত না। সুপার্থর দেহ পুলিস-মর্গে ময়নাতদন্তের পরে সৎকারের জন্যে দখল পেতে তেজেশ আর তার পরিবারের কম ভোগান্তি ঘটেনি। জেলাপ্রশাসন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তারা, নিজেরা রাতে কোনও এক সময়ে শ্মশানে পুড়িয়ে ফেলবে সুপার্থকে। খবরটা ফাঁস হয়ে যেতে জেলা পুলিস সুপারিনটেনডেন্ট-এর দপ্তরের সামনে ছেলের মৃতদেহ দাবি করে তেজেশ অনশনে বসে গিয়েছিল। তার সামনে পুলিস, পেছনে পুলিস, তাকে ঘিরে মজা দেখছিল পুলিস। মজাদার পাগল পেলে রগড় দেখতে কারা না ভিড় জমায়? তবে লোকটা সে সাধারণ পাগল নয়, তন্ত্রসাধক, মড়া জাগাতে পারে, এ খবর তাদেরও কানে যেতে মজা মারার সঙ্গে তারা ভয়ও পেয়েছিল। লাশকাটা ঘরের বাইরে চাতালে ইতিমধ্যে এসে গিয়েছিল সুপার্থর কাটাছেঁড়া করা মৃতদেহ। জনতার ভিড় যত বাড়ছিল, কান্নাভেজা গলায় তেজেশ হেঁকে যাচ্ছিল, আমার ছেলের ‘ডেডবডি’ দাও, এখনই দিতে হবে, তার সৎকার করব আমি। তোমরা বাগড়া দিতে চাইলে মাটি ফুঁড়ে হাজার শিখার বৈশ্বানর জেগে উঠবে। আমার ছোটবাবুর দেহের সঙ্গে তোমাদের সবাইকে গিলে নেবে অগ্নিদেবতা, পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।

সুপার্থর লাশের দখল পুলিস তখনও ছাড়েনি। ত্রিপল ঢাকা মর্গের ট্রাকে সুপার্থর শবদেহ ত্রিবেণী শ্মশানে সৎকার করতে এনে, প্রথমেই শ্মশান চত্বর ঘিরে ফেলেছিল বিশাল পুলিসবাহিনী। তাদের হাতে গুলিভরা রাইফেল, বন্দুক, চোখে জ্বলন্ত চাহনি। অন্ধকার শ্মশানের দুপাশের মাঠে, রাস্তায় যারা ভিড় করছিল, তাদের বয়স কুড়ি থেকে সাতাশ-আটাশ। তারা এসেছিল উত্তরপাড়া, বালি থেকে শুরু করে চন্দননগর, হুগলি মগরা, ত্রিবেণী, বাঁশবেড়িয়া, ইটাচুনা, ব্যান্ডেল, এমনকি কলকাতা থেকে পৌঁছে গিয়েছিল কয়েকজন। দুজন, তিনজন কদাচিৎ একসঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে কথা বললেও তাদের হাবভাব

দেখে মনে হচ্ছিল কেউ কাউকে চেনে না। চাপা গলায় দু-চারটে কথা বলে মুহূর্তের মধ্যে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। চিতায় তোলার আগে, সুপার্থর মৃতদেহের ওপর বিছিয়ে রাখা সাদা চাদরটা, উর্দিপরা এক কনস্টেবল সরিয়ে নিতে, শ্মশানের সবচেয়ে অন্ধকার গাছতলায় মাথার ঘোমটাতে প্রায় আধখানা মুখ ঢেকে দাঁড়ানো জয়া, ছোট বোন হিমানীকে পাশে নিয়ে স্থির চোখে প্রিয় মানুষটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। অদূরে নিভন্ত চিতার অন্তিম আলো এসে পড়েছিল প্রাণহীন সুপার্থর মুখে। সেই মুখে সুপার্থর মুখ জয়া খুঁজে পেল না। মানুষের মুখাবয়বের ছাঁদ পর্যন্ত অদৃশ্য হয়েছিল সেখান থেকে। দিদির একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে রেখেছিল হিমানী। জয়ার শরীরে বিন্দুমাত্র কাঁপুনি টের পেল না সে। দিদি শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছে কিনা, তা-ও বুঝতে পারল না। তেজেশের হাতে সুপার্থর শেষ চিঠির সঙ্গে তার লেখা যে কবিতা জয়া পেয়েছিল, তার প্রথম চারটে লাইন তার স্মৃতিতে ভেসে উঠল।

'থমকে থাকা নীরব আমার কান্না
তোমাকে নিয়ে আর না
ভালবাসার জ্যোৎস্না মেদুর চন্দ্র
তোমাকে নিয়ে আর না।'

কোলের ওপর জয়ার হাত পড়তে সজাগ হল প্রকাশ। প্রথমে জয়ার হাতের ওপরে তারপর কপালে হাত রেখে প্রকাশের মনে হল, জয়ার জ্বর আগের চেয়ে কমেছে। শুকনো মুখে ফ্যাকাশে ভাব কাটেনি। ক্লান্তির কালি জমে রয়েছে দুচোখের কোলে। জ্বর কমলেও শরীরে লেপটে রয়েছে দুর্বলতা।

জানলার বাইরে চোখ রেখে প্রকাশকে জয়া বলল, এত বেলা হল, ডাকনি কেন?

তোমার ঘুম ভাঙাতে চাইনি।

জয়নুলকে ওষুধ দেওয়া হয়েছে?

হ্যাঁ, ওষুধ দিয়েছি। 'ব্রেকফাস্ট', দুধ, পাউরুটি খাইয়ে দিয়েছি।

শতরঞ্চির ওপর জয়া উঠে বসতে প্রকাশ বলল, দিনতিনেক তুমি 'রেস্ট' কর, শুয়ে-বসে থাক। সন্ধেতে জয়নুলকে দেখতে ডাক্তার আসবে। তোমাকেও তখন একবার সে 'চেকআপ' করে দেবে।

আমার আবার কী হল?

জয়া প্রশ্ন করতে প্রকাশ বলল, ডাক্তারই তা বলতে পারে। আমি দেখছি, তুমি পুরো সুস্থ নও।

কীভাবে বুঝলে?

চোখে দেখে মনে হচ্ছে। তুমি বললে, বুঝতে পারব, আমার দেখাটা ঠিক না ভুল!

শতরঞ্চির ওপর ফের লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে প্রকাশকে জয়া বলল, একটু চা খাওয়াবে?

জয়া যে সত্যি অসুস্থ, প্রকাশকে চা করে খাওয়ানোর কথা বলে, নিজেই জানিয়ে দিল। সম্ভবত এই প্রথম প্রকাশের হাতে চা খেতে চাইল। যা বোঝার বুঝে নিয়ে রান্নাঘরে চা বানাতে গেল প্রকাশ। তিন কাপ চা বানাল। জয়নুলকে, তার হাতে ধরে চা খেতে সুবিধে হবে অনুমান করে, চা দিল গ্লাসে। জয়া, সে নিল কাপে। চায়ের কাপে জয়া চুমুক দিতে প্রকাশ বলল, উত্তরপাড়া থেকে চৈতালিকে এনে কয়েকদিন এখানে রাখলে কেমন হয়?

ভ্রূ কুঁচকে জয়া বলল, কেন?

প্রকাশ যা বলল, তাতে যুক্তি আছে। বলল, চৈতালি এসে জয়নুলের পরিচর্যার সঙ্গে ঘরের খাটুনি থেকে কয়েকদিন জয়াকে রেহাই দিতে পারে। নবেন্দু জানবে, দুর্ঘটনায় জখম জামাইবাবুর সঙ্গে, জ্বরে শয্যাশায়ী দিদি, তার সংসার সামলাতে এসেছে জয়ার ছোট বোন চৈতালি। নবেন্দুর চোখে ঘটনাটা বেমানান ঠেকবে না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দলের কাজে জড়িয়ে থাকা প্রকাশের পক্ষে এই ঘরে সারাদিন রুগি আগলে বসে থাকা সম্ভব নয়, দলের কাজে বহু জায়গায় রোজ তাকে ছুটতে হয়, জেনেও জয়া বলল, আমার জ্বর প্রায় ছেড়ে এসেছে, জয়নুলকে দেখার দায়িত্ব আমার। এখানে ভিড় বাড়িয়ে লাভ নেই।

যত আত্মবিশ্বাস নিয়ে জয়া কথাটা বলে থাকুক, তার আশ্বাস, ষোলোআনা মেনে নিতে পারল না প্রকাশ। বলল, আজ কাল পরশু অন্তত তিনদিন চৈতালি এখানে থাকুক। আমার ধারণা তিনদিনের মধ্যে তুমি পুরো সেরে উঠবে। চৈতালিকে তখন উত্তরপাড়ায় পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। তা ছাড়া বিকেলে ডাক্তার তো আসছে। সে কী পরামর্শ দেয়, শোনা যাক।

জয়া বুঝতে পারছিল, তাকে কয়েকদিন আরাম দিতে প্রকাশ যে কথাগুলো বলছে, তা উড়িয়ে দেওয়ার মত নয়। দু-তিনদিন বিশ্রাম নেওয়া তার পক্ষে বিশেষ জরুরি। সুপার্থর মৃত্যুর খবর পেয়ে ডেমরা ছেড়ে চলে আসার পর থেকে প্রথম বছরটা শহিদের বউ সেজে সহানুভূতির ঝড় তুললেও কাজের কাজ, গাঁয়ের মাটি আঁকড়ে পড়ে থেকে সংগঠন বাড়াতে কোনও ভূমিকা সে নিতে পারেনি। বীরভূমের বাংলা-বিহার সীমান্ত এলাকায় সাঁওতালপল্লীতে তাকে পাঠানোর কথা কিছুদিন আগে পাকা হয়েছে। জয়নুল সেরে উঠলেই ভদ্রেশ্বরে কুলি-লাইনে থাকার পাট তুলে আবার গাঁয়ে মেয়েদের সংগঠন তৈরি করতে সে চলে যাবে। প্রকাশ যাবে কয়েক মাস পরে। প্রকৃত মজুররা তখন চলে আবে শ্রমজীবী সংগঠনের নেতৃত্বে। চা খাওয়ার মধ্যে আগের দিন ঘটে যাওয়া বারাসতের সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার বিবরণ জয়া শোনাচ্ছিল প্রকাশকে। জয়নুলও শুনছিল সর্বনাশের অতল গহ্বরের সীমানা ছুঁয়ে জয়ার ফিরে আসার বৃত্তান্ত। প্রবল আগ্রহ নিয়ে আগের দিনের

কাহিনী প্রকাশ শুনতে শুরু করলেও তার মুখের ওপর থেকে সহানুভূতির নরম অভিব্যক্তি সরে গিয়ে ক্রমশ গম্ভীর, থমথমে ছায়া ছড়িয়ে পড়তে দেখে জয়ার অস্বস্তি হতে থাকল। পরিস্থিতির চাপে তার জ্বর এসে যাওয়া, অন্ধের মতো ব্যস্ত রাস্তা পেরিয়ে সুধীন, ইলার আশ্রয়ে পৌঁছে তার জ্ঞান হারানো, কাহিনীর এই অংশ শোনার মধ্যে চাপা অধৈর্যে প্রকাশ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। জয়া টের পাচ্ছিল, তার বিবরণ শোনাতে প্রকাশের মন নেই। অন্য কিছু সে ভাবছে। জয়া চুপ করলে সে যেন স্বস্তি পায়, হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। প্রকাশের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে। জয়া থামতে তাকে প্রথম যে প্রশ্ন প্রকাশ করল, তা হল, আনোয়ার গেল কোথায়?

জয়ার মাথা ঝিমঝিম করছিল। সে বলল, শান্তি সুইট্‌স-এ আনোয়ার বেলা এগারোটাতেও এসে পৌঁছোয়নি।

কীভাবে জানলে?

জয়ার বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়ছিল। প্রকাশের কাছে তাকে এভাবে জবাবদিহি করতে হবে, সে কল্পনা করেনি। দলের মধ্যে বছর-খানেক ধরে তাদের স্বামী-স্ত্রী পরিচিতির যে সৌধ ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে, তা এত পলকা, তার ধারণা ছিল না। চুরচুর করে ভেঙে পড়ছিল সেই সৌধ। জ্বরে, দুর্বলতায় শরীর কাহিল হয়ে থাকলেও শান্ত গলায় জয়া বলল, দশটায় তার আসার কথা ছিল। সে আসেনি। মিষ্টির দোকানে পঁয়তাল্লিশ মিনিট আমি বসেছিলাম তার জন্যে।

আনোয়ারের জন্যে তার অপেক্ষা করার ঘটনা জয়া বিশদে বলার পরেও বিরক্তির রেখা জেগে থাকল প্রকাশের কপালে। নীরস গলায় সে বলল, আমি যতদূর জানতাম, মিষ্টির দোকানে তার পৌঁছোনোর সময় দেওয়া ছিল সকাল ন-টা। টাইমের গোলমাল হলেও কথার খেলাপ করার মানুষ সে নয়। মিস্টির দোকানের আশপাশ থেকে তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল ঝালাবাবুর চেলারা। কাজ গাফিলতিতে এরকম ঘটল, ততন্ত করবে পার্টি।

প্রকাশের কথায় থতমত খেল জয়া। বারাসত বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে কাল তার মনে, সময় নিয়ে এ সন্দেহ জেগেছিল। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে, অপরাধী ধরা পড়েছে ভেবে নিয়ে, কড়া গলায় প্রকাশ বলল, শ্রেণীচেতনার থামতি থাকলে শ্রমজীবী মানুষ আর গরিব কৃষককে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা যায়। তাদের ঘাড়ে অনায়াসে সব দোষ চাপিয়ে মধ্যবিত্ত, ভদ্রলোক কমরেডরা সবরকম গাফিলতি থেকে রেহাই পেয়ে দু-হাত ধুয়ে নেতার চেয়ারে বসে যায়। সে সুযোগ, দলের শুদ্ধিকরণের এই পর্যায়ে সে যত বড় নেতা হোক, না-ও মিলতে পরে। আনোয়ারের না আসার কারণ জানতে দলের বৈঠক ডাকা হবে। তোমাকে সেখানে জিজ্ঞাসাবাদ করার সুযোগ কেউ ছাড়বে না। তোমার বিপদে পড়ার গল্প কজন বিশ্বাস করবে, বলা মুশকিল। মস্তানদের খপ্পরে, তোমার দেরির জন্য আনোয়ার

পড়েছিল, এ খবর দলকে নিশ্চয় সে জানাবে। তোমার শ্রেণীচেতনার দেউলিয়াপনা ধরা পড়ে গেলে, আমিও দলে মুখ দেখাতে পারব না।

জয়ার দুচোখে জল এসে গেলেও সে ছিঁচকাঁদুনে মেয়ে নয়। সে টের পাচ্ছিল একটা মধুর সম্পর্ক শেষ হতে চলেছে। আনোয়ারের জন্যে তার উদ্বেগ প্রকাশের চেয়ে কম নয়। প্রকাশের তা জানা থাকলেও সে কেন এত রূঢ়ভাবে কৈফিয়ত চাইছে, জয়া বুঝতে পেরেও চুপ করে থাকল। প্রকাশ স্বামীত্ব ফলাচ্ছে। তাই কি?

প্রকাশ, জয়ার কথা চালাচালির মধ্যে পায়ের যন্ত্রণায় জয়নুল ডুকরে উঠতে জয়া শতরঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর আগেই অন্ধকার নেমে এল তার দুচোখে। মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার আগে সে বসে পড়ল। প্রকাশ দাঁড়িয়ে গেছে। জয়ার দিকে এক লহমা তাকিয়ে জয়নুলের মুখের ওপর সে নজর রাখতে জয়নুল বলল, জয়াদি যা বলছে, সেটাই ঠিক। মিষ্টির দোকানে দশটায় থাকার কথা ছিল আনোয়ারের। বারাসতে আসার সময় নিয়ে তার সঙ্গে আমিই কথা বলেছিলাম। বাসভাড়া পর্যন্ত তাকে দিয়েছিলাম। মনে হয়, পেটের দায়ে ভাড়ার পয়সা খরচ করে ফেলেছে, বারাসতে আসতে পারেনি।

কয়েক সেকেন্ড থেমে, দম দিয়ে সে বলল, সবচেয়ে বড় কথা, ঝালাবাবু, না শালাবাবু, যে চিঠি জয়াদিকে দেখিয়েছে, তা আনোয়ারের নয়। আকাটমুখ্যু আনোয়ার নিজের নাম পর্যন্ত লিখতে জানে না।

জয়নুলের কথায় ঘরের মধ্যে যে শব্দহীন বাজ পড়ল, তার দাপটে প্রকাশ কেঁপে উঠল। জয়ার কপালে বিজবিজ করে ঘাম জমছে। জয়া অনুভব করল, তার মাথা-ঘোরা কমে এসেছে। জ্বর ছাড়তে খুব দেরি হবে না। তার শরীর নিয়ে একটু আগে যে মানুষ উদ্বেগ দেখিয়েছে, তাকে আরাম দিতে উত্তরপাড়া থেকে চৈতালিকে এখানে এনে কয়েকদিন রাখতে চেয়েছে, সেই মানুষটা হঠাৎ এত কট্টর, নিষ্ঠুর হয়ে গেল কীভাবে? সংসারে, দলে সব জায়গাতে কি পুরুষরা প্রভুত্বকামী? প্রকাশ কেন এমন বোকামি করল? অনেক দিন ধরে জমানো মাধুর্য, এক মুহূর্তে উবে যেতে পারে, তার বোঝা উচিত ছিল। মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে থাকা প্রকাশকে জয়া প্রথম যে কথাটা বলল, তা হল, জয়নুলকে দেখাশোনার জন্যে চৈতালিকে আনার দরকার নেই। প্রকাশের কাজ থাকলে সে অনায়াসে চলে যেতে পারে। জয়নুলের যা পরিচর্যা, সে একাই করবে। তাকে কাল ডাক্তার দেখিয়ে, তার ফর্দ অনুযায়ী ওষুধ সুধীন কিনে দিয়েছে, এ খবরটাও জানিয়ে দিল প্রকাশকে।

প্রকাশ সম্ভবত আগে কখনও এমন বেকায়দায় পড়েনি। ঘাড়ের মধ্যে তার গলা যেন ঢুকে গেছে। জয়ার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। ঘর ছেড়ে যাওয়ার আগে এঁটো কাপ-ডিশ জড়ো করে সে যখন ধুতে যাচ্ছে জয়া বলল, শোনো , তোমরা যাকে 'শ্রেণীচেতনা', 'শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি' বল, আমি তা কখনও বুঝিনি, বুঝতে পারি না। সত্যি কথা বলতে কি, বুঝতে চাই না। সংসারের চাপে,

আনোয়ার যদি বাসভাড়া খরচ করে থাকে, সেটা তার শ্রেণীর দোষ নয়। পেটের জ্বালায় একজন শ্রমিকও হাতসাফাই করতে পারে। প্রাণের ভয়ে খুনে, মস্তানের কাছে জীবন ভিক্ষে চেয়ে কোনও চাষি, মজুর মুচলেকা লিখে দিলে, তা বড় কোনও দোষ নয়। চাষি, মজুরও মানুষ, জীবনের জন্যে তাদের ভয় থাকা স্বাভাবিক। তাদের দোষ, দুর্বলতা ঢাকতে তাদের ওপর দেবত্ব চাপিয়ে দিয়ো না, মানবিক বোধের তাহলে বারোটা বেজে যাবে।

প্রকাশ বিড়বিড় করে বলল, আমাকে মাফ করো।

চায়ের সরঞ্জাম ধুতে সে রান্নাঘরে ঢুকলে জয়াকে জয়নুল বলল, আমি চটকলের কুলি। আমার মনের কথাটা, জয়াদি এত খোলাখুলি তুমি বললে, যা আমি পারতাম না।

ক্লান্ত গলায় জয়া বলল, গাংনেগড়ে পৌঁছে সুপার্থকে যদি এ কথাগুলো আড়াই বছর আগে বলতে পারতাম, তাহলে হয়তো তার জীবনটা শেষ হয়ে যেত না।

জয়া টের পেল, সকাল থেকে এত বাদানুবাদের পরে এই প্রথম তার গলা গভীর এক আর্তিতে বুজে আসছে।

ছাব্বিশ

পঁয়ত্রিশ বছর আগে চোখের জলে যে দিনগুলো ভিজে গিয়েছিল, এখন মাঝরাতে খটখটে শুকনো চোখে সেই দিনগুলোকে মনে করতে গিয়ে গাঢ় এক প্রশান্তি জয়া অনুভব করছে। আগুন মাড়িয়ে দুপায়ে হেঁটে চলার বছরগুলোতে সেও হেঁটেছিল, সর্বনাশের সীমানা ছুঁয়ে একাধিকবার মরতে মরতে বেঁচে ফিরেছে, সেই জয়া আর পঁয়ত্রিশ বছর পরের এই জয়া, একই ব্যক্তি, ভাবলে তার রোমাঞ্চ হয়, স্তব্ধ হয়ে সে বসে থাকে।

'মানবীবাদী' কর্মশালার অনুষ্ঠানে গতকাল চন্দননগরে আসার পর থেকে সে নানাভাবে স্মৃতিতাড়িত হচ্ছে। আগামীকাল কর্মশালার সমাপ্তি অধিবেশনে তাকে পরিণামী ভাষণ দিতে হবে। রাতে খাওয়ার পরে ছোট বোন হিমানী, তার স্বামী প্রভাতের সঙ্গে কিছু সময় গল্প করে, প্রায় তিনঘণ্টা আগে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিলেও তার দু চোখে ঘুম নেই। কোথাকার জল কোথায় এসে ঠেকেছে, সেই পীড়াদায়ক অনুভূতি অনবরত বিব্রত করে তাকে। পঁয়ত্রিশ বছর পরে, সে জানে, তার সঙ্কল্পের মাপ ছোট হয়ে গেছে। সমাজ রূপান্তরের কর্মসূচি, সমাজকে চুনকাম

করার প্রসাধনী কাজে এসে ঠেকেছে। রূপান্তরের তিতিক্ষা কবেই ঝরে গেছে তার জীবন থেকে। সমাপ্তি ভাষণে গম্ভীর শব্দ জুড়ে জুড়ে প্রসাধনী কাজকে সে কি রূপান্তরের চটকদার কর্মসূচির 'লেবেল' লাগিয়ে খাড়া করে দিতে পারে? কর্মশালায় হাজির, ঝুপড়িবাসী থেকে অট্টালিকাবাসী নানা বয়সের মেয়েরা কি তার ভাষণ শুনে যৎসামান্য অভিভূত হবে? তা কি সম্ভব? প্রতিনিধি হিসেবে হাজির, রাঁধুনি মায়ের মেয়েটি যখন গৃহস্থ বাড়িতে কাজের নিরাপত্তার সঙ্গে গৃহ পরিচারিকার জন্যে হপ্তায় দুদিন ছুটি, বছরে অন্তত একজোড়া শাড়ি, মাথায় মাখার তেল, দাঁত মাজার জন্যে ব্রাশ, পেস্ট, অসুখ-বিসুখে চিকিৎসার খরচ, মানবিক ব্যবহার চেয়ে জোরালো ভাষায় দাবি তুলেছে, তখন আর এক প্রতিনিধি চেয়েছে, অবিবাহিত তরুণীর মা হওয়ার অধিকার, মায়ের পরিচয়ে ছেলের পরিচয় বিধিবদ্ধ করার আইন, সরকারি খরচে অবাঞ্ছিত ভ্রূণবিনাশ, আগ্নেয়াস্ত্র রাখার ঢালাও অধিকার, এমনকি সংস্কারমুক্ত যৌন স্বাধীনতার দাবিও কর্মশালায় রেখেছে কিছু মেয়ে। খোলাখুলি এক তরুণী বলল, পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে যাব, অথচ তার সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক ঘটবে না, এ আবার হয় নাকি? অবিলম্বে আইন করে, 'লেসবিয়ান' সম্পর্কের সামাজিক স্বীকৃতি চেয়েছে কেউ কেউ। মেয়েদের সসম্মানে লিঙ্গ পরিবর্তনের ইচ্ছেতে সরকারি অনুমোদন দেওয়ার প্রস্তাব পেশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্রী। তাদের বয়স বাইশ, তেইশের বেশি নয়। দুজনের মধ্যে শ্যামলা রঙ, গাট্টাগোট্টা স্বাস্থ্য, ঈষৎ লোমশ মেয়েটি সরকারি হাসপাতালে যোগ্য শল্যবিদের সাহায্য নিয়ে নিখরচায় লিঙ্গ পাল্টে পুরুষ হতে চায়। পুরুষে রূপান্তরিত সহপাঠিনীকে স্বামী হিসেবে পেতে চায় তার সঙ্গী ছিপছিপে ফরসা মেয়েটি। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া মেয়েদের সবচেয়ে বেশি 'ক্রেজ', বাংলাতে, চাহিদার উন্মত্ততা ধরা পড়ল, পিস্তল, রিভলভার, অপর্যাপ্ত কনডোম, গর্ভনিরোধক বড়ি সংগ্রহের সহজতম পরিষেবা পাওয়ার আলোচনাতে। 'প্যাডেল পুশার' 'টি-শার্ট' পরা কলকাতার কোনও এক কলেজের যে ছাত্রী, অসঙ্কোচে আত্মরক্ষার জন্যে প্রত্যেক মেয়ের আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অধিকারের সঙ্গে বিনিপয়সায় গর্ভনিরোধক পিল, কনডোম জোগানোর পরিষেবা চাইল, সেই হঠাৎ হ্যান্ডব্যাগ খুলে একটা রিভলভার বার করে মাথার ওপর তুলে কর্মশালার প্রতিনিধিদের দেখিয়ে জানাল সেই 'লোডেড রিভলভার' সব সময়ে নিজের কাছে সে রাখে। অস্ত্র আইন মেনে, আত্মরক্ষার জন্যে 'রিভলভার' রাখার 'লাইসেন্স' তাকে জোগাড় করতে হয়েছে। কোথাও কারচুপি নেই। কথা আর কাজের স্বচ্ছতায় সে বিশ্বাসী। গুলগাপ্পি দিয়ে কাজ হাসিল করতে সে ঘৃণা করে, জানিয়ে এমন এক ঘটনার বিবরণ সে শোনাল, যা হাঁ করে শেষ পর্যন্ত শুনতে প্রতিনিধিরা বাধ্য হল। ঘটনাটা এরকম—

দক্ষিণ কলকাতার এক দু-তারা হোটেলে বন্ধু নিয়ে রাতে থাকতে গিয়েছিল সে। হোটেলের 'রিসেপশন' টেবিলে রাখা খাতায় মেয়েটি দুজনের নাম-ঠিকানা

লিখলে এক 'ফ্রন্টডেস্ক' কর্মীর চোখে দুজনের পদবির গরমিল ধরা পড়ে। তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে কর্মীটি জানতে চাওয়ার আগেই হোটেলের খাতায় মেয়েটি লিখে দিয়েছিল, 'ফ্রেন্ডস', অর্থাৎ তারা দুজন বন্ধু।

ফ্রন্টডেস্কের কর্মীরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করার মধ্যে তাদের কেউ বলেছিল, স্বামী-স্ত্রী ছাড়া ঘর ভাড়া দেওয়ার নিয়ম হোটেলে নেই। মেয়েটি বলেছিল, তারা স্বামী-স্ত্রী নয়, তারা বন্ধু, ভবিষ্যতে কখনও তাদের বিয়ে হলেও হতে পারে। তারা একটা ঘর ভাড়া নেবে, দরকার হলে ভাড়ার টাকা আগাম দিতে রাজি। রিসেপশনের কর্মীটি নিজের অপারগতার কথা জানালে, সামনে টেবিলের ওপর রাখা খোলা খাতাতে দু-জোড়া অতিথি, অবশ্যই বিদেশি, রবার্ট, ভিক্টোরিয়া, ডোনাল্ড, মার্গারেটের পারস্পরিক সম্পর্কের 'কলামে' জ্বলজ্বল করছিল ইংরেজিতে লেখা, 'ফ্রেন্ড', 'বন্ধু' শব্দটি। সপ্রতিভ মেয়েটি সেদিকে রিসেপশন কর্মীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, গলায় ঈষৎ বিরক্তি মিশিয়ে সে বলল, এ দেশের পর্যটন-আইন অনুযায়ী, আমেরিকা, ইউরোপ, বলা যায় বিদেশি অতিথিরা এই নিষেধ থেকে ছাড় পায়। ফ্রন্টডেস্কের সামনে দাঁড়ানো কলকাতার নাছোড় দুই অতিথির ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা যে হোটেলকর্মীরা এতক্ষণ নজর রাখছিল, তারা এক এক করে এসে দাঁড়াচ্ছিল সেখানে। জেদি মেয়েটির সঙ্গে তার বন্ধু, লম্বাটে ঝুলের ক্যাপ্রি পরা ছেলেটি, শুরুতে ঘরের জন্যে সমান চাপ দিলেও ক্রমশ তার গলার স্বরের তীব্রতা কমছিল। টেবিলের সামনে এতক্ষণে বয়স্ক যে কর্মী এসে দাঁড়াল, সে সম্ভবত ফ্রন্টডেস্ক ম্যানেজার, কাছাকাছি কোথাও দাঁড়িয়ে সহকর্মীর সঙ্গে তরুণী অতিথির বচসা শুনছিল, মেয়েটি পর্যটন দপ্তরের মুদ্রিত নিয়মাবলী, দেখতে চাইতে, কড়া গলায় সে বলল, রিসেপশনের সামনে এরকম চলতে থাকলে আমি থানায় খবর দিতে বাধ্য হব।

শান্ত গলায় মেয়েটি বলল, সেই ভাল, পুলিস ডাকুন, তাদের সামনে বিষয়টার ফয়সালা হোক।

এরকম জবাবের জন্যে ফ্রন্ট ম্যানেজার, তার সহকর্মীরা তৈরি ছিল না। এমন জবাব শুনতে তারা অভ্যস্ত নয়। নিজেদেব মধ্যে তারা চোখাচোখি করল। তরুণী যে হেস্তনেস্ত না করে যাবে না, দুঁদে. ডেস্কম্যানেজার তা আঁচ করে টেলিফোনের রিসিভার তুলে, গায়ে 'ক্যাপ্রি' 'ট্র্যাক জ্যাকেট' চাপানো ছেলেটির চোখে চোখ রেখে আগের মত চোস্ত উচ্চারণে ইংরেজি ভাষায় বলল. অবাঞ্ছিত এই কাজটা করতে আপনারা কিন্তু বাধ্য করলেন আমাকে।

কথাটা বলার সঙ্গে, ফ্রন্টডেস্ক ম্যানেজার থেমে থেমে একটা করে ফোনের বোতাম টিপে, থানার টেলিফোনে সংযোগ গড়ে তোলার সময়েও মেয়েটি বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে যা চাইছিল, পেয়ে গেল। বান্ধবীকে নিচু গলায় ক্যাপ্রি কিছু বলতে মেয়েটি কয়েক সেকেন্ড অবাক চোখে সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে থেকে

বলল, তুমি চলে যেতে চাইলে যাও, পুলিস না আসা পর্যন্ত আমি এখান থেকে নড়ছি না।

মুচকি হেসে রিসিভার নামিয়ে রেখে ক্যাপ্রিকে ডেস্ক ম্যানেজার বলল, আপনি চলে গেলে, থানা-পুলিস করার প্রশ্ন আর থাকে না।

সঙ্গিনীর হাত ধরে তাকে নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে ক্যাপ্রি হাত বাড়াতে, তার দিকে শীতল চোখে মেয়েটি কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে এমনভাবে মুখ ঘুরিয়ে নিল, যা দেখে মনে হয়, পুরুষবন্ধুটিকে জীবনে সে দেখেনি। লাউঞ্জের দরজার সামনে বান্ধবীর জন্যে মিনিটখানেক অপেক্ষা করে হোটেল ছেড়ে ক্যাপ্রি বেরিয়ে গেল। হেরে যাওয়ার লজ্জা মেয়েটির মুখে ছড়িয়ে পড়লেও আগের মত ডাঁটো চালে, কিছুক্ষণ পরে কাউন্টার ছেড়ে সে বেরিয়ে এসেছিল। দু-দিনের মধ্যে বাড়িতে ইন্টারনেট ঘেঁটে জেনেছিল, বেশ্যাবৃত্তি ঠেকাতে সরকারি 'ইমমর‍্যাল ট্র্যাফিক অ্যাক্ট' অনুযায়ী, দেহোপজীবিনীদের গতিবিধির ওপর আরোপিত কিছু বিধিনিষেধ ঠিকঠাক কার্যকর করতে হোটেলে পুলিসের ঢোকার অধিকার থাকলেও বন্ধু পরিচয়ে দুজন সাবালক ছেলেমেয়ের একঘরে রাত্রিযাপন, আইনবিরুদ্ধ নয়।

মানবীবাদী কর্মশালায় কলেজে পড়া মেয়েটি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা পেশ করে যে উপসংহার টানল, তা হল, পুরুষতন্ত্র আর গুন্ডারাজ হল যমজ ভাই। তাদের পাহারাদার, সবচেয়ে সংগঠিত গুন্ডাবাহিনী হল, রাষ্ট্রীয় আরক্ষাবাহিনী, তারা একই সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী এবং ভেড়ুয়া, তাদের ঠেকাতে প্রত্যেক মেয়ের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র থাকা উচিত। মেয়েদের আত্মরক্ষার জন্যে এটা দরকার।

ভাষণ শেষে মেয়েটি টি-শার্টের আড়ালে প্যাডেলপুশারের কোমরে গোঁজা পিস্তলটা বার করে মাথার ওপর তুলে স্লোগান দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, আত্মরক্ষার জন্যে মেয়েদের এটা দরকার।

ভাষণ শেষে মেয়েটি টি-শার্টের আড়ালে প্যাডেলপুশারের কোমরে গোঁজা পিস্তলটা বার করে মাথার ওপর তুলে স্লোগান দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, আত্মরক্ষার জন্যে মেয়েদের 'ফায়ার আর্মস' রাখার অধিকার দিতে হবে, দিতে হবে।

মেয়েদের অগুনতি কর্মশালায় প্রায়ই একরকম দৃশ্য জয়াকে দেখতে হয়। আগে দেখেছে, এখনও দেখে। গত দুপুরে শুনল এবং দেখল। মানবীবাদী কর্মশালার (তখন বলা হত নারীবাদী) ভাষা, পাঁচ-সাত বছরে অসম্ভবরকম বদলে গেছে, নিয়ত বদলাচ্ছে, টের পায়, যখন দেখে উচ্চশিক্ষিতা, অতি আধুনিক, ভয়ানক স্বচ্ছল মেয়েরা, এই অধিকার-আন্দোলনের নেতৃত্ব দখল করে নিচ্ছে। আন্দোলনের নেত্রীস্থানীয়দের একজন, যাটোর্ধ জয়ার ভাষা তারা বোঝে না। তার অতীত সম্পর্কে এর-ওর মুখ থেকে শুনেছে ত্রিশ, চল্লিশ বছর আগে নাকি গাঁয়ে গিয়ে চাষাভুষোদের নিয়ে বিপ্লব-টিপ্লব করার মতলব করে দু-চারটে খুনের মামলায় জড়িয়ে যায়। জেলও খেটেছিল কিছুদিন। (চার বছর কারাবাসের হিসেবটা অল্প

কয়েকজন পুরনো বন্ধু ছাড়া কেউ মনে রাখেনি।) তারপর জেল থেকে বেরিয়ে চটপট একটা বর জোগাড় করে, সংসার পেতে পাতি গেরস্থ জীবন কাটানোর সঙ্গে অতীত ভাঙিয়ে মানবী-আন্দোলনের নেত্রী সেজে ভাষণবাজি করে বেড়াচ্ছে। কবে ঘি খেয়েছিল, সেই গন্ধ শুঁকে দিব্যি করে খাচ্ছে। 'উইমেন লিব' আন্দোলনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বেজিং, লাহোর পর্যন্ত ঘুরে এসেছে। 'লিব' মানে 'লিবারেশন', মানে, সামগ্রিক মুক্তি, সব স্তরে স্বাধীনতা, তার মধ্যে অবাধ যৌনতাও অন্তর্ভুক্ত, শুচিবায়ুগ্রস্ত এই সব বুড়িয়া তা মানতে নারাজ। তারা ধরে নিয়েছে মেয়েদের দু-ঠ্যাং-এর মাঝখানে 'গল্ফ' খেলার 'হোল'-এর মত ফুটোটা একবার ইক্ষুরসে ভিজে গেলেই তাদের সতীত্ব নাশ হয়। কোনও মেয়ের সেই গর্তে একাধিক ইক্ষুদণ্ড মাড়াই হলে সেই মেয়েকে অবলীলায় 'বেশ্যা' বলা যায়। ইক্ষুদণ্ডগুলি মাড়াই-এ ছিবড়ে হয়ে, যাওয়ার পরে কতবার রসে ফের টইটম্বুর হয়ে আবার ছিবড়ে হয়ে নতুন করে জেগে উঠল, সে পরিসংখ্যান মেলে না। মোট কথা একশোজন বেশ্যা পিছু পাঁচজন লম্পট চিহ্নিত করা হয়। 'বেশ্যা', 'লম্পট' শব্দ দুটো যে আপাতত আভিধানিক অর্থ হারিয়েছে, মানবীবাদী আন্দোলন, এ বার্তা পৌঁছে দিতে চায়। মগজের মধ্যে মান্ধাতা আমলের অন্ধকার বোঝাই করে নিয়ে একুশ শতকের মেয়েদের সঙ্গে গেল শতকের ছয়-সাত দশকের তরুণীরা পাল্লা দিতে গিয়ে নিজেদের অসহ্য রকম হাস্যকর করে তুলছে, বুঝতে পারে না। কাল দুপুরে মানবীবাদী আন্দোলনের শেষ অধিবেশনে প্রতিনিধিদের সামনে, যাদের সত্তর শতাংশের বয়স চল্লিশের কম, বড় ঝাঁকটার বয়স কুড়ি থেকে ত্রিশ, তাদের শোনাতে সমাপ্তি ভাষণের বিষয় খুঁজতে, বিছানায় শুয়ে, পঁয়ত্রিশ বছরের অতীত পরিক্রমণের স্রোতে সেই অতীতে জয়া ফের পৌঁছে গেল: আজ রাতে আর ঘুমোনো হবে না, সে বুঝে গেছে। মানবীবাদ নিয়ে একুশ শতকের উপযোগী তার নিজের রচিত যে আখ্যান, তার কাপড়ের ঝোলায় রয়েছে, সেখানে অর্থনীতিবিদ, অমর্ত্য সেন, তাঁর সহযোগী ফরাসি অর্থনীতিবিদ, জঁ দ্রেজের সঙ্গে যে গ্রন্থটি লিখেছেন, 'ইন্ডিয়া, ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল অপরচুনিটি' থেকে যেমন প্রচুর তথ্য, 'উদ্ধৃতি' সংগ্রহ করা হয়েছে, তেমনি আছে জাতীয় আর আন্তর্জাতিক স্তরের ডজনখানেক 'উইমেন কমিশনে'র প্রতিবেদনের প্রাসঙ্গিক অংশ। সেই আখ্যানের একাংশ, স্মৃতি থেকে অনর্গল আধঘণ্টা সে বলে যেতে পারে। কজন বুঝবে? পাঁচ থেকে দশ শতাংশের বেশি নয়। সে বলতে পারে, কলকাতা শহরে যে ভিখিরি মায়ের শিশু ভাড়া নিয়ে আর এক ভিখারিনী ভিক্ষে করে, 'মানবীবাদ' শব্দটা তাদের দুজনের কেউ কানে শোনেনি, জলের মত বিষয়টা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেও তাদের মাথায় ঢুকবে কিনা সন্দেহ, সারা দেশে প্রতি আধঘণ্টায় একজন মেয়ে লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছে, প্রতি একশো মিনিটে যৌতুক নিয়ে বিরোধে একজন বধূর মৃত্যু ঘটছে, গত দশ বছরে ধর্ষণ মামলার একাশি

শতাংশের কোনও নিষ্পত্তি হয়নি। সরকারি হিসেবে, দেশে প্রতি বছর গড়ে এগারো হাজার মেয়ে ধর্ষিত হয়, পুংশিশুর চেয়ে অনেক বেশি, দেশের আশি শতাংশ মেয়েবেলা পার হয়ে আসা মেয়েরা এসব তথ্য শুনে ফ্যালফ্যাল করে বক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কাকে বলে ছেলেবেলা, কাকে বলে মেয়েবেলা, কার নাম শৈশব, তখন ছেলেরা যদি ছেলেখেলা করে মেয়েরা যে খেলা করে তার নাম নিশ্চয় মেয়ে খেলা! ছেলে মানুষের মত মেয়েরাও কি অল্পবয়সে মেয়েমানুষে থাকে? ছেলে মানুষী এই প্রশ্নকে মেয়েরা নিশ্চয় 'মেয়েমানুষী' হিসেবে মেনে নেবে না। যে মেয়েরা মনে এসব প্রশ্ন নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, মানবীবাদীদের সামনে মুখ খুলতে তারা সাহস পায় না। পমেটম মাখা দিদিমণির ভাষা পর্যন্ত তারা বুঝতে পারে না।

কিন্তু না, সমাপ্তি ভাষণে এরকম শুকনো তথ্য, পরিসংখ্যান জয়া শোনাতে চায় না। 'ইন্টারনেট' ঘেঁটে এসব তথ্য, যে কোনও মেয়ে পেয়ে যেতে পারে। পঁয়ত্রিশ বছর আগের একটা বৈঠকের কাহিনী, যা ইন্টারনেটে পাওয়া যায় না, এখনকার মেয়েদের কাছে যা ঠাকুরমার ঝুলির গল্প মনে হবে, সেই গল্প কি সে শোনাতে পারে না? অবশ্যই পারে। ঠাকুরমার ঝুলির সেই গল্পের অনেকগুলো চরিত্রের সে ছিল একজন। গল্পের নায়িকা না হয়েও সমান উচ্চতার চরিত্র ছিল সে।

পঁয়ত্রিশ বছর আগে দল যখন প্রায় ধ্বংসস্তূপের চেহারা নিয়েছে, বুলেটবিদ্ধ জয়নুলের পায়ের ক্ষত শুকিয়ে সম্পূর্ণ সেরে উঠে দলের কাজে নতুন উদ্যমে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, দুর্দান্ত সেই যুবকের স্ত্রী পরিচয়ে পাঁচ হপ্তা তার সঙ্গে কাটানো, প্রতি রাতে এক খাটে পাশাপাশি শুয়েও জয়নুলের চরিত্র, আচরণে নীল আকাশের দূরত্ব, অনুজপ্রতিম নির্লিপ্তি জয়া দেখেছে, শেষ পর্যন্ত পুলিসের গুলিতে বাঁশবেড়িয়ায় তাকে জীবন দিতে হল। কেশোরাম স্পানপাইপের শ্রমিকদের নিয়ে কারখানার কাছে এক শ্রমিক মহল্লায় তার গোপন বৈঠকের খবর পুলিস জেনে গিয়েছিল। জয়নুলকে মৃত ভেবে যে পুলিস নিশ্চিন্ত হয়েছিল, সেই মৃত মানুষ পুনর্জীবন পেয়ে বীরবিক্রমে গোপন সংগঠন তৈরির কাজ করে চলেছে, এ খবর জেলা পুলিসের সদর-দপ্তরে গোয়েন্দাসূত্রে পৌঁছে যেতে তখনই সুপার্থর মত তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এক মাসের মধ্যে সে সুযোগ পুলিস যে পেয়ে গেল, তার কারণ দলের মধ্যে উদ্দীপনার জোয়ার সরে গিয়ে তখন ভাটার দশা শুরু হয়েছে। দলের নেতারা এক এক করে ধরা পড়ে যাচ্ছে, পথে-ঘাটে, ময়দানে পাওয়া যাচ্ছে তাদের লাশ। দলের সব গোপন ডেরা, পার্টির ভেতরে, কর্মীদের 'টেকনেম', ছদ্মনাম, ঝাঁকড়া গাছের মাথা অন্ধকারে, জলভর্তি চৌবাচ্চার ভেতরে, ইট, পাথর বোঝাই খটখটে শুকনো পিচের ড্রামের মধ্যে লুকোনো বন্দুক, 'মাস্কেটে'র হদিশ জেনে গিয়ে চটপট যা করার পুলিস করে ফেলছিল। জয়নুলের গোপন সভার খবর, সেই ভাটার পর্বে পুলিস জেনে গেলেও

তার মুখ চিনত না। জয়নুল ভেবে যে তিনজনকে পুকুরে জাল ফেলার মত করে, সভা থেকে পুলিস তুলে নিয়েছিল, সেখানে ছিল তিনজন জয়নুল, প্রকৃত জয়নুলের সঙ্গে আরও দুজন। জয়নুলের সঙ্গে দেবেশ আর স্বরূপ মোদককে থানায় পৌঁছোনোর আগে, রাস্তার তিন আলাদা নির্জন অংশে গুলি করে, প্রকৃত জয়নুলের বেঁচে থাকার সামান্যতম সম্ভাবনা পুলিস নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। ধৃত তিনজনের কে জয়নুল, জয়নুলের 'আইডেন্টিফিকেশন', আলাদা করে তার পরিচয় প্রতিষ্ঠা করার সময় পুলিসের ছিল না। সময় নষ্ট করার ঝুঁকি তারা নেয়নি। তিনজনের একজন জয়নুল, সুনিশ্চিত জেনে, দেরি না করে, তখনই, ভ্যানের বাইরে এনে এক এক করে তিনজনের হিসেব, তিন দু'গুণে ছটা গুলিতে চুকিয়ে দিয়েছিল। জয়নুলকে পুলিস আগে থেকে চিনলে দেবেশ, স্বরূপ হয়তো বেঁচে যেত। চারটে গুলি বাজে খরচ হত না। স্বামীর শোকে চৈতালি পাথর হয়ে গিয়েছিল। তরুণী চৈতালির স্বামী ছিল দেবেশ, মাত্র একটাই স্বামী। চৈতালির গর্ভে সন্তানের ভ্রূণ রেখে যাওয়ার সুযোগ, দেবেশ পেল না। স্বরূপের স্ত্রী অনুভা, বিধবা হলেও চার বছরের একটা ছেলে রেখে যেতে পেরেছিল তার স্বামী। তার রেখে যাওয়া অসংখ্য স্মৃতির মধ্যে যে এক-আধ টুকরো জয়া মনে রাখতে পারে, তার একটা হল, তার সামনে এক সকালে জয়াকে দেখিয়ে অনুভাকে স্বরূপ বলেছিল, জয়ার দিকে হাত বাড়িয়ে যেই শুনলাম, সে প্রকাশের জীবনসাথি হতে চলেছ, তখনই 'পিছে মোড়' ভঙ্গিতে আমি হাত গুটিয়ে নিয়েছিলাম। জয়ার প্রেমিক হওয়ার বাসনা বিসর্জন না দিয়ে উপায় ছিল না। স্বরূপ যখন মুখে হাসি ছড়িয়ে ঘটনাটা বলছে, জয়ার কোলে উঠে খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ছিল স্বরূপ, অনুভার দু বছরের ছেলে পিদিম। ছেলের হাসির সঙ্গে স্বামীর কথার মজা মিশে যেতে অনুভার মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল খুশির উল্লাস। স্বরূপ, অনুভার সংসারে সেই আনন্দের মুহূর্ত তাদের সঙ্গে জয়াও উপভোগ করেছিল। জয়া সম্পর্কে স্বরূপের স্বীকারোক্তি শুনে অনুভা মুখ গোমড়া করেনি। বরং স্বামীর চরিত্রের স্বচ্ছতায় তার ওপর বেড়ে গিয়েছিল অনুভার বিশ্বাস, সেই সঙ্গে ভালবাসাও। জয়াকে একান্তে পরে সে কথা বলেছিল অনুভা।

উল্টো অভিজ্ঞতাও জয়ার কম নেই। মুক্তির দশকের উন্মাদনায় ভাটা দেখা দিতে দলের মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস বাড়তে থাকল। আদর্শবোধ, চরিত্রের দৃঢ়তা আলগা হতে এমন কিছু উটকো ঘটনা শুরু হল, যা আগে ভাবা যেত না। দলের মধ্যে অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগের সঙ্গে মারদাঙ্গায় দু-চারটে লাশ পড়ে গেল। বীরভূমের সাঁওতাল গাঁয়ে মেয়েদের গেরিলা স্কোয়াড তৈরির দায়িত্ব নিয়ে জয়া যখন নিজের জেলা ছেড়ে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু করেছে, দলের মধ্যে নতুন করে দেখা দিল বিভাজনের সঙ্কট। মহান নেতা ইতিমধ্যে অ্যারেস্ট হয়ে পুলিস হেফাজতে মারা গেছে। তার অনুগামীরা পুলিসের চর অভিযোগে অন্তরের

নেতাকে কোণঠাসা করতে চেষ্টা করছিল। শুরু হয়ে গিয়েছিল হাজার বছরের বিতর্ক। বিতর্কের বিষয় নিয়ে কারও স্পষ্ট ধারণা না থাকলেও তা অনন্তকাল চলবে, এ সম্পর্কে সকলে নিঃসন্দেহে ছিল। তখন এক সকালে ঘোড়দৌড়ের মাঠের পাশে, ময়দানে পাওয়া গেল প্রাণের নেতার লাশ। প্রাণের নেতার অনুগামীরা মৃত মহান নেতার অনুগামীদের বিরুদ্ধে বদলা নেওয়ার ছক যখন তৈরি করছে, তখন তাদের সঙ্গে প্রকাশ হাত মেলালেও জয়া থেকে গেল অন্তরের নেতার শিবিরে। সব শিবিরের কর্মীদের হাতের পাতা তখন ভ্রাতৃঘাতী রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। যাদের হাতে রক্ত লাগেনি, নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতে তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রক্তে রঞ্জিত করতে চাইছে হাত। রক্ত না পেলে লোক ঠকাতে হাতে তরল আলতা মেখে নিতে রাজি কেউ কেউ।

জয়ার সঙ্গে প্রকাশের মতবাদে তফাত ঘটে গেলেও সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়নি। তখনও পর্যন্ত সামান্য যে যোগাযোগ ছিল, সেই সুবাদে সাঁওতাল পরগনায় যাওয়ার আগে প্রকাশকে সঙ্গী করতে চেয়েছিল জয়া। সে বুঝে নিয়েছিল, প্রকাশকে আগলে না রাখলে, সে দিশাহারা হয়ে যায়, পথ হারায়। আগে কয়েকবার এমন ঘটেছে। জয়ার ডাক, তার কাছ থেকে পথনির্দেশ পেতে কান খাড়া করে, এক-পা তুলে প্রকাশ অপেক্ষা করছে। জয়াও তখন কঠিন সঙ্কটে, এক আশ্রয় থেকে আর এক আশ্রয়ে ছুটে বেড়ালেও বীরভূমের গাঁয়ে কৃষক সংগঠন গড়তে প্রকাশকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছাড়েনি। রাজ্যস্তরে আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়লেও শেষ যুদ্ধ লড়তে টগবগ করে বীরভূম ফুটছে। নতুন দিশা তুলে ধরেছে বীরভূম জেলার সংগঠন। বীরভূমে যাওয়ার উদ্দীপনার পাশাপাশি জয়ার মনে শহর সম্পর্কে হতাশা বাড়ছিল। ধস নামছিল বিশ্বাসে। জয়নুল, স্বরূপের মতো বন্ধুরা পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার সঙ্গে তাদের আদর্শ যেন মুখ থবড়ে মাটিতে পড়ে গেল। শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, যার আশ্রয়ে জয়া রাত কাটাচ্ছিল, প্রথম রাতের পরে দ্বিতীয় রাতে সেখানে থাকার ইচ্ছে, বাড়ির পুরুষটির জন্যে চটপট ভুলে গিয়ে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালিয়ে বাঁচছিল। দলের ওপরতলা থেকে পাঠানো আশ্রয়ে, ঠিকানাগুলোতে রাত কাটানোর লজ্জাজনক অভিজ্ঞতা নেতাদের জানাতে জয়া ভরসা পাচ্ছিল না। দলের ভেতরে মেয়ে, পুরুষের সমান অধিকার, তাত্ত্বিকভাবে মেনে নেওয়া হলেও তত্ত্বের চেয়ে ক্ষমতাবান যে মহাপ্রকৃতি মেয়ে, পুরুষের চারিত্রিক উপকরণের তারতম্য ঘটিয়ে দিয়েছে, তার অলঙ্ঘনীয়তা, জয়া কট্টর নারীবাদী হলেও তার অজানা ছিল না। চেনা, অচেনা নানা আশ্রয়ে বহুবার এমন ঘটেছে যে, রাতে একটা ঘরে মেঝেতে পাঁচ-ছ জন মেয়ে, পুরুষকে প্রায় পাশাপাশি শুতে হয়েছে। রাতে কোনও কারণে একজন মেয়ের ঘুম ভেঙে যাওয়ার পরে, বাকি রাত সে জেগে কাটিয়েছে। সকালে তার শুকনো মুখ দেখে, সহকর্মীদের কেউ কেউ টের পেয়েছে, শুকনো মুখ মেয়েটির বিনিদ্র রাত কেটেছে। মেয়েদের

অনেকের এরকম অভিজ্ঞতা হলেও পুরুষদেব সমান অধিকার মেয়ে বলেই তারা কাজে লাগাতে পারেনি। মনের ক্ষোভ প্রকাশ করেনি। অভিযোগ জানায়নি যথাস্থানে। মাঝরাতে লাঞ্ছনার ঘটনা চেপে গেছে। আশ্রয়দাতা গৃহকর্তা, তার প্রমাণ সাইজের ছেলে, এমনকি কমরেডরাও বিপ্লবী তকমা খুলে রেখে আদিম ক্ষুধায় জেগে ওঠে। শুধু পুরুষদের দাগি কামুক হিসেবে জয়া চিহ্নিত করতে চায় না। পুরুষের আদিম ক্ষুধা জাগিয়ে তোলার মতো প্ররোচনাদাতা কয়েকজন মেয়েও সে দেখেছে। সংখ্যায় তারা কম। প্রতি একশোজনে, খুব বেশি চার-পাঁচজন এই স্বভাবের মেয়ে সে নজর করেছে। দলীয় নেতাদের কাছে এ নিয়ে অভিযোগ জানালে তারা এমন ফয়সালা বাতলাবে, যা আরও সাঙ্ঘাতিক। আশ্রয়দাতা শ্রমিক-কৃষক হলে, অভিযোগকারীকে মেহনতি মানুষের শ্রেণীবিরোধী, এমনকি শ্রেণীশত্রুও প্রতিপন্ন করতে পারে। সে আর এক বিপদ, বড়মাপের বিপদ। অন্যরকম ঘটনাও জয়া দেখেছে।

কলকাতা তখন দুঃস্বপ্নের নগরী। শ্যামবাজারে, খালপাড়ে সুধীনদের বস্তির ঘরে এক সন্ধেতে দলের সাতজন পৌঁছে গিয়েছিল। দেওয়ালে তখন ঠেকে গেছে দলের পিঠ। কলকাতায় সুধীনের দশ ফুট বাই আট ফুট সেই ঘর ছাড়া অন্য নিরাপদ আশ্রয় জয়ার পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব ছিল না। সুধীনের ঘরে বসে বৈঠক করার পরে রাতে বস্তির মধ্যে তার শাশুড়ি অর্থাৎ ইলার মায়ের ঘরে রাতের মত তারা থেকে যাবে। স্কুলে-পড়া ছেলেকে নিয়ে মেয়ে-জামাইয়ের ঘরে রাতে ঘুমোবে ইলার মা। জয়া জানত, দলের এই দুঃসময়ে সুধীন, ইলা, প্রবল ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও তাদের রাঙাদির পাশে দাঁড়াতে কসুর করবে না। বাস্তবিক তা-ই ঘটল। দলবল সমেত জয়াকে রাতের মত জায়গা দিতে সুধীন, ইলা রাজি হয়ে গেল। গ্রুপ থিয়েটারের কম মানুষ তাদের কাছে যাতায়াত করে না। সুধীন, ইলার কাছে ঝাঁক বেঁধে অতিথি সমাগমের দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল বস্তির প্রতিবেশীরা। তারাও সাধ্যমতো এই নাট্নকে দম্পতির দরকারে, তাদের পাশে এসে দাঁড়ায়।

জয়ার তৈরি ছক অনুযায়ী ইলার মায়ের ঘরে সন্ধের পর থেকে প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত আটজনের সভার শেষে, সেখানে সাত সহকর্মীর ঘুমোনোর ব্যবস্থা করে জয়া চলে এসেছিল সুধীনের ঘরে। অন্ধকার ঘর। ভেজানো দরজা ঈষৎ ঠেলে একটা পাল্লা খুলে অন্ধকার ঘরে জয়া পা দিতে, টর্চ জ্বলে উঠল। ঘরে সবাই ঘুমিয়ে পড়লেও জয়ার প্রতীক্ষায় জেগেছিল সুধীন। জয়ার শোবার জন্যে তক্তপোশ খালি রেখে মা-ভাইকে পাশে নিয়ে ঘরের মেঝেতে বিছানা পেতে ইলা ঘুমোচ্ছে। দরজা দিয়ে ঢুকে সামনে একটা শতরঞ্চি, একটা বালিশ। জয়া বুঝে গেল এটা সুধীনের বিছানা। জয়াকে মুখ খুলতে না দিয়ে তক্তপোশের ওপর টর্চের আলো ফেলে চাপা গলায় সুধীন বলল, এখন আর কথা নয়, শুয়ে পড়ো।

জয়া বিব্রত হলেও চুপচাপ তক্তপোশে উঠে শুয়ে পড়তে খুট করে বোতাম টিপে টর্চ নিভিয়ে দিল সুধীন। মুহূর্তে অন্ধকার নেমে এল জয়ার চোখের সামনে। তার মধ্যে কয়েকটা আলোর কারিকুরি দেখার মধ্যে জয়া অনুভব করল, ইলা আর তার মায়ের সংসারের ওপর আজ সাঙ্ঘাতিক চাপ পড়েছে। রাতে আটজন মানুষের পেট ভরানোর মত রুটি, ডাল, তরকারি বানাতে দুজনের শরীর থেকে ভালরকম ঘাম ঝরেছে। দোকানবাজারে সুধীনের বিস্তর খরচ হয়েছে। হাসিমুখে দুজনে সব চাপ মেনে নিলেও জয়ার সঙ্কোচ হচ্ছিল।

সুধীনের বাড়িতে রাতের বৈঠক এবং সেখানে রাত্রিযাপনের ঘটনা, তখনকার মত শেষ হলেও সেখানে থামল না। পরের অধ্যায় শুরু হল পরের দিন সকালে। সকাল ছটার মধ্যে সকলে জেগে যেতে পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নিল। ইলার মায়ের ঘর খালি করে দেওয়ার জন্যে বন্ধুদের ডাকতে গিয়ে জয়া দেখল, দু-হাতে মুখ ঢেকে ডলি ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তার মাথায়, গায়ে হাত বুলিয়ে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে সুধা। তক্তপোশের ওপর ডলির পাশে থমথমে মুখে অমিয়া বসে থাকলেও তার দু-চোখ দিয়ে আগুন ঝরছে। বোকার মত যে চারজন পুরুষ ঘরের মেঝেতে বসে আছে, তাদের মধ্যে সাধনের মুখে সন্ত্রস্ত ভাব। তার দু-চোখের তলায় এক রাতে এত কালি জমেছে, যা কাজল ধেবড়ে না গেলে ঘটে না। ঘরের মধ্যে ভোরের আলো না ঢুকলেও অন্ধকার নেই। সাতজনকে একসঙ্গে আর আলাদা করে দেখা যাচ্ছে। সাতজন চেনা মানুষের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে জয়া বুঝে গেল, রাতে এমন কিছু ঘটেছে, যা এখনি না মেটালে দলের মধ্যে নতুন কেচ্ছাকেলেঙ্কারি শুরু হবে। ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে জয়া নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার, ডলি কাঁদছে কেন? কী হয়েছে? ডলির পাশে গিয়ে জয়া দাঁড়াতে তার ফোঁপানি বেড়ে গেল। নিজের কান্নার আওয়াজ ঢাকতে শাড়ির আঁচল পাকিয়ে ডলি মুখে গুঁজে নিল। বস্তির মাঝবরাবর বারোয়ারি জলের কল। সেখানে ভোর থেকে ভিড় শুরু হয়। সকাল ছটা বেজে গেলে গমগম করতে থাকে মানুষের গলার আওযাজ। হাসি, কথা, বিতণ্ডার সঙ্গে কুলকুচো করে ফোয়ারার মত মুখের জল সশব্দে ছেটানোর সঙ্গে মিশে যায় অদূরে আস্তাকুঁড় ঘিরে কাকের দঙ্গলের চ্যাঁচানি। ডলির পাশে বসে তার পিঠে হাত রেখে আগের মত ফিসফিস করে জয়া বলল, ডলি, কমরেড কাঁদবে কেন? আমরা তো আছি? কী হয়েছে, বলো।

রাগে ফুঁসছিল অমিয়া। সে বলল, অপরাধীর একমাত্র শাস্তি খতম!

অমিয়ার কথা শুনে জয়া চমকে গেল। দরজার গা ঘেঁষে কিচিরমিচির করতে থাকা দুটো চড়াইপাখির ফুরুত করে উড়ে যাওয়ার শব্দ শুনল জয়া। সে টের পাচ্ছিল, কাল রাতে বৈঠক শুরুর সময় থেকে তার ডেরাতে বৈঠকের হাল অমিয়া নিজের মুঠোয় রাখতে চায়। যে কোনও কাজে জয়ার উদ্যোগ নেওয়াকে সে মাতব্বরি ভাবে। সহ্য করতে পারে না জয়াকে। অমিয়ার মনের খবর জয়া রাখে। জেলে

সুপার্থর মৃত্যুর পর থেকে তার ওপর বেশি করে চটেছে অমিয়া। শহিদের বউ হওয়ার সুযোগে 'ছেলে ধরে বেড়ানো' মেয়েটা (জনান্তিকে জয়া সম্পর্কে অমিয়া যা বলে) দলের ওপর বাড়তি প্রভুত্ব খাটাচ্ছে। বাইরে জয়ার সঙ্গে হাসিখুশি সম্পর্ক বজায় রাখলেও সভা, বৈঠকে জয়ার উল্টো পথে হাঁটে। অমিয়া খতমের ফতোয়া দিলেও তা কানে না তুলে ডলির সঙ্গে কথা বলে জয়া জানল, কাল রাতে ঘুমন্ত ডলির সঙ্গে কেউ অশালীন ব্যবহার করেছে। অন্ধকার ঘরে তাকে চিনতে না পারলেও ডলির অনুমান, সে সাধন। মাঝরাতে সভার পরে গভীর ঘুমে ডুবে থাকা ডলির সেই মুহূর্তে কী ঘটেছে, হৃদয়ঙ্গম করে জেগে উঠতে সময় নিয়েছিল। শরীরের ওপর গুরুভার চাপের সঙ্গে তলপেটের তলাতে সে আরও কিছু টের পাচ্ছিল, যা মুখে বলা যায় না। তার টুঁ শব্দ করার উপায় ছিল না। শক্ত হাতের থাবায় কেউ চেপে ধরেছিল তার মুখ। ঘুমের ঘোর কেটে যেতে, শরীরের সব শক্তি নিয়ে দেহের ওপর চেপে থাকা ভারটাকে এক ঝটকায় অর্ধেকটা সরিয়ে দিতে তার কোমরের তলা থেকে দু-পা মুক্তি পেয়েছিল। মুক্ত পা দুটো মেঝেতে চেপে উঠে বসতে পেরেছিল সে। জান্তব লোকটার মুখ অন্ধকারে সে দেখতে না পেলেও তার শরীর ছেড়ে চলে যাওয়া মানুষটা যে সাধন ছাড়া কেউ নয়, শনাক্ত করতে পেরেছিল।

ডলির পিঠের ওপর হাত রেখে, তাকে যতটা পারা যায় স্বস্তির পরিসর দিয়ে জয়া জিজ্ঞেস করেছিল, কী শাস্তি সাধনের হওয়া উচিত?

দু'হাঁটুর ওপর মুখ রেখে বসে থাকা ডলির গোটা শরীর কয়েক সেকেন্ডের জন্যে কেঁপে উঠেছিল, তারপর সে স্পষ্ট করে বলেছিল, খতম!

ডলির জবাব শুনে অমিয়া যে উদ্দীপ্ত হয়েছে, জয়া টের পেয়েছিল। সকলের শেষে নিজের অভিমত জানানোর চিন্তা মাথায় রেখে, অভিযুক্ত সাধনকে বাদ দিয়ে প্রথমে সুধা, পরে বাকি তিনজনের মত জানার জন্য জয়া মুখ খোলার আগে অমিয়া বলল, একজন মেয়ে কমরেডের ইজ্জত যেহেতু এখানে জড়িয়ে আছে, তাই মেয়েদের অভিমত জানাব পরে পুরুষ কমরেডরা বলবেন।

জয়ার দিকে না তাকিয়ে প্রায় একই সুরে তার অভিমত শুনতে চাইল অমিয়া। মাথার ওপর দিয়ে সহজে খেলার বলটা অমিয়া এমন মাটি তাক করে 'শ্ম্যাশ্' করবে, জয়া ভাবতে পারেনি। প্রশ্নটা আচমকা ছুঁড়ে দিয়ে তাকে থতমত খাইয়ে দিল অমিয়া। জয়া বুঝে গিয়েছিল, অমিয়ার রায়, সাধনকে খতম করার নির্দেশে ডলি সায় দিতে তিনজন পুরুষের অন্য রাস্তায় পা ফেলার উপায় নেই। তার মুখের দিকে সকলে এখন তাকিয়ে আছে। সুধাকে দিয়ে আগে সে বলিয়ে নিতে চেয়েছিল। সুধার অভিমতে কিছু ইতিবাচক আভাস পেলে পরে তার বলতে সুবিধে হত। তাকে বলার জন্য ঠেলে দিয়ে প্যাঁচে ফেলে দিয়েছে অমিয়া। জয়া ভেতরে ভেতরে 'নার্ভাস' হয়ে পড়েছিল। স্নায়ুতরঙ্গে কম্পনের তীক্ষ্ণ ঝিনঝিন ধ্বনি। তার মনে হচ্ছিল, সে চাইলেই খতমের রায় বাতিল হয়ে যাবে না। সবচেয়ে বড় কথা, তার আত্মবিশ্বাস

শিথিল হতে শুরু করেছিল সাধনের চোখে চোখ পড়তে। তার দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সাধন তাকিয়েছিল। জঘন্য অপরাধ করেছে সাধন। কৃতসঙ্কল্প সহযাত্রী একজন মেয়ের মর্যাদা নষ্টের চেষ্টা করার চেয়ে বড় অপরাধ সে করেছে। শ্রদ্ধায়, যত্নে গড়ে তোলা নতুন যুগের নৈতিকতাকে দু'পায়ে সে মাড়িয়ে দিয়েছে। সে একই সঙ্গে ধর্ষক এবং শ্রেণীশত্রু। কড়া শাস্তি তাকে পেতে হবে, পেতেই হবে। সাধনের মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে জয়া বলতে থাকল, মেয়েদের অসম্মান করার অধিকার নেই পুরুষের। কোনও মেয়ে কমরেডের ওপর দলের কোনও পুরুষ কমরেড চড়াও হলে, মেয়েটির যে চরম অপমান হয়, তার যন্ত্রণা সে-ই শুধু অনুভব করে। খতমের মত কড়া সাজা খুঁজে বার করে অপরাধীকে দিতে হবে। খতমের রায় দিতে পারে শুধু দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে অভিযুক্তকে তখন তারা ডেকে পাঠাবে। তার আগে দলের নিয়ম মেনে আমরা যা শাস্তি দিতে পারি, দেব। তবে তা খতম নয়। খতমের নেশা আমাদের পেয়ে বসেছে। আমরা যে নতুন নৈতিকতার চর্চা শুরু করেছি, সেখানে চট করে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আগে দশবার ভাবা উচিত। অন্য কোনও কঠোর শাস্তি আমরা অপরাধীকে দিতে পারি।

সাধন ছাড়া ঘরে যে তিনজন পুরুষ ছিল, তারা আশা করেছিল সাধনকে খতমের প্রস্তাব জ্বালাময়ী ভাষায় জয়া সমর্থন করলে তারাও মেনে নেবে। পুরুষ হওয়ার লজ্জা থেকে সেই মুহূর্তে নিজেদের বাঁচাতে চাইছিল তারা। জয়ার ব্যাখ্যা শুনে কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকা খেলেও দু-একজন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। তাদের মুখ দেখে অবশ্য কিছু বোঝা গেল না। আলোচনার হাওয়া অন্যদিকে জয়া ঘুরিয়ে দিচ্ছে দেখে অমিয়া মুখ খুলল, বলল, খুন করার চেয়ে জঘন্য অন্যায় করে অপরাধী পার পেয়ে যাবে? দলের মধ্যে মেয়েদের তার মানে, সামান্য নিরাপত্তা থাকবে না, তাদের শ্লীলতাহানির ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক জলভাত হয়ে দাঁড়াবে?

সন্তোষ, পুরুষদের একজন, জয়াকে বলল, কী সাজা দেওয়া যেতে পারে, আপনি বলুন। আশা করি, সাধনকে ক্ষমা করে দেওয়ার কথা বলবেন না।

সন্তোষের কথার মধ্যে যে চিমটি ছিল, তার জ্বালা অনুভব করে জয়া উগরে দিল তার মনের ভেতরে জমে থাকা রাগ। ঘনিষ্ঠ এক মেয়ের মুখ থেকে সন্তোষের লোলুপ আচরণেব বিবরণ, জয়া শুনেছিল। বলল, সাধনকে খতম করতে হলে এখানে আরও এক-দুজন পুরুষকে খতম করতে হয়। কেউ ধোয়া তুলসীপাতা নয়।

ঘরের মেঝেতে বসে থাকা চার পুরুষ সহকর্মীর দিকে তাকিয়ে জয়া বলল, আপনারা সবাই বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, আগে,অন্য কোন 'শেল্টারে', পাশে শোয়া মহিলা কমরেডের সঙ্গে কেউ অশালীন ব্যবহার করেননি, ফষ্টিনষ্টি করার চিন্তা পর্যন্ত মাথায় আসেনি?

জয়ার প্রশ্নে ঘরে বাজ পড়ল। পাথরের মত বসে থাকল চারজন পুরুষ? ডলির ফোঁপানি থেমে গেলেও চোখের জল শুকোয়নি। অমিয়ার চোখ দিয়ে একরাশ ঘৃণার

সঙ্গে এমন আগুন ঝরতে থাকল, যা দেখে জয়ার মনে হল, সুযোগ থাকলে এরা এখনই মেরে লাশ করে দিত তাকে। জয়ার অনুগামীদের একজন সুধা। জয়ার গা ঘেঁষে চুপ করে সে বসে থাকল। তার অভিমত জয়া জানতে চাইলে ফিসফিস করে জয়ার যুক্তিতে সে সায় দিল।

ঘরের দরজা খুলে এক কেটলি চা, কিছু মাটির ভাঁড়, কাগজের ঠোঙায় সুজি বিস্কুট নিয়ে সুধীন ঘরে ঢুকল। ভাঁড়ভর্তি করে সবাইকে চা, একটা করে বিস্কুট দিয়ে ঘর ছেড়ে যাওয়ার আগে সুধীন জানাল, তখনই সে অফিসে বেরিয়ে যাচ্ছে। সকাল সাড়ে-আটটায় তার পাম্প চালানোর সময়। ঘর ছাড়ার আগে তার শাশুড়িকে ডেকে নিয়ে দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে, ঘর থেকে সকলে একসঙ্গে যেন না বেরোয়। ভাল হয়, যদি দুজন করে প্রতি খেপে যায়!

সুধীন চলে যেতে চায়ের ভাঁড় হাতে তারক উঠে এসে, জয়ার কানের কাছে মুখ এনে মৃদুতম গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, এত সাহস পেলে কোথা থেকে?

চাপা গলায় জয়া বলেছিল, আমি একজন মেয়ে, অনেক মেয়ের প্রতিনিধি, তাদের বিস্তর না-বলা কথা আমি জানি।

জয়ার জবাব শুনে তারক বলেছিল, যা হোক, সাবধানে থেকো।

তারকের কথার ভেতরের ইঙ্গিত বুঝতে জয়ার অসুবিধা হল না। দলের নেতাদের মধ্যে দু-একজন যে তার কথা শুনে চটে লাল হবে, এ নিয়ে তার সংশয় ছিল না। চা-বিস্কুট শেষ হওয়ার মধ্যে সাধনের বিচারপর্ব চুকে গিয়েছিল। অমিয়ার প্রস্তাবিত খতমের প্রস্তাব বাতিল করে সাধনকে বাঁকুড়ার সুদূর এক গ্রামে কৃষক সংগঠন গড়ার কাজে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। শহরে আসতে তার ওপর জারি হল নিষেধাজ্ঞা। তাকে জানিয়ে দেওয়া হল, তার সঙ্গে দরকার মত দল যোগাযোগ করবে। দলের কোনও ঠিকানায় তার আগ বাড়িয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

সাধনকে শাস্তির ফিরিস্তি তারক যখন শোনাচ্ছে, জয়ার মনে পড়েছিল জয়নুলকে। পায়ে গুলির চোট নিয়ে শয্যাশায়ী জয়নুলকে সেবা করার জন্য তার বউ সেজে রাতের পর রাত এক বিছানায় সে ঘুমোলেও তার গায়ে একবারও জয়নুলের ছোঁয়া লাগেনি। দূরত্ব বজায় রেখে জয়নুল লাগতে দেয়নি। আরও একজনকে জয়া মনে রেখেছে, সে স্বরূপ, অনুভার স্বামী। প্রকাশের সঙ্গে তার ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে জেনে, স্বরূপ কত নিঃশব্দে সরে গিয়েছিল। স্বরূপ তখনও বিয়ে করেনি। জয়ার স্মৃতিতে সে ঘটনা আজও অপরিম্লান! জয়ার মনে অনুভার আসনও প্রীতিসিক্ত। ব্রতপালনে সেটা ছিল জোয়ারের কাল, পীড়ন, নির্যাতনে রক্তাক্ত হলেও সুখের সময়।

কাল দুপুরের সমাপ্তিভাষণে এসব কাহিনী শোনালে অবাধ যৌন স্বাধীনতার দাবিদার মানবীবাদী আন্দোলনের কুড়ি-পঁচিশ বছরের মেয়েরা হয়তো বলবে, বুড়িটা ঢপের কেত্তন শোনাচ্ছে। কর্মশালা থেকে উঠে দরজার বাইরে গিয়ে দু-একজন

সিগারেট ধরিয়ে, ধোঁয়ার রিং ছেড়ে বলতে পারে, ঘ্যানঘেনে এই বুড়োবুড়িদের জন্যে দেশটার আজ এই হাল! মানুষ যে এখন 'নেটিভ ইনফরম্যান্ট', 'তথ্যের চলমান ঝুলি' বলা হয় মানুষকে, এরা জানে না।

সাতাশ

মৃত দেবেশের স্মৃতি আঁকড়ে পড়ে থাকা চৈতালির সঙ্গে অন্তত এক রাত কাটাতে উত্তরপাড়ায় তাদের বাসাতে যাওয়ার সুযোগ জয়া তৈরি করে নিল। যাওয়ার আগে রাতে তার জন্যে নির্ধারিত কাজের ভাগবাটোয়ারা করে বুঝিয়ে দিতে যে ক'জন মেয়েকে জরুরি বৈঠকে ডাকল, সেই বৈঠকের ঠিকানা ছিল, উত্তরপাড়ায় চৈতালির বাড়ি। পুলিসের গুলিতে দেবেশ মারা যাওয়ার পরে, তার বাড়ির ওপর থেকে গোয়েন্দা বিভাগের নজর সরে যেতে, রাতে সেখানে গোপন সভা করাতে অসুবিধে নেই, জয়া জানত। চৈতালির মা এখন আছে উত্তরপাড়ায়, মেয়ের কাছে। সময় পেলেই দু-এক রাত চৈতালির বাড়িতে, তার দাদা-দিদিরা এসে কাটিয়ে যায়। নিঃসঙ্গ চৈতালির শূন্যতা ভরে দেওয়ার চেষ্টা করে তারা। জয়া জানত, প্রকাশ পুরনো বন্ধু দেবেশের বিধবা স্ত্রী, চৈতালির খবরাখবর নেয়। জয়ার খোঁজ নিতেও ভোলে না। সরাসরি নেওয়ার সঙ্গে চেনা-জানাদের কাছ থেকেও পায়। ডলি, সুধা, গৌরহাটির মালতীপিসির সঙ্গে শ্যামবাজার থেকে ইলাকেও রাতের বৈঠকে জয়া ধরে এনেছিল। ইলা এসেছিল সুধীনের সঙ্গে। আসন্ন প্রসবা অনুভাকে তার শরীরের কথা ভেবে বৈঠকে ডাকেনি। ভারী রাত পর্যন্ত ডলি, সুধা, ইলা, মালতীপিসিকে নিয়ে জয়া যখন বৈঠক করছে, তখন পাশের ঘরে দেবেশের মা আর চৈতালির সঙ্গে গল্পে জমে গিয়েছিল সুধীন। সে শোনাচ্ছিল মঞ্চ আর অভিনয়ের গল্প। তার গল্পের মধ্যে যতটা বাস্তব, ততটা স্বপ্ন মিশে ছিল। স্বপ্নের সবটা আবার অলীক নয়, সুদৃঢ় কিছু সঙ্কল্প জুড়ে ছিল সেখানে। সবাইকে কাজ ভাগ করে দিয়ে জয়া বুঝিয়ে দিচ্ছিল, জেলায় তার অনুপস্থিতির ছাপ দলে যেন না পড়ে। কারও জন্যে কিছু আটকে থাকে না। ফাঁক সব সময়ে ভরে যায়। শূন্যস্থান পূর্ণ করতে অগুনতি মানুষ অপেক্ষা করছে। দলীয় কর্তৃত্বের যতটা মেয়েদের মুঠোয় আছে, তা বজায় রাখার সঙ্গে কর্তৃত্বের পরিধি আরও বাড়াতে হবে। সকলের চেয়ে বয়সে বড় মালতীপিসিকে বলেছিল, সংসার করেও জেলের ভেতরে সমীরকাকুর সঙ্গে তিন বছরের বেশি সময় ধরে যোগাযোগ বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব থেকে মালতীপিসি কখনও পিছিয়ে যাবে না, এ

বিশ্বাস তার আছে। জয়াকে দলে এনে অনেকটা পথ এগিয়ে দিয়েছিল সমীরকাকু। সমীরকাকু, তার নিজের কাকার বন্ধু হলেও, রক্তের সম্পর্কের কাকার চেয়ে বেশি আপন। সমীরকাকুর বোন মালতীপিসিও তাই। নিজের পরিবারের পিসির মত ঘরের মানুষ। জেলের মধ্যে সমীরের সঙ্গে বীরভূম থেকে জয়া যে যোগাযোগ রাখবে, সে কাজে সহায় হতে হবে মালতীপিসিকে। ইলাকে বলেছিল, তাদের অভিনীত নাটকের আলোয় মানুষের মনের অন্ধকার যেন দূর হয়। ডলি, সুধাকে কয়েক হপ্তা আগে দলের জেলা নেতৃত্বে তুলে এনে পাকা জায়গা করে দিয়েছিল জয়া। নেতৃত্বের অবস্থান থেকে তাদের ভূমিকা, কোন বিষয়গুলোতে তাদের বেশি সজাগ থাকতে হবে, ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিল। ডলি, সুধাকে তাদের নতুন অবস্থানে সচল করার প্রক্রিয়া পাঁচ-সাতদিন ধরে জয়া চালিয়ে যাচ্ছিল। নতুন অঞ্চলে যাওয়ার আগে, ছেড়ে যাওয়া চেনা জায়গার দায়িত্ব পালনে কোনও ফাঁকফোকর জয়া রাখতে চাইছিল না। জয়ার সঙ্গে বীরভূমে যেতে সুধা ঝুলোঝুলি করলেও আবছা হেসে আরও কিছুদিন তাকে অপেক্ষা করতে বলল জয়া। ঘুমোতে তাদের মাঝরাত হয়ে গেল।

ভোরের আলো ফোটার আগে জয়া জেগে গেল। হাতের পাতা ছুঁয়ে প্রথমে সুধা, পরে ডলিকে জাগিয়ে জয়া বলল, এবার আমি যাব। বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত একাই যাব। তোদের ঘুম ভাঙালাম, শুধু জানাতে যে, আমি যাচ্ছি।

জয়ার কথা শেষ হওয়ার আগে বিছানার ওপর সুধা, ডলি উঠে বসেছে। বন্ধ জানালার বাইরে সকালের আলো ঝিলমিল করলেও ঘরের ভেতরে অন্ধকার। অন্ধকার ঘন নয়, ফিকে বলা যায়। ডলি বলল, তোমাকে বাসে তুলে দিতে যাব আমি।

একই কথা বলল সুধা। মালতীপিসি, ইলার ঘুম যাতে না ভাঙে, তাই নিঃশব্দে কাপড়ের ঝোলাবাগ গুছিয়ে, মুখহাত ধুয়ে জয়া ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। অনেক চেষ্টা করেও তার সঙ্গে সুধা আর ডলির বাসস্টপে যাওয়া সে ঠেকাতে পারল না। কথা বাড়ালে যারা ঘুমোচ্ছে, বিশেষ করে চৈতালি, তার মা জেগে যাবে, ভেবে জয়া চুপ করে থাকল। আলতো হাতে সদর দরজার ছিটকিনি খুলে রাস্তায় এসে সুধাকে জয়া বলল, বাড়ির দরজা এভাবে খুলে রেখে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না। তুই বরং যা। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে একটু ঘুমিয়ে নে। ডলি ফিরলে দরজা খুলে দিস।

বাসস্টপ এখান থেকে এত কিছু দূরে নয় যে আমরা ফেরার আগে বাড়িতে ডাকাতি হয়ে যাবে। ডলির সঙ্গে আমি ফিরব। তুমি ভেবো না।

সুধার একগুঁয়ে মুখের দিকে এক লহমা তাকিয়ে মুচকি হাসল জয়া। হেমন্তের ফ্যাকাশে সকাল, শীতলতা মেশা চাপ চাপ ধোঁয়া ইতস্তত জমেছিল। কুয়াশাও হতে পারে। আকাশে সূর্য উঠলেও আকাশের ঝুলন্ত ধোঁয়া, কুয়াশার ছাঁকনি পেরিয়ে সৎসামান্য আলো পৃথিবীর মাটি পর্যন্ত পৌঁছোতে পেরেছে। ইট সুরকির ফাঁকা, লালচে

রাস্তা দিয়ে পর পর দুটো সাইকেল রিকশ, সওয়ারি নিয়ে জি টি রোডের দিকে চলে গেল। ফাঁকা রাস্তা, রিকশর ভেঁপু নীরব আপাতত কিছু সময়, পাড়াজাগানি রিকশর ভেঁপু ছুটি কাটাবে। বেলা আটটার পর থেকে শুরু হবে তার হাঁকডাক। রাস্তাটা যেখানে ডাইনে বাঁক নিয়ে বাঁয়ে ঘুরে বেশ কিছুটা প্রশস্ত হয়েছে, সেখানে কয়েকটা দোকানের মধ্যে একটা মিষ্টিদোকানের লাগোয়া চা দোকান আছে, জয়া জানে। এলাকাটা জয়ার চেনা। দেবেশ, চৈতালির বাড়িতে অনেকবার, কখনও প্রকাশের সঙ্গে কখনও একা, জয়া এসেছে। পাড়ার গলিঘুঁজি, পুকুর, গাছপালা, দোকানপাট, কয়েকজন মানুষকে সে চেনে। চা দোকানের পাশে, ময়রার দোকান থেকে সিঙাড়া ভাজার গন্ধ আসছে। সিঙাড়া যখন ভাজছে, জিলিপি ভাজা নিশ্চয় বন্ধ নেই। এখানে সিঙাড়া, জিলিপি দুয়েরই স্বাদ জয়া জানে। দারুণ স্বাদ, যথার্থ সুখাদ্য! তাকে, প্রকাশকে কয়েকবার সকালের জলখাবার হিসেবে এ দোকানের সিঙাড়া জিলিপি খাইয়েছে দেবেশ। দেবেশেরও প্রিয় ছিল এসব খাবার। দোকানের সামনে এসে জয়া দাঁড়িয়ে যেতে ডলি জিজ্ঞেস করল, চা খাবে?

খেলে কেমন হয়?

খাও।

মিষ্টিদোকানের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে সুধা বলল, সিঙাড়া ভাজছে।

গন্ধ পাচ্ছি।

কথাটা ডলি বলতে জয়া জিজ্ঞেস করল, খাবি?

প্রশ্নটা শুনে সুধা, ডলি মুখ চাওয়াচাওয়ি করে দুজনে একসঙ্গে ফিক করে হেসে ফেলল। জয়া বলল, দারুণ সিঙাড়া বানায় এরা। জিলিপি অসাধারণ! আমি আগে খেয়েছি। তোদের সঙ্গে বসে শেষবার খাই। অনেক পথ যেতে হবে আমাকে। চায়ের সঙ্গে দুটো গরম সিঙাড়া, জিলিপি পেটে গেলে আপাতত শান্তি! আগের রাতে ন-টার মধ্যে খেয়ে নেওয়া তিনজনের চা পিপাসার সঙ্গে একটু খিদে ভাব জেগেছিল। সিঙাড়ার গন্ধে খাওয়ার ইচ্ছেটা বেড়ে গেছে। দোকানের সামনে থেকে শালপাতার ঠোঙাতে গবম সিঙাড়া, জিলিপি নিয়ে এক, দুজন মানুষ বসেছে পাশের চায়ের দোকানে। বসার জন্যে সেখানে রয়েছে বেঞ্চি, বাঁশের পাটাতন, ব্যাটারির খোল। চায়ের ভাঁড় হাতে খদ্দের বসতে শুরু করেছিল চা দোকানের বেঞ্চিতে। বেঞ্চি ভরলেও অন্য জায়গা এখনও খালি। বসার জায়গা হিসেবে সেগুলো 'সেকেন্ড ক্লাস!' মিষ্টি দোকানের ভেতরে অনেকটা বড় জায়গা জুড়ে আধ 'ডজন' চেয়ার-টেবিল রয়েছে। বাহারি আসবাব নয়, চালু দোকানের নিদর্শন! দোকানের ভেতরে বসে জয়া কখনও না খেলেও বাইরে থেকে এসব আসবাব দেখেছে। চা দোকানের ডানদিকে ফাঁকা মাঠে, ঝাঁকড়া আমগাছের তলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা সাদা অ্যাম্বাসাডর গাড়ি। সারা রাতের শিশির গায়ে মেখে গাড়িটা যেন ঝিমোচ্ছে! মিষ্টি দোকানে ঢোকার আগের মুহূর্তে গাড়িটা দেখে জয়ার মনে খটকা লাগলেও শালপাতায় সাজানো গরম

সিঙাড়া, জিলিপির সুগন্ধী ধোঁয়া নাকের মধ্যে দিয়ে মগজে পৌঁছে যেতে তার শরীর ছড়িয়ে পড়ল আরামদায়ক স্নিগ্ধ অনুভূতি। তারিয়ে তারিয়ে দুটো সিঙাড়া, একজোড়া জিলিপি খেয়ে পরপর দু ভাঁড় চা খেল। ডলি, সুধা দুজনেই সিঙাড়া, জিলিপির সঙ্গে মিষ্টি দোকানের আবিষ্কারক, জয়ার উচ্ছ্বসিত তারিফ করল। চৈতালির বাড়ির সদর-দরজা খোলা রয়েছে, ডলি, সুধাকে মনে করিয়ে দিয়ে তাদের ফিরে যেতে বলল জয়া। তার কথা দুজনের কেউ কানে তুলল না। মিষ্টি দোকান ছেড়ে রাস্তায় এসে চা দোকানের পাশে ফাঁকা মাঠে, ঝাঁকড়া আমগাছটার তলায় চোখ পড়তে একটু আগে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা অ্যাম্বাসাডর গাড়িটা না দেখে জয়ার মনে যে খটকা জেগেছিল, তা একটু জোরালো হয়ে ফিরে এল। তার অনুভূতির নখ, দাঁত গজাচ্ছে। গাড়ির বিষয়টা ডলি, সুধাকে বলতে গিয়ে,অযথা তাদের উদ্বিগ্ন করা হবে, ভেবে, বলল না। মোড় ঘুরে চওড়া যে রাস্তা দিয়ে তিনজন হেঁটে যাচ্ছিল, সোজা জি টি রোডে সেটা শেষ হয়েছে। মিনিটখানেক হাঁটার পরে ডলি, সুধা গল্পে মেতে যখন কিছুটা এগিয়ে গেছে, সামান্য পিছিয়ে পড়েছে জয়া, সে দেখল, অর্ধেক তৈরি এক বাড়ির আড়াল থেকে আমগাছের তলায় দাঁড়ানো, শিশিরে ভেজা সাদা অ্যাম্বাসাডরটা নিঃশব্দে বেরিয়ে দুজনের শরীর ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখের পলকে গাড়ির দুদিকের, পেছনে সামনের দরজা খুলে চার, পাঁচজন তাগড়া চেহারা, খটখটে শুকনো লোক বেরিয়ে এসে ডলি, সুধাকে ঘিরে নিল। সাদা অ্যাম্বাসাডর থেকে বিপদ আসবে, জয়ার মগজ আগে থেকে সঙ্কেত পাঠাচ্ছিল। চোখের নিমেষে জয়া, তার বাঁ পাশে বাড়ি তৈরির জন্য সাজিয়ে রাখা ইটের পাঁজার আড়ালে সরে গেল। হাজার কয়েক ইটের বড়সড় চৌকোনো স্তূপের আড়ালে গা ঢেকে, পুলিসের চোখে কতটা ধুলো দেওয়া যায়, জয়া ভেবে পাচ্ছিল না। কেউ একজন প্রশ্ন করল, পালের গোদাটা কোথায়?

আছে, কাছাকাছি আছে। ইটের পাঁজার দিকে এগিয়ে আসছে কয়েকজোড়া ওজনদার জুতোর আওয়াজ। অচেনা গলা বলল, দোকান থেকে তিনজনকে বেরোতে দেখেছি।

চুলোয় যাক, তুমি কি দেখেছ। সে গেল কোথায়? তার ক্রুদ্ধ প্রশ্নের কেউ জবাব দিল না। ইটের আড়ালে ঘাসের ওপর বসে কিছুটা দূরে ঝাঁকড়া আমগাছটা জয়া দেখতে পেল। আমগাছের পেছনে যে বাড়িটা তিনমাস আগে সে তৈরি হতে দেখেছিল, সেটার কাজ সম্ভবত শেষ হয়নি। হামাগুড়ি দিয়ে সেই বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারলে, হয়তো রেহাই মিলতে পারে। মিলবে কি? জয়া জানে না। কপাল ঠুকে তবু দেখতে চায়। বুকের ভেতরে যতটা ধড়ফড় করার কথা, করছে না। প্রায় রাতে দুঃস্বপ্নে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার এই দৃশ্য দেখে ভয়ে শরীর যত কাঁপে, বাস্তবে সেই দৃশ্যের মধ্যে তত কাঁপছে না। একজন হুকুম করল, ইটের পাঁজার ওপাশে গিয়ে দ্যাখো। পালানোর আর উপায় নেই অনুমান করে, জয়া দাঁড়িয়ে উঠে

মাঠের ভিতর দিয়ে আমগাছের দিকে দৌড় দিল। তাকে দেখে ফেলল পুলিসবাহিনী। হইহই করে উঠল তারা। একজন চেঁচিয়ে উঠল, স্টপ! না দাঁড়ালে গুলি করব।

শাসানির সঙ্গে পেছন থেকে ছুটে আসা কয়েকজোড়া পায়ের আওয়াজ শুনল জয়া। আওয়াজ ক্রমশ বাড়ছে। জোয়ান পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, হিন্দি সিনেমার নায়িকা ছাড়া কোনও মেয়ের পক্ষে জেতা সম্ভব নয়, জেনেও জয়া থামল না। তখনই দুর্ঘটনাটা ঘটল। ঘাসের ভিতরে লুকিয়ে থাকা আধলা ইটে বিপজ্জনকভাবে পা রেখে, জয়া মুখথুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল। শিশির ভেজা, নরম ঘাসে ঢাকা মাটিতে পড়তে, বড়রকম চোট-আঘাত থেকে বেঁচে গেলেও দু'হাঁটু, হাতের কনুই, পাতা, চিবুক, শরীরের নানা প্রান্ত থেকে ছুটে আসা যন্ত্রণার ঢেউ মাথার মধ্যে ভেঙে পড়তে দেহের কোথায় আঘাত লেগেছে, জয়া বুঝতে পারল না। কয়েকজোড়া পায়ের আওয়াজ থেমে গেছে। মাথার দু-পাশে সামনে, তিনজোড়া শক্ত চামড়ার বুটজুতো, ঘাড় তুলে সে দেখতে পেল। মাথার কাছে যে দাঁড়িয়েছিল, দু-হাতে ভর দিয়ে উঠে প্রথমে তাকে দেখল জয়া। মজবুত শরীর, বছর চল্লিশ বয়স, ঘন ভ্রূ চোখে চশমা, সাদা ট্রাউজার্সের ওপর হালকা হলুদ চিজ কটনের বুশশার্ট, জিজ্ঞাসা করল, পালাতে গেলেন কেন?

ঘাসের ওপর উঠে বসে জয়া বলল, আমাকে পুলিস ধরতে এলে, না পালিয়ে উপায় কী?

দু-বছর ধরে আপনাকে গোরু-খোঁজা করে তবে ধরতে পারলাম। কম নাজেহাল আপনি করেননি আমাদের।

কথার মাঝখানে জয়ার দিকে অফিসাব হাত বাড়িয়ে প্রশ্ন করল, শরীরে কোথাও জখম হয়েছে, ধরব নাকি?

দেহের নানা অংশে টনটন যন্ত্রণা শুরু হলেও জয়া কথা না বলে, দাঁড়িয়ে উঠে বলল, আমি গোরু হলে কবেই ধরে ফেলতেন আমাকে। আপনাদের মত আমিও দু-পেয়ে মানুষ, ছিটেফোঁটা ঘিলু আছে মগজে। দু-বছর তাই ঘোল খাওয়াতে পারলাম আপনাদের।

মাঠের মাঝখানে কালো স্টিলের চাদরে অবরুদ্ধ একটা প্রিজন ভ্যান এসে দাঁড়াতে বুশশার্ট পরা অফিসার ভ্যানের দিকে আঙুল তুলে বলল, আপনার দুই বন্ধু ভেতরে আছে। আপনি নিজে কি ভ্যানে উঠতে পারবেন, না আমাদের সাহায্য লাগবে?

ভ্যানের সিঁড়িতে পা রেখে ভেতরে ঢোকার আগে জয়া দেখল, পাড়ার লোকের ভিড় জমেছে রাস্তায়। মাঠের ধার ঘেঁষে। অবাক চোখে পুলিসের হেফাজতে আটক অচেনা তিনজন মেয়েকে তারা দেখেছে। তাদের মুখচোখে অসন্তোষ, পাড়ার মানুষ বুঝিয়ে দিচ্ছে তাদের এলাকার মেয়েদের ওপর পুলিসের এই হমলা তারা পছন্দ করছে না। পুলিস ভ্যান মাঠ ছেড়ে রাস্তায় এলে ভ্যানের জাল লাগানো বন্ধ দরজার ফুটো দিয়ে মানুষের ভিড়ের মধ্যে জয়া দেখল সুধীন দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মুখের

রক্ত উবে গেছে, দুচোখে জমাট উদ্বেগ। সুধীনকে দেখে জয়ার কষ্ট হলেও মুখে নিরুদ্বেগ ভাব ধরে রাখল। সুপার্থর কয়েক লাইন কবিতা অনেকদিন পরে তার মনে পড়ল—

'রাত ঘন হলে আমি ফেলে চলে যাবো জীবনের ঘ্রাণ
গভীর তৃপ্তির স্বাদ ফুটে যাক মুখের উপর,
আমাকে যেতে দিও একা শুধু নমনীয় প্রভাতের পারে'

ভ্যানের মধ্যে জয়ার সামনে টানা, লম্বা কাঠের সিটের ওপরে ডলি, সুধা বসে আছে। দুজনে নিস্তব্ধ, দুশ্চিন্তা, ভয়ে কালো হয়ে গেছে সুধার মুখ। ডলি স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছে। লোহার রডের ওপর জাল লাগানো ভ্যানের দরজার দু-পাশে, দুজন করে, মোট চারজন উর্দিপরা সশস্ত্র কনস্টেবল পাহারায় বসেছে। চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলার ফাঁকে, তারা থেকে থেকে আড়চোখে দেখছে তিন বন্দিকে। মেয়েছেলে বন্দি পাহারার সুযোগ সচরাচর না ঘটার জন্যে তাদের দেখতে প্রহরীদের এই বাড়তি ঔৎসুক্য। প্রিজন ভ্যানের সামনে, ড্রাইভারের পাশে বসেছে সাদা উর্দি, দুই অফিসার। আটপৌরে পোশাকের অফিসাররা সাদা অ্যাম্বাসাডরে আগেই চলে গেছে। পুলিসের হেফাজতে জমা পড়ে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে ভ্যাবাচ্যাকা খেলেও চলন্ত ভ্যানে বসে মুখ খুলেছিল তিনজন। চাপা গলায় তাদের আলোচনার মুখ্য বিষয়, কীভাবে তার হদিস পেল পুলিস? শুধু তাকে অ্যারেস্ট করার জন্যে ওত পেতে থাকা পুলিস যে ফাউ হিসেবে ডলি, সুধাকে ধরেছে, অনুমান করেও জয়া মুখ খুলল না। সে জানে তাকে ধরতে সকালে পুলিস 'অপারেশন'-এ নামলেও তার সঙ্গী দুজনের বরাতে যথেষ্ট ভোগান্তি রয়েছে। পুলিসের খপ্পরে একবার আটকে গেলে সহজে রেহাই নেই। একটাই শুধু তার সান্ত্বনা যে, বাসস্ট্যান্ডে তাকে পৌঁছোতে যেতে দুজনকে সে বারণ করেছিল।

শেষবিকেলে গোয়েন্দা দপ্তরের দোতলার ঘরে জয়ার মুখোমুখি চেয়ারে বসে তাকে জেরা করছিল চিজ কটনের বুশশার্ট পরা সকালের সেই অফিসার। সকালে জয়াকে অ্যারেস্ট করার সময়ে যে পোশাকে সে ছিল, বিকেলে অবশ্য তা বদলে গেছে। সাদা ট্রাউজার্সের ওপর গাঢ় খয়েরি বুশশার্ট, চকচকে করে কামানো মুখ, পরিপাটি চুল, মুখ-চোখে সতেজ ভাব দেখে জয়ার বুঝতে অসুবিধে হল না, সাতসকালে উত্তরপাড়ায় তাকে ধরতে সফল 'অপারেশন'-এর পরে বাড়ি ফিরে স্নান-খাওয়া সেরে দুপুরে লোকটা কয়েকঘণ্টা আরামে ঘুমিয়েছে। সকালের মত সুভদ্র ভঙ্গিতে লোকটা আলাপ শুরু করেছিল জয়ার সঙ্গে। দুপুরে সে আর তার সঙ্গীরা পুলিস হেফাজতে নাওয়া-খাওয়া করেছে কিনা, পোশাক বদলানোর সুযোগ ঘটেছে কিনা, ইত্যাদি এমন সব প্রশ্ন করতে শুরু করল, যা শুনলে মনে হয়, পুলিস হেফাজতে থাকা বন্দিদের মধ্যযুগীয় দুর্দশার মধ্যে দিন কাটানোর বিন্দুমাত্র খবর, সেই দুঁদে অফিসার জানে না. পশ্চিমবঙ্গের পুলিস দপ্তরে চাকরি করলেও সে যেন

মঙ্গলগ্রহবাসী! পুলিস হেফাজতে দুবেলা দু-মুঠো ভাত-ডাল মিললেও পোশাক বদলের, স্নান করার সুযোগ নেই। দাঁত মাজার পেস্ট, ব্রাশ, গামছা, তোয়ালে, হাত, মুখ ধোয়ার সাবান, গায়ে চাপানো পোশাকের বাইরে বাড়তি পোশাক, পুলিস লকআপে ঢুকতে দেওয়া হয় না। দাগি অপরাধীদের লকআপের মধ্যে গাঁজা, হেরোইন, চন্ডু, চরস, মদের বোতল দেওয়ার গোপন জোগানদারি ব্যবস্থা চালু থাকলেও রাজনৈতিক বন্দিদের জল খাওয়ার গ্লাস জোটে না, কলঘরে ঢুকে কল খুলে হাতের আঁজলা ভরে জল খেয়ে তেষ্টা মেটাতে হয়, লোকটা যেন প্রথম শুনল। জয়া এসব কথা প্রশ্নকর্তা অফিসারকে না বলে তার নাটক করার সঙ্গে তাল মিলিয়ে 'হ্যাঁ' 'না' করে সংক্ষিপ্ততম উত্তর দিচ্ছিল। মৃত সুপার্থর কথা বলে, তার কবিতার প্রশংসায় অফিসার এমন সব উচ্ছ্বসিত প্রশংসাভরা মন্তব্য করতে থাকল, যা জয়াকে অবাক করার সঙ্গে কিছুটা অভিভূত করল। মানুষ হিসেবে প্রকাশও যে খারাপ নয়, এই কথাটা বলে জয়াকে জানিয়ে দিল, তার মৃত আর জীবন্ত প্রেমিক, অনুরাগীদের তালিকা-সমেত গোটা জীবনপঞ্জির কিছুই পুলিসের অনবগত নয়। পুলিসের এই সব আপাতভদ্র, চৌখস অফিসাররা বুদ্ধিদীপ্ত, সরস কথা চালানোর পরের মুহূর্তে বন্দিকে ঠান্ডা মাথায় গুলি করে দিতে পারে। তিন বছরে তাদের দলের প্রায় হাজারখানেক কর্মী এদের হাতে খুন হয়েছে। অফিসার জিজ্ঞেস করল, আমাকে চেনেন?

হ্যাঁ। পুলিস অফিসার।

নাম জানেন?

পুলিসকে চিনতে আলাদা করে নামের দরকার হয় না।

তা ঠিক। তবে নাম সম্পর্কে মোহ পুলিসেরও থাকে। মা-বাবার দেওয়া নামটা সে ভুলতে পারে না। আমার নাম আনন্দ জোয়ারদার।

গোয়েন্দা জোয়ারদারের বিবরণ, তার কথা, কাজের ভঙ্গি, আগে থেকে বহুবার শুনে জয়ার মনে জোয়ারদারের যে ছবি তৈরি হয়েছিল, সকালে 'চিজ কটন'কে কয়েক মিনিট দেখে নিজের তৈরি ছবির মানুষটার সঙ্গে মিল পেয়েও জানার আগ্রহ দেখায়নি! যে কোনওদিন জোয়ারদারের লাশ পড়ে যেতে পারে, জয়া জানে।

নামটা শুনে, তবু ছ্যাঁৎ করে উঠল জয়ার বুক। বাজারে প্রচার, তাদের দলের অসংখ্য কর্মীকে এই লোকটা গুলি করে মেরেছে। গড়িয়ার মেয়ে বন্দনার যোনিতে ফুটন্ত জল থেকে সাঁড়াশিতে ডিম তুলে এই লোকটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল। জয়াব সামনে চেয়ারে বসে আছে সেই লোক। শরীরের ভিতর হিলহিলে কাঁপুনি ধরলেও জয়া স্বাভাবিক রাখতে চাইল নিজেকে। জোয়ারদার বলল, আমার নামে এমন সব বীভৎস গল্প ছড়ানো হয়েছে, যা শুনলে আমারই ভয় ধরে যায়, অন্য পরে কা কথা!

জয়া চুপ।

জোয়ারদার প্রশ্ন করল, আপনার কানে নিশ্চয় গেছে সেইসব?

হ্যাঁ।

কী শুনেছেন?

জয়া চুপ।

আমার সম্পর্কে কী বলেন আপনার বন্ধুরা?

রাবড়িখচ্চর!

মানে?

ময়রার দোকানে রাবড়ি তৈরির কারিগররা বড়, চুলোয় গনগনে আগুনের ওপর দুধের কড়া বসিয়ে যে পদ্ধতিতে রাবড়ি বানায়, আপনিও নাকি সেভাবে জ্যান্ত মানুষকে 'লাশ' বানাতে পারেন।

পদ্ধতিটা কি?

টগবগ করে লোহার কড়াইতে দুধ ফুটতে শুরু করলে, ফুটন্ত দুধে, ওপর থেকে পাখার হাওয়া দিতে থাকে রাবড়ির কারিগর। কড়াই—এর নীচে আগুন, ওপরে তালপাতার পাখার শীতল বাতাস, ভারি মজা! হাওয়া যত বাড়ে দুধের সর তত পুরু হয়, জল মরতে থাকে। পদ্ধতিটা কি বোঝাতে পারলাম?

জয়ার কথা শুনে কয়েক সেকেন্ড গুম হয়ে বসে থেকে হা হা করে হাসতে শুরু করল জোয়ারদার। হাসি আর থামে না। অট্টহাসি যাকে বলে তাই। হাসির মধ্যে দু-একবার আলগোছে 'রাবড়িখচ্চর' শব্দটা উচ্চারণ করে, হাসি থামিয়ে জোয়ারদার বলেছিল, নতুন পাওয়া এই নামটা বাড়ি ফিরে বউকে শোনাতে হবে।

বাইরে থেকে একজন 'কনস্টেবল' ঘরে ঢুকে জোয়ারদারকে জানাল, স্যার, গাড়ি রেডি।

জয়াকে জোয়ারদার বলল, চলুন।

কোথায়?

গঙ্গার ধার থেকে একটু হাওয়া খেয়ে আসি।

জয়া জানে যেখানে খুশি তাকে নিয়ে যেতে পরে জোয়ারদার। পাঁচ মিনিট পরে জয়াকে নিয়ে গঙ্গার ধারে না গেলেও গঙ্গার ওপর বিবেকানন্দ সেতু ধরে যে কালো অ্যাম্বাসাডর গাড়িটা জি টি রোডের দিকে ঝড়ের গতিতে ছুটে চলেছে, সেটা কোন ঠিকানায় যাচ্ছে, জয়া না জানলেও জোয়ারদার গাড়ি নিয়ে উত্তরপাড়ায় মৃত দেবেশের বাড়ি পৌঁছে গিয়েছিল। দুপুরে ডলি, সুধাকে আলাদাভাবে জেরা করে গোয়েন্দারা উত্তরপাড়ার ঠিকানা সমেত নানা তথ্য জেনে গিয়েছিল। তথ্য আরও জানার থাকলেও জিজ্ঞাসাবাদে তাদের তাড়া ছিল না। সময় অনেক আছে, তারা জানত। বাস্তবিক তাই। চার বছর সময় পেয়েছিল তারা। পুরো সময়টা ধরে জয়া কারাবন্দি ছিল। দীর্ঘ, সুদীর্ঘ যে সময় তারা পেয়েছিল, তার মধ্যে সূর্যকে চোদ্দোশো পঞ্চাশবার প্রদক্ষিণ করেছিল পৃথিবী, চোদ্দোশো পঞ্চাশটা দিন আর রাত চলে গিয়েছিল পৃথিবীর ওপর দিয়ে, লক্ষ লক্ষ মাইল আকাশপথ পরিক্রমা করেছিল হাজার হাজার বিমান, আলোকবর্ষের দূরত্ব

পেরিয়ে নাম-না-জানা কয়েক কোটি নক্ষত্রের রশ্মি পৃথিবীতে পৌঁছে গিয়েছিল, আলিপুর জেলে মেয়েদের সেলে বন্দি জয়াকে শুধু কোনও দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়নি। তার জীবনে সময় থেমে গেলেও তার বয়স চার বছর বেড়ে গিয়েছিল। চার বছর পরে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গেটের বাইরে এসে জয়া দেখেছিল, তার মাকে নিয়ে প্রকাশ দাঁড়িয়ে রয়েছে, প্রকাশ অপেক্ষা করছে তার জন্যে। আনুষ্ঠানিক বিয়ের পাট সেরে তিন মাসের মধ্যে সংসার পেতেছিল তারা। জয়া জেল থেকে খালাস হওয়ার একত্রিশ বছর আগে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বি.ই. পাস করা প্রকাশ, একটা চাকরি জুটিয়ে নিয়েছিল। তার অধীত বিদ্যার সঙ্গে চাকরির বিশেষ সম্পর্ক না থাকলেও সংসার চালানোর মত টাকার সংস্থান প্রকাশ করেছিল। মজবুত করে সংসার পেতে জয়াকে নিয়ে আটাশ বছর কাটিয়েছে দাম্পত্য জীবন-ছেলের বাবা হয়েছিল প্রকাশ, জয়া মা হয়েছিল। দু-বছর আগে পৃথিবী ছেড়ে প্রকাশ চলে গেছে। বিয়ের তৃতীয় বছরে তাদের যে ছেলে, একমাত্র সন্তান মিলিন্দ জন্মেছিল, তার বয়স এখন আটাশ। বাবার মতো ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্যে তিনবার 'জয়েন্ট এন্ট্রান্স' পরীক্ষা দিয়ে সফল না হয়ে, নির্ভুল একটা পেশার খোঁজে সে নানা ব্যবসা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে। শান্ত, ভদ্র, রুচিবান, ঝরনার জলের মত টলটলে হৃদয়, মিলিন্দকে দেখে জয়ার মনে হয়, তার এই সন্তান, ছেলে অথবা মেয়ের চেয়ে বেশি, সে আস্ত, সম্পূর্ণ একটা মানুষ। জয়েন্ট এন্ট্রান্সে তিনবার 'ফেল' মেরে, সাতটা ব্যবসাতে অসফল হয়েও সে হতাশ হয়নি। নতুন উদ্যমে অচেনা বন্ধ দরজায় টোকা মারছে। ইঞ্জিনিয়ার হয়নি মিলিন্দ, সমাজ-বদলের স্বপ্ন, সে দেখে কিনা, জয়া বুঝতে পারে না। কিছু একটা স্বপ্ন তার আছে, অনুমান করে। স্বল্পভাষী, হাসিখুশি, নির্লোভ, সরল মিলিন্দ, পুরুষতন্ত্র কায়েম রাখার অনুপযুক্ত, মানবীবাদী জয়ার বুঝতে অসুবিধে হয় না। তার মনে প্রশ্ন জাগে, পুরুষতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কী? কোথায় পৌঁছোতে চায় মানবীবাদী দর্শন? এতসব সামাজিক বীক্ষার চরম পরিণাম কী?

নিজের তৈরি প্রশ্নে জর্জরিত জয়া মাঝে মাঝে নিজেকে সন্দেহ করে বসে। ছেলের জন্যে অন্ধ স্নেহে সে কি পুরুষতন্ত্রের সমর্থক হয়ে উঠছে? মানবীবাদী শিবিরের উল্টোদিকে সরে যাচ্ছে? নিজের প্রশ্নের জবাব তাকেই খুঁজতে হয়। অনুসন্ধানের নানা স্তরে নতুন শতকের প্রবহমান ধ্বনিতে শুনতে পায় পরিচ্ছন্ন ভবিষ্যতের বার্তা। দুশ্চিন্তার ভার তার মাথা থেকে নেমে যায়।

সকাল আটটায়, জয়ার ঘরের ভেজানো দরজা সন্তর্পণে খুলে হিমানী দেখল, সূর্য ওঠার আগে তার যে দিদি জেগে যায়, ঘরে সকালের রোদ এসে পড়লেও সে ঘুমোচ্ছে। শরীর খারাপ করল নাকি? ভয় পেল হিমানী। রাতে দু-তিনবার এই ঘর থেকে খুটখাট আওয়াজ কানে যেতে হিমানী অনুমান করেছিল, দিদি ঘুমোয়নি। রাত পর্যন্ত লেখাপড়া করে থাকতে পারে। জয়াকে না জাগিয়ে হিমানী নিঃশব্দে খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। খোলা জানালার পাশে, বাতাবিলেবু গাছের

সবুজ পাতা-ছুঁয়ে নরম তুলোর মত সকালের রোদ ঘরে ঢুকে, জয়ার মাথার বালিশের কোল ঘেঁষে ছড়িয়ে পড়েছে। ঘুমন্ত জয়ার মুখের ওপর কয়েক কণা আলো, নাচানাচি করে, সরে গিয়ে, পরের মুহূর্তে নতুন নৃত্যভঙ্গিমায় ফিরে আসছে। দিদির কপালে কোনও রেখা, চোখের তলায় কালি, চিবুকে ভাঁজ হিমানী দেখতে পেল না। সুখের স্বপ্ন দেখলে, মানুষের মুখে যে গভীর প্রশান্তি ছড়িয়ে থাকে, জয়ার মুখের টানটান ত্বকের উজ্জ্বল কান্তিতে তা নজর করে দিদিকে জাগাবে কিনা হিমানী যখন ভাবছে, তখনই জয়া চোখ খুলল, দেখল, বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে হিমানী, দু-বোনে চোখাচোখি হতে, দুজন একসঙ্গে হাসল। ঘুম ভাঙতে জয়া প্রথমে চোখের সামনে ডান হাতের কবজিতে বাঁধা ঘড়ি এনে সময় দেখে বলল, ইস, আটটা বেজে গেছে। আমাকে তোর জাগিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।

হিমানী জবাব দিল না। ফিসফিস করে জয়া বলল, দারুণ একটা স্বপ্ন দেখছিলাম।

কিসের স্বপ্ন?

আজ কর্মশালার সমাপ্তিভাষণে বলব। বাড়ি ফিরে তোকে শোনাব।

স্বপ্নটা মনে থাকবে?

থাকবে। কিছু স্বপ্ন মানুষ ভোলে না।